হিয়া

রূপক সাহা

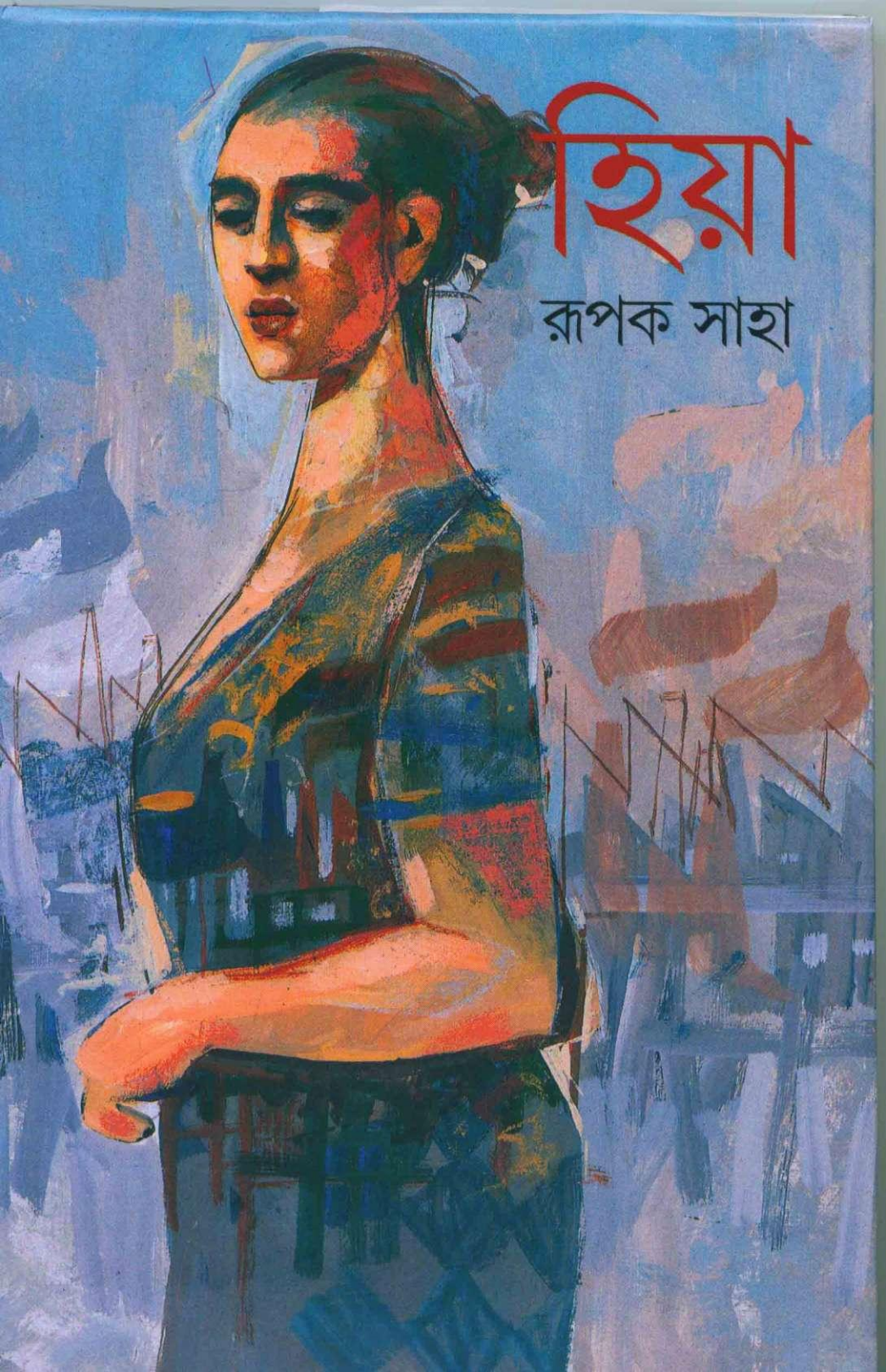

॥ এক ॥

সুব্রতদা বলল, "ফোকোর দোকানের স্টপেজে তুই কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকিস শিবা। আমি ঠিক পৌঁছে যাব ন'টায়। তুই না এলে আমি কিন্তু তোদের বাড়ির রাস্তা ঠিক চিনতে পারব না।"

কথা হচ্ছে ফোনে। ভাল শুনতে পাচ্ছি না। ক্রিকেট টেস্ট চলছে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে। ড্রয়িংরুমে বসে টিভি-তে শচীন-সৌরভের ব্যাটিং দেখছে জোজো। সাউন্ড কমানোর কথা ওকে এখন বলা যাবে না। বললেই মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করবে।

বাধ্য হয়েই কর্ডলেসটা কানের কাছে ঠেসে ধরলাম। বিশ্রী ধরনের গ্যাঁ গ্যাঁ একটা শব্দ হচ্ছে। ক'দিন ধরে এটা লক্ষ করছি। টিভি চলার সময় কোনও ফোন এলে এই শব্দটা হচ্ছে। ও প্রান্তের লোক আমার কথা শুনতে পাচ্ছে। অথচ এদিকে আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। চিৎকার করে তাই সুব্রতদাকে বললাম, "আমি ঠিক সময়েই হাজির থাকব। তুমি আসবে তো? গত বছর তুমি ঘণ্টাখানেক দাঁড় করিয়ে রেখেছিলে। আসনি।"

"মাই গড, তোর এখনও মনে আছে?"

"থাকবে না? তোমার জন্য মা সেদিন কত রান্না করে রেখেছিল জানো? সব নষ্ট। এবার অন্তত সেটা কোরো না।"

ওপাশ থেকে সুব্রতদা কী যেন বলল। শুনতে পেলাম না। ফের লাইনটা ডিসটার্ব করছে। আমাদের এখানে টেলিফোন এক্সচেঞ্জটা সেই ডোমজুড়ে। সব ওভারহেড লাইন। ঝড়-বৃষ্টি হলে প্রায়ই তার ছিঁড়ে যায়। ইদানীং বিকেলের দিকে প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছে। আজও আকাশে মেঘ। সুব্রতদার কথা ভাল করে শোনার জন্য সোফা থেকে উঠে আমি জানলার কাছে গেলাম।

"হ্যালো....শিবা হ্যালো...."

"বলো। এইবার তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি।"

"তুই কিন্তু কাল....হাতে কোনও কাজ রাখিস না। সারাটা দিন ফাঁকা থাকিস। খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ইট'স আ কোয়েশ্চেন অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ।"

"আগে তুমি এসো তো। তারপর দেখা যাবে।"

কথাটা বলেই মনে মনে আমি হাসলাম। সুব্রতদাকে আমি খুব ভাল করে চিনি। যত ব্যস্ত মানুষ, তার চেয়ে ব্যস্ততার ভান বেশি। এই যে বলল, 'ইট'স আ কোয়েশ্চেন অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ', আসলে তেমন কিছুই না। আমি কৌতূহল নিয়ে বসে থাকব, কথাটা শোনার জন্য। পরে দেখব, মামুলি কোনও ব্যাপার।

আমরা যখন শোভাবাজারে থাকতাম, তখন থেকেই সুব্রতদার সঙ্গে আলাপ। আমাকে ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি পড়াত। পড়ানোর কথা ছিল সপ্তাহে তিন দিন। কিন্তু রোজই চলে আসত। মা খুব ভালবাসত সুব্রতদাকে। ওদের বাড়ি নরেন দেব পার্কের উল্টোদিকে। আমাদের বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ। আমিও মাঝেমধ্যে সুব্রতদার বাড়িতে যেতাম। সুব্রতদার বোন মিলির সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল।

আমি কলেজে ওঠার পরই সুব্রতদা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে প্যারিসে চলে যায়। এখন ওখানেই চাকরি করে। প্রতি বছর ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে একবার করে দেশে আসে। বাবা মারা যাওয়ার পর আমি আর মা আমাদের পার্বতীপুরের বাড়িতে চলে আসি। সুব্রতদা কিন্তু সম্পর্কচ্ছেদ করেনি। দেশে এলেই আমার সঙ্গে একবার যোগাযোগ করে।

এবার ফোনটা কোত্থেকে করেছে, ঠিক বুঝতে পারছি না। অবশ্যই শোভাবাজার থেকে নয়। বাড়ি থেকে ফোনটা করলে, এর মধ্যে একবার না একবার মিলির কথা তুলত। গত বছর এম.এসসি করে মিলি এখন চাকরি করছে কী একটা বিদেশি কোম্পানিতে। প্যারিস থেকে সুব্রতদাই ওকে চাকরিটা করে দিয়েছে।

"কী রে শিবা, চুপ করে আছিস? ভদ্রলোককে তুই চিনিস?"

মাঝে লাইনে শব্দ হচ্ছিল বলে, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম না। প্রশ্নটা হঠাৎ কানে আসতেই বললাম, "কার কথা জিজ্ঞেস করছ?"

"বললাম তো। সুপ্রতিম ঘোষাল। চিনিস? তোদের ওখানে খাটোরা বলে কি কোনও জায়গা আছে? কদ্দুর রে তোদের বাড়ি থেকে?"

খাটোরা বলে একটা জায়গা আছে ডোমজুড়ে। আমাদের মিত্তিরকাকা ওই অঞ্চলে থাকেন। বেশ কয়েকবার খাটোরায় গেছি। শেষবার গেছি, বছরখানেক আগে মিত্তিরকাকার মেয়ে রুমার বিয়েতে। আমাদের এই পার্বতীপুর থেকে গাড়িতে যেতে লাগে পনেরো মিনিট। ওখানে সুপ্রতিম ঘোষাল বলে কাউকে অবশ্য আমি চিনি না। মিত্তিরকাকা নিশ্চয়ই চিনবেন। এখানে সবাই সবাইকে চেনেন। শুধু চেনেন বলা ভুল হবে। বাপ-ঠাকুর্দার নামও বলে দিতে পারেন।

"এ্যাই শিবা, বোবা হয়ে গেলি নাকি? মনে হচ্ছে, তুই একটু ডাল হয়ে গেছিস। প্যারিসে যখন ছিলি, তখন তো বেশ চটপটে ছিলি রে।"

"আসলে....লাইনটা মাঝেমধ্যে ডিসটার্ব করছে।"

"ওহ, তাই বল।" সুব্রতদা যেন একটু নিশ্চিন্ত হল। তারপর বলল, "তুই কি চিনিস ওই ভদ্রলোককে?"

"না। যদি বলো, খোঁজ নিতে পারি।"

"না, না। দরকার নেই। কাল তো যাচ্ছিই। দেখা হবে। ভাল কথা, মঁসিয়ে বেনোনিলকে তোর মনে আছে শিবা? ওই যে রে, যার ফ্ল্যাট তুই ভাড়া নিয়েছিলি...."

"খুব মনে আছে। কেন গো?"

"লোকটা দিন সাতেক আগে আমার সঙ্গে কলকাতায় এল। এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইটে হঠাৎ দেখা। প্লেনে তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল খুব।"

কী কথা, জানতে চাইলে সুব্রতদা ফালতু বকবক করবে। তাই বললাম, "কলকাতায় কোথায় উঠেছে, জানো?"

"বলেছিল তো তাজ বেঙ্গলে। এখনও আছে কি না জানি না।"

"কলকাতায় কেন এলেন, কিছু বললেন তোমাকে?"

"হ্যাঁ বলেছিল। এই দ্যাখ। আসল কথাটাই তো বলতে ভুলে গেছি। ভদ্রলোক এখন ফ্রান্সের একটা পারফিউম কোম্পানির টপ বস। কী যেন নাম কোম্পানিটা....জিবোদান রুর। তোদের লাইনেই বিজনেস করছেন। আর ওই জন্যই তোকে খুঁজছেন।"

এত বড় একটা খবর সুব্রতদা এতক্ষণ বলেনি! পারে বটে। মঁসিয়ে বেনোনিল আমাকে খুঁজছিলেন, মানে নিশ্চয়ই কোনও দরকার আছে। ওঁর সঙ্গে অবশ্যই একবার দেখা করা দরকার। সুব্রতদার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। খবরটা আমাকে এতদিন পরে দিল?

আমি কিছু বলার আগেই সুব্রতদা বলল, "লোকটা তো আমায় বলেছিল একবার বাঙ্গালোর যাবে। কলকাতায় কোনও এক এজেন্টের ইনভিটেশনে এসেছে। স্যান্ডাল অয়েল নিয়ে কথা বলতে। আমি তোর ডোমজুড়ের নম্বরটা দিয়ে রেখেছি। তোকে কেন ফোন করেনি, জানি না। তুই নিজে একবার যোগাযোগের চেষ্টা কর না।"

কথাটা মন্দ বলেনি সুব্রতদা। আমারই একবার যোগাযোগ করা উচিত। বললাম, "করব।"

"ছাড়ি তা হলে? কাল তোর সঙ্গে তা হলে দেখা হচ্ছে।

ও প্রান্তে ঠকাস করে একটা শব্দ হল। তার মানে সুব্রতদা এতক্ষণ কোনও পাবলিক বুথ থেকে কথা বলছিল। কর্ডলেসের সুইচটা অফ করে ফের সোফায় গিয়ে বসলাম। সুব্রতদা তিনটে কথা বললে একটা কিন্তু আর তা হলে বলবেই। বদঅভ্যাসটা এখনও গেল না। এখনও তেমন খেয়ালি রয়ে গেল। জীবনে আবেগটাকেই প্রাধান্য দিয়ে গেল। যুক্তির কোনও ধার ধারল না।

সুব্রতদার উপর রাগ হলেও, কখনও তা প্রকাশ করি না। আমার প্রাইভেট টিউটর ছিল বলে তো বটেই, আমার জীবনে বিরাট একটা উপকারও করেছে। এই সুব্রতদার জন্যই আমি ফ্রান্সে গিয়ে পারফিউম নিয়ে পড়াশুনা করে আসতে পেরেছি। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর যখন ভাবছি, কোন লাইনে যাব, তখন সুব্রতদাই আমাকে প্রথম বলেছিল, "আমাদের ওখানে ভার্সেইতে একটা ইন্সটিটিউট আছে। ইন্সটিটিউট সুপিরিয়র ইন্টারন্যাশনাল দ্য পারফাঁ, কসমেটিক্স-এ আলিমন্তেয়ার অ্যারম। সংক্ষেপে ইসিপকা। তুই ইচ্ছে করলে আমার ওখানে যেতে পারিস। দু' বছরের কোর্স। যদি পাশ করে আসতে পারিস, তা হলে এখানে তোর চাকরির অভাব হবে না। তেমন হলে নিজেই ব্যবসা করবি। পারফিউম লাইনে তো তোদের ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন আছে।"

সুব্রতদার পরামর্শটা আমার মনে ধরেছিল। বলেছিলাম, "তুমি ফিরে গিয়ে আরও খোঁজখবর নিয়ে আমাকে জানাও। আমাকে কি ওরা ভর্তি নেবে?"

"কেন নেবে না? বছরে এক লাখ টাকার মতো লাগবে। ইসিপকায় সারা পৃথিবীর

ছেলেমেয়েরা গিয়ে ভর্তি হয়। তবে সিট খুব কম। মাত্র পঞ্চাশটা। ফিরে গিয়েই আমাকে দেখতে হবে, এবার কোন পারফিউম কোম্পানি স্পনসর করছে। একটু ধরাধরি করতে হবে। তবে একটা সুবিধাও আছে, জানিস। ভারত থেকে আজ পর্যন্ত কোনও ছেলে বা মেয়ে ইসিপকায় যায়নি। প্রথম-ট্রথম বলে তোকে পুশ করতে হবে।"

সুব্রতদা নিজে যতই অগোছালো হোক, আমার ব্যাপারে কিন্তু সত্যিই খেটেছিল। আমি যে ব্যাচের ছাত্র, সেবার স্পনসর ছিল বিখ্যাত কোম্পানি জ্যাঁ পাতু। তাদের লোকজন ধরে সুব্রতদা আমাকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল। মা কিছুতেই আমাকে ভার্সেইতে পাঠাতে রাজি হচ্ছিল না। সুব্রতদা মাকে রাজি করিয়েছিল। প্রথম প্রথম মাস দুয়েক নিজের কাছে রেখেছিল। এই ঋণ কি আমি কখনও শোধ করতে পারি? সুব্রতদা যদি ফোকোর দোকানে আবার আমাকে ঘণ্টা তিনেক দাঁড় করিয়ে রাখে, আমি তা হলেও কিছু বলতে পারব না।

জোজো বসে টিভি-তে খেলা দেখছে। এই একটা খেলা, সহ্য করতে পারি না। সারাটা দিন নষ্ট। জোজো কী আনন্দ পায়, কে জানে। সৌরভের একনিষ্ঠ ভক্ত। আমি যখন সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়তাম, তখন সৌরভ আমার থেকে দু' ক্লাস নিচুতে পড়ত। আমরা কেউই তখন ভাবিনি, একদিন ও ইন্টারন্যাশনাল স্টার হবে। জোজোর জন্য অটোগ্রাফ নিতে ওর বেহালার বাড়িতে একদিন দৌড়তে হবে আমাকে।

আমার দিদির একমাত্র সন্তান এই জোজো। মা আর আমার খুব আদরের। দিদিকে ও একেবারেই সহ্য করতে পারে না। উচ্চমাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট করে সবে ভর্তি হয়েছে বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন কলেজে। হোস্টেলেই থাকে। আর ছুটি-ছাটা পেলে চলে আসে পার্বতীপুরে আমাদের বাড়িতে। দু'চার দিন থাকে। ফের হোস্টেলে ফিরে যায়। দিদির প্রসঙ্গ উঠলে প্রায়ই ও বলে, "শিবাম্মা, তোমার কন্তুরীদি....।" কখনও মা বলে ডাকে না। ছোটবেলায় জোজো খুব সর্দিকাশিতে ভুগত। তখন অনেক কথা পরিষ্কার উচ্চারণ করতে পারত না। শিবামামার বদলে আমাকে ডাকত শিবাম্মা বলে। এখনও শোধরায়নি।

বেলা এখন সাড়ে চারটে। আজ একবার আন্দুলের দিকে যেতে হবে। আমি কোথাও বেরলে মাকে না জানিয়ে যাই না। মা আমাকে নিয়ে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা করে। আমার কাজের জন্য, কিছুদিন আগে কয়েকটা কেমিকেল কিনতে কলকাতার মেছুয়া বাজারে গেছিলাম। মিত্রের দোকানে। ফেরার সময় হাওড়া ব্রিজের জ্যামে আটকে পড়ি। বাড়ি ঢুকে দেখি, মা টেনশনে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এত দেরি দেখে, মা ভেবেছে আমি দুর্ঘটনায় পড়েছি। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারকাকাকে ডাকতে হয়েছিল।

বিকেলের দিকে এই সময়টায় মা দোতলার বারান্দায় বসে বই পড়ে। মাঝেমধ্যে ডোমজুড় লাইব্রেরি থেকে বই পাল্টে এনে দিই আমি। আজ বই পাল্টাতে হবে কি না, তা জানার জন্য উপরে ওঠার কথা ভাবছি, এমন সময় দেখি, মা ড্রয়িংরুমে ঢুকছে। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "তুই যে আন্দুলে যাবি বললি, গেলি না?"

বললাম, "যাব মা। তুমি কি বই পাল্টাতে দেবে?"

"না। আজ থাক। স্বামী অভেদানন্দের বইটা এখনও শেষ করে উঠতে পারিনি। হ্যাঁ রে, একটু আগে ফোনে চিৎকার করে তুই কার সঙ্গে কথা বলছিলি?"

"সুব্রতদা, মা।"

"কবে এল? ওরা সব ভাল আছে?"

"জিজ্ঞেস করিনি।"

"সে কী রে? ও বাড়ির খবর কি তুই কিচ্ছুই জানিস না?"

"না তো? কী হয়েছে মা?"

মা একটু অবাক হয়েই আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "মিলিকে নিয়ে তো ও বাড়িতে খুব অশান্তি।"

"তাই নাকি? তুমি কী করে জানলে মা?"

"সুব্রতর মা তো আমাকে ফোন করেছিল। বলল, মিলির বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। সুব্রতরই পরিচিত। থাকে ফ্রান্সে। কিন্তু মিলি নাকি বেঁকে বসেছে, ওই ছেলেকে বিয়ে করবে না।"

"আমাকে আগে বলোনি কেন মা। তা'লে সুব্রতদাকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম।"

"ভুলে গেছি বাবা। ছেলেটা এখন কলকাতায়। মিলিকে খুব পছন্দ। অথচ মিলি বেঁকে বসেছে। রাগারাগি করে একদিন নাকি বাড়ি থেকেও বেরিয়ে গিয়েছিল।"

কথাগুলো শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এত সব ঘটনা মিলিদের বাড়িতে ঘটে গেছে ; অথচ আমি কিছুই জানি না। মিলি আগে মাঝেমধ্যে এ বাড়িতে ফোন করত। আমি করি না বলে বোধহয় বিরক্ত হয়েই এখন ফোন করা ছেড়ে দিয়েছে। এটা অবশ্য আমার অনুমান। সারাটা দিন অফিস করার পর ও গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনে যায় ফরাসি শেখার জন্য। এমনও হতে পারে, সময় পায় না। গোলপার্ক থেকে শোভাবাজার কম রাস্তা!

শেষবার মিলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল ক্রিসমাসের দিন। মাকে নিয়ে আমি শোভাবাজারে গেছিলাম। প্রায় মাসখানেক আগের কথা। তখন তো মাসিমা বা মেসোমশাই মিলির বিয়ের কথা তোলেননি? কেন যে ও বিয়ে করতে চাইছে না, জিজ্ঞেস করলে মিলি নিশ্চয়ই আমাকে বলবে। বাড়িতে ও যে সব সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারে না, স্বচ্ছন্দে সেই সমস্যা নিয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে। বিয়ের ব্যাপারে কেন আমাকে কিছু জানায়নি, ভেবে অবাক লাগল। মাকে বললাম, "আজ আন্দুল থেকে ফিরেই মিলিকে ফোন করব।"

মা সোফায় বসে বলল, "এই সময়ে ওদের বাড়িতে আমার একবার যাওয়া উচিত ছিল রে শিবা। কিন্তু শরীরটা ভাল ঠেকছে না। রাস্তার ধুলো-বালি আমার সহ্য হবে না। মেয়েটা এত ভাল... দ্যাখ বিয়েতে রাজি করাতে পারিস কি না। আমার তো ইচ্ছে ছিল, অন্য রকম। তা আর হল কই?"

মায়ের ইচ্ছেটা আমি জানি। কিন্তু সেটা হওয়ার নয়। সেজন্য আর কথা বাড়ালাম না। বেরোনোর জন্য পা বাড়াতেই মা বলল, "সাবধানে যাস বাবা। আর পারলে, ফেরার সময় জায়ফল কিনে আনিস।"

"কোন দোকানে পাওয়া যাবে মা?"

"দত্ত-র দোকানে পাবি। জোজো রাতে পোলাও খেতে চাইল। সে জন্য দরকার।"

"ঠিক আছে।" বলেই বাইরে বেরিয়ে এলাম। জায়ফলের তেল আমার কাছে আছে। পারফিউম তৈরিতে লাগে। শুধু জায়ফলই নয়, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, বেশির ভাগ মশলাই আমরা, পারফিউমাররা ব্যবহার করি সুগন্ধি তৈরি করতে। ভার্সেইয়ের ইন্সটিটিউটে শিখে এসেছি। লোকে যখন পারফিউম মাখে, তখন বুঝতে পারে না কত কী মিশিয়ে সুগন্ধিটা তৈরি করা হয়েছে। আমরা টের পাই। কোনও পারফিউম নাকে এলেই, বুঝতে চেষ্টা করি তাতে কী কী মেশানো হয়েছে। গন্ধের ভেতর ডুব দিই। সাঁতরে দেখার চেষ্টা করি। আর মনে মনে তা মিলিয়ে নিই। গন্ধ দেয়, এমন কোনও জিনিস নেই, যা পারফিউমে কাজে লাগে না।

আমাদের বাড়িতে সদর দরজার লাগোয়া লাল রঙের একটা রক আছে। তার পাশেই ছোট্ট গ্যারেজ। ফ্রান্স থেকে ফেরার পর একটা মারুতি এইট হান্ড্রেড কিনেছিলাম। সেটা রাখার জন্য বানিয়েছি গ্যারেজটা। কলকাতায় কখনও গেলে মারুতিটা ব্যবহার করি। আর ডোমজুড়ে চলা-ফেরার জন্য একটা বাইক কিনেছি। জোজোও মাঝেমধ্যে বাইকটা নিয়ে বেরোয়। কাল কোথায়ও গেছিল। হেড লাইটটা খারাপ করে এনেছে। গ্যারেজ থেকে বাইকটা বের করার সময় কথাটা মনে পড়ল। আন্দুল থেকে ফিরতে ফিরতে সাতটা-সাড়ে সাতটা হয়ে যাবে। তখন মোরামের উঁচু-নিচু রাস্তা দিয়ে আসতে আমার অসুবিধে হবে। জোজোকে মাঝেমধ্যে বকি, বাইক নিয়ে বেরোস না। ও শোনেই না আমার কথা।

বাইকটা আজই কোথাও সারিয়ে নিতে হবে। কথাটা ভাবতে ভাবতে লনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। বৃষ্টির জন্য নরম হয়ে আছে লনটা। বাইক চালালে চাকা পিছলে যেতে পারে। গেটের বাইরে অবশ্য খানিকটা পিচের রাস্তা। ওখানেই বাইকে স্টার্ট দেব। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখি, আকাশটা একটা ছবির মতো হয়ে আছে। কালো মেঘের ফাঁকে লালচে রঙ। এইসব বিকেলগুলো আমার দারুণ লাগে। আমি ছাদে উঠে যাই। পায়চারি করতে করতে সূর্যাস্ত দেখি। আকাশের রঙ বদলায়। আর বদলে যাওয়া রঙগুলোর সঙ্গে আমি গন্ধ মেলাই।

আগে জানতাম না। পারফিউম নিয়ে পড়াশুনো করতে গিয়ে জানতে পেরেছি, রঙের সঙ্গে গন্ধের সম্পর্ক আছে। কথাটা শুনতে একটু অদ্ভুত লাগছে। তবুও সত্যি। ফুলের গন্ধ মানেই হলুদ আর সাদা। ফলের গন্ধের রঙ সিঁদুরে। ভেষজ গন্ধ হল হালকা বাদামি। মশলার গন্ধ কালচে। গন্ধের কথা মনে হতেই হঠাৎ মনে পড়ল, কাল সকালে শুভ্রা এসে আমাকে নতুন একটা পারফিউম তৈরি করে দিতে বলেছিল, যাতে চন্দনের গন্ধ থাকবে। শুভ্রা আমার দূর সম্পর্কের জ্যাঠতুতো বোন। থাকে অবশ্য খুব কাছেই। আজই কোন এক বন্ধুর বিয়েতে যাবে। তাকে এই পারফিউমটা উপহার দেবে। মাঝেমধ্যে এই সব ছোট্টখাটো অনুরোধ আমাকে রাখতে হয়। খুব ঘনিষ্ঠ লোকেদের। আমি ওদের চমকে দিই, মনোমতো সেন্ট তৈরি করে।

আমাদের বাড়ির লনটা বেশ বড়। ছোটবেলায় যখন শোভাবাজার থেকে পার্বতীপুরে ছুটি কাটাতে আসতাম, তখন এই লনে আমরা গরমকালে ফুটবল আর শীতকালে ব্যাডমিন্টন খেলতাম। এখন লনে আমি ফুলের চাষ করি। পশ্চিমদিকে পুকুর পর্যন্ত সারি সারি ফুলের গাছ লাগিয়েছি। গোলাপ, জুঁই, বেল, চাঁপা। ভোরবেলায় আর বিকেলে মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে বেড়ায়। প্রজাপতির মেলা বসে যায়। গন্ধগুলো আমি আলাদা করে শুঁকতে পারি। কোনটা জুঁই, কোনটা চাঁপা, বা কোনটা বেল। আমাদের এখানে গোলাপের তেমন গন্ধ হয় না। জাতটাই খারাপ। গোলাপ এডওয়ার্ড। বালগেরিয়ান গোলাপের গন্ধ পেতাম ভার্সেইয়ে আমাদের ইন্সটিটিউটে। পাগল করে দিত সেই গন্ধ।

যাক সে কথা। জুঁইয়ের গন্ধ বুক ভরে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বেশ দেরি হয়ে গেছে। শুভ্রার জন্যই আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে। আমি না-আসা পর্যন্ত ও বিয়ে বাড়িতে যেতে পারবে না। ফাঁকা রাস্তায় বাইক ছুটিয়ে দিলাম। মিনিট পাঁচেক পর ভুলেশ্বরের মন্দিরের কাছে পৌঁছতেই হঠাৎ মনে হল, এই যাঃ, কাল যে সুব্রতদা এসে আমাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করবে, তা তো মাকে বলা হল না!

॥ দুই ॥

ডোমজুড়ে তারা স্টোর্স, মানে দত্তের দোকানে জায়ফল পাওয়া গেল না। ওরা বলল, "মাকড়দার দিকেই তো যাচ্ছেন। বাজারে পেয়ে যাবেন।" মনে মনে হিসাব করে নিলাম। আন্দুল থেকে ফেরার সময় মাকড়দা হয়ে আসা যায়। কিন্তু তখন দোকান-পাট খোলা পাব কি না সন্দেহ। তার চেয়ে মাকড়দা হয়ে আন্দুল যাওয়া ভাল। হাইওয়ের দিকে বাইক ছুটিয়ে দিলাম। ডোমজুড় অঞ্চল এখন বেশ ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। মিনি বাস আর সাইকেল রিকশার খুব দৌরাত্ম্য। একদিন একটা মিনিবাস প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়েছিল। কোনওরকমে সেদিন প্রাণটা বাঁচাই। কথাটা কাউকে অবশ্য বলিনি। মা জানতে পারলে, বাইক চড়া আমার বন্ধ করে দিত।

মাকড়দা যাওয়ার পথেই হাইওয়ের বাঁ দিকে লাইব্রেরিটা পড়ে। ছোট্ট একতলা হলঘর। হাজার দশেক বই আছে। নানা ধরনের ম্যাগাজিন পড়ার জন্য বিকেলের দিকে ছেলে-মেয়েরা ভিড় করে। মায়ের জন্য বই পাল্টাতে সপ্তাহে দু'তিনবার এই লাইব্রেরিতে আমাকে আসতেই হয়। হলঘর কোনওদিন খালি দেখিনি। যে ছেলেটা লাইব্রেরিয়ান, তার নাম রমেন। আমারই বয়সী। ওর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ডোমজুড়ে খুব বেশি লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। মেশামেশির ব্যাপারে আমিও খুব একটা আগ্রহ দেখাই না। কিছু লোক অবশ্য আমাকে চেনে চৌধুরীবাড়ির ছেলে বলে। পার্বতীপুরে আমাদের বাড়িটার খুব নাম।

রমেন ছেলেটাকে আমার ভাল লাগে। বি এ পাশ। এখনও চাকরি পায়নি। বেশ মার্জিত, সংস্কৃতিমনস্ক ছেলে। এই অঞ্চলে সবাই ওকে চেনে। লোকের আপদ-বিপদে প্রথমেই দৌড়ে যায়। বছরখানেক হল, ডোমজুড় থেকে ও একটা পাক্ষিক কাগজ বের

করেছে। ডোমজুড় কথা। আট পাতার ট্যাবলয়েড কাগজ। আমার কাছ থেকে আগাম এক বছরের চাঁদা নিয়ে রেখেছে। কাগজটা নিয়মিত পাঠিয়ে দেয় বাড়িতে।

বাইক চালিয়ে লাইব্রেরির কাছে আসতেই দেখলাম, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রমেন একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। মেয়েটার হাতে বই। বোধহয় মেম্বার। বই বদলাতে এসেছে। কাছে যেতেই রমেন হাত তুলে আমাকে দাঁড় করাল। তারপর বলল, "কোথায় চললেন শিবাশিসদা? আজ তো আপনার আসার কথা নয়।"

বললাম, "মাকড়দা যাচ্ছি। একটা জিনিস কেনার জন্য।"

"একটু দাঁড়ান। এ দিকে এসেছেনই যখন, কাগজের লেটেস্ট ইস্যুটা তখন সঙ্গে নিয়ে যান। প্রেস থেকে আজই ছেপে এসেছে।"

বাইকে ভটভট শব্দ হচ্ছিল। ইঞ্জিনটা বন্ধ করে বললাম, "কেমন চলছে তোমার কাগজ?"

"বেশ ভাল। এই ইস্যুটার বেশ কাটতি হবে। বাই দ্য বাই, এই মেয়েটার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। সুস্মিতা সিংহরায়। দফরপুরে থাকে। হবু সাংবাদিক। ফ্রিল্যান্স করে।"

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলাম। ছিপছিপে শরীরের গায়ের রং শ্যামলা। কিন্তু চোখ দু'টো খুব সুন্দর। বয়স তেইশ-চব্বিশ। পরনে ঘিয়ে রঙের একটা সালোয়ার কামিজ। মেয়েটা এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে, রমেনকে বলল, "এর পরিচয় আমাকে দিতে হবে না। আমি চিনি। এর এক জ্যাঠতুতো বোন শুভ্রা আমার বন্ধু।" কথাগুলো বলেই ফের ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। ওর হাসিটা আমার খুব ভাল লাগল।

রমেন ঠাট্টা করে বলল, "কী মনে হচ্ছে শিবাশিসদা? এর দ্বারা জার্নালিজম হবে?"

বললাম, "আমার মতো লোকের খবর যে রাখে, তার অবশ্যই হবে। তোমার কাগজের কাজে লাগিয়েছ নিশ্চয়।"

"মাঝেমধ্যে দয়া করে লেখা-টেখা দেয়। এই সংখ্যাতেই সুস্মিতার একটা লেখা আছে। পড়ে দেখবেন। সেনসেশনাল। দাঁড়ান, আগে এনে দিই কাগজটা।" কথাটা বলেই রমেন হল ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল।

গেটের সামনে সুস্মিতা আর আমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একটু অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু সুস্মিতার মধ্যে কোনও রকম জড়তা নেই। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ও মিটিমিটি হাসছে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "শিবাশিসদা, আপনি তো পার্বতীপুরে থাকেন। ওখানে কৃষ্ণকমল চৌধুরী বলে কাউকে চেনেন?"

কৃষ্ণকমল চৌধুরী আমার আপন কাকা। কিন্তু ছোটকাকার সঙ্গে আমাদের এখন তেমন সম্পর্ক নেই। সম্পর্কটা খারাপ বাবার আমল থেকেই। সে কথা তো আর সুস্মিতাকে বলা যায় না। তাই পাল্টা জিজ্ঞাসা করলাম, "ভদ্রলোককে তোমার কী কারণে দরকার?"

"একটা ইন্টারভিউ নিতাম। ভদ্রলোকের একটা ফ্যাক্টরি আছে গন্ধপুরের দিকে। পারফিউম ফ্যাক্টরি। দীর্ঘদিন ধরে সেটা বন্ধ। কেন, সে ব্যাপারেই একটু কথা

বলতাম। ভদ্রলোককে ধরতেই পারছি না। যখনই গন্ধপুরে যাচ্ছি, দারোয়ান বলছে, বাবু নেই।"

গন্ধপুরের ফ্যাক্টরিটা বেঙ্গল পারফিউমসের। ছোটকাকা একা মালিক নয়। আমাদেরও অংশ আছে তাতে। কিন্তু এখন কোনও কর্তৃত্ব নেই। বাবার সঙ্গে ছোটকাকার সম্পর্ক খারাপ হওয়ার মূলে ওই ফ্যাক্টরি। সে এক বিরাট ইতিহাস। এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে ওই ফ্যাক্টরি খোলা একা ছোটকাকার পক্ষে সম্ভব না। আইনগত অনেক জটিলতা আছে। কিন্তু সুস্মিতার কী দরকার ছোটকাকার সঙ্গে? প্রশ্নটা করতেই ও বলল, "কাগজ-কলমে এখনও এই অঞ্চলের কিছু লোক ওই ফ্যাক্টরির কর্মী। তাঁরা অনেকে এখনও পাওনা-গণ্ডা পাননি। কৃষ্ণকমলবাবু তাঁদের ঠকিয়েছেন। ভাবছি, ডোমজুড় কথায় এটা নিয়ে একটা ইস্যু করব। লোকাল ইন্টারেস্টের খবর না ছাপলে কাগজের বিক্রি বাড়ানো যাবে না।"

শুনে মনে মনে তারিফ করলাম মেয়েটার। সবে সাংবাদিকতা শুরু করেছে। তবু কাগজের বাণিজ্যিক দিকটা নিয়ে ভাবছে। ওর গলায় বেশ ঝাঁঝ। ছোটকাকার উপর তা হলে বেশ চটে আছে। এই মেয়েটার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা দরকার। ফ্যাক্টরিটা নিয়ে আমার নিজের কিছু চিন্তা-ভাবনা আছে। সেটা এখনই কাউকে বলছি না। আমি সুযোগের অপেক্ষায় আছি। তাই বললাম, "কৃষ্ণকমল চৌধুরীর সঙ্গে যদি দেখা করতে চাও, তা হলে রোববার আমাদের বাড়িতে চলে এসো। আমি একজন লোক দিয়ে দেব। তিনি তোমাকে হেল্প করতে পারবেন।"

"কোন সময়টায় গেলে সুবিধে হবে?"

"বেলা দশটা-সাড়ে দশটায়।"

"ঠিক আছে। আমি কলকাতার একটা কাগজেও লিখি। এই খবরটা ওখানেও দেব। এই কৃষ্ণকমল চৌধুরী লোকটাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

সুস্মিতা বড় কাগজেও লেখে শুনে একটু অবাক হলাম। নিশ্চয়ই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট। না হলে কলকাতার বিজনেস পেপারে লেখার সুযোগ পাবে কী করে? বুঝলাম, রমেন ওর সম্পর্কে একটু কম করেই বলেছে আমাকে। ইচ্ছে হল, একবার জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু প্রথম আলাপেই একটা মেয়ের সম্পর্কে এত আগ্রহ দেখানো উচিত নয়। পরে জানা যাবে।

সুস্মিতা আমাকে কী একটা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, রমেনকে বেরিয়ে আসতে দেখে চুপ করে গেল। রমেনের হাতে ডোমজুড় কথার একটা কপি। আমার দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই নিন, সুস্মিতার লেখাটা কেমন লাগল, পড়ে আমাকে বলবেন।"

"নিশ্চয়ই বলব।" বলেই আমি হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। বেশ জোরে বাতাস বইছে। আকাশে কালো মেঘ। এখনই বৃষ্টি নামতে পারে। আর দেরি করা উচিত হবে না। বাইকে স্টার্ট দিয়ে বললাম, "চলি রমেন। সুস্মিতা রোববার আমার বাড়িতে আসছে। পারলে তুমিও চলে এসো। অনেকক্ষণ আড্ডা মারা যাবে।"

কথাটা শেষ করে আর দাঁড়ালাম না। বাইক ছুটিয়ে দিলাম মাকড়দার দিকে। আগে জায়ফল কিনতে হবে। তারপর, আন্দুল। হাইওয়ের এ দিকটায় লোকজন কম। দু'পাশে জলা জমি। বসতি নেই বললেই চলে। সন্ধের পর ছিনতাই, খুনখারাপিও হয়। কোনও কোনওদিন জলায় লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই রাস্তাটা দিয়ে তাই আমি আন্দুল যাই না। বাধ্য হয়ে আজ আমাকে আসতে হল।

বাইক চালাতে চালাতে ছোটকাকার কথা মনে পড়ছে। এইবার আমার সঙ্গে লাগবে। বাবা ভাল মানুষ ছিলেন। কিছু বলেননি। আমি কিন্তু ছোটকাকাকে ছেড়ে দেব না। একটা অত বড় চালু ফ্যাক্টরি নষ্ট করে দিয়েছে। নিজে গুছিয়ে নিতে গিয়ে। ছোটকাকাকে আমিও শিক্ষা দিতে চাই। বাবাকে কম হেনস্তা করেছে? তখন ছোট ছিলাম, জবাব দিতে পারিনি। এখন তো বড় হয়েছি। ছাড়ব কেন? সত্যি বলতে কী, এই যে ফ্রান্সে গিয়ে অত কষ্ট করে পারফিউমে ডিগ্রি নিয়ে এলাম, তা ছোটকাকাকে পাল্টা মারের জন্য। আমার টার্গেট, নিজে একটা ফ্যাক্টরি খুলব। কৃষ্ণকমল চৌধুরীকে দেখিয়ে দেব, আমি পারি।

ভাবতে ভাবতেই মাকড়দার বাজারে পৌঁছে গেলাম। দশকর্মার দোকান থেকে জায়ফল কিনে বেরোবার মুখেই বৃষ্টি। বাজারে অনেক চালাঘর। সকালে কাঁচা আনাজ বিক্রি হয় এই সব চালাঘর থেকে। একটায় ঢুকে পড়লাম। মাথাটা যাতে বাঁচানো যায়। বাঁ দিকে মাকড়চণ্ডীর মন্দির। সন্ধ্যারতির উদ্যোগ চলছে। মিস্তির কাকার সঙ্গে অনেকদিন আগে একবার এদিকে এসেছিলাম। সেদিন উনি চমৎকার একটা কথা বলেছিলেন, "মাকড়দায় দেখার মতো জিনিস মাত্র চারটে। প্রথমে দেবালয়। মানে, মায়ের এই মন্দির। পাশেই বিদ্যালয়। বামাসুন্দরী ইন্সটিটিউশন। তারপর রঙ্গালয়। চণ্ডীরূপা সিনেমা হল। আর শেষে হল গিয়ে যমালয়। শ্মশান।"

কথাটা এত ভাল লেগেছিল, ভুলিনি। আমাদের এই অঞ্চলে অনেক চণ্ডী মন্দির। শুনেছি, আমাদের এখানে সরস্বতী নদীর ওপর দিয়েই নাকি চাঁদ সওদাগর একটা সময় তাঁর সপ্তডিঙ্গা নিয়ে বাণিজ্যে যেতেন। যাত্রাপথে তিনি যখন যেখানে চণ্ডীমায়ের পুজো করেছেন, পরবর্তীকালে সেখানে মন্দির স্থাপিত হয়েছে। সেই সরস্বতী নদী এখন অবশ্য হেজে মজে গেছে। এখন নর্দমা।

বেশ জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। হোগলা পাতার ফাঁক দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। চালা ঘরে না ঢুকে মন্দিরে গিয়ে দাঁড়ালেই বোধহয় ভাল করতাম। রুমাল বের করে মাথাটা বাঁচানোর চেষ্টা করছি, এমন সময় পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, "শিবাশিসদা না?"

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। পাশের চালা ঘরে আমারই বয়সী একটা ছেলে দাঁড়িয়ে। পরনে পঞ্জাবি আর চোস্ত। একসময় বোধহয় স্বাস্থ্যচর্চা করত। ভেজা পাঞ্জাবির ভেতরে বুকের পেশিগুলো দেখে তা বোঝা যাচ্ছে। গলায় সোনার মোটা চেন। আঙুলে গোটা চারেক আঙটি চকচক করছে। চিনতে পারলাম না। ছেলেটা আমার মুখ দেখেই সেটা বুঝতে পারল। তারপর বলল, "আমাকে ভুলে গেছেন বোধহয়। আমি জয়ন্ত। জয়ন্ত কর্মকার। কোচাইয়ের সঙ্গে আগে খুব যেতাম আপনাদের

বাড়িতে।"

কোচাইয়ের কথা তোলায় এইবার ছেলেটাকে চিনতে পারলাম। মিত্তির কাকার ছেলে কোচাই। ছুটিছাটায় যখন ডোমজুড়ে বেড়াতে আসতাম, তখন এই জয়ন্ত প্রায়ই ফুটবল খেলতে আসত কোচাইয়ের সঙ্গে। চেহারায় অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। দেখেই মনে হচ্ছে, ভাল রোজগার করে। কিছু বলতে হয়, তাই বললাম, "অনেকদিন তোমাকে দেখিনি। এখন কি ডোমজুড়েই থাকো?"

"না শিবাশিসদা, মুম্বইয়ে থাকি। দিন কয়েক হল, একটা কাজে এসেছি।"

"কী করো ওখানে?"

"সোনার গয়না সেটিংয়ের কাজ। মাধ্যমিক পাশ করার পর আর পড়তে ইচ্ছে করল না। দাদা জাভেরিবাজারে এই সেটিংয়েরই কাজ করত। এক গুজরাতির দোকানে। বলল, চলে আয়। কাজটা যদি শিখে নিতে পারিস, তা হলে কোনওদিন অন্নের অভাব হবে না। নাইন্টি ওয়ানে ওখানে চলে গেলাম। গিয়ে ভালই করেছি।"

ডোমজুড়ে এমন অনেক পরিবার আছে, যাদের কেউ না কেউ জাভেরিবাজারে মণিকারের কাজ করে। সোনার গয়নার সূক্ষ্ম কারুকার্যে এদের খুব নাম। বংশ পরম্পরার ঐতিহ্য। একেক জন লাখ লাখ টাকার কাজ করে। বছরে একবার বা দু'বার এরা ডোমজুড়ে ছুটি কাটাতে আসে। তখন বোঝা যায়, এদের হাতে কত পয়সা। যেমন, জয়ন্ত ছেলেটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

বৃষ্টি কমার কোনও লক্ষণ নেই। আজ বোধহয় আন্দুলে যাওয়া সম্ভব হবে না। এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে যাওয়া উচিতও না। আরও আগে বাড়ি থেকে আমার বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল। আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য জয়ন্ত এক লাফে এ দিকের চালাঘরে এসে দাঁড়াল। রুমাল বের করে ও মুখ মুছছে।

ওর গা থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। চার্লি? হ্যাঁ, চার্লিই। ফুলের গন্ধ। আমাদের ভাষায়, ফ্লোরাল টোন। গোলাপ, জুঁই, ইলাং ইলাং ফুল থেকে তৈরি করা। এই ইলাং ইলাং ফুল হয় ইন্দোনেশিয়ায়। জয়ন্ত কী বলে যাচ্ছে। আমার মন কিন্তু গন্ধটার দিকে। আমি কিছু শুনছি না।

ভার্সেইয়ে ইন্সটিটিউটের প্রফেসররা চার্লিকে পারফিউম বলেই মানতেন না। অমেরিকানদের তৈরি বলে। ওঁরা সব সময় বলতেন, "জয়, শ্যানেল নাম্বার ফাইভ, ডিওরেসিমা, কার্তিয়ের, সামসারা-র কাছে চার্লি কিছুই না।" পরে বুঝেছি, পারফিউম নিয়ে ফরাসিদের ইগো এত বেশি, অন্য কারও তৈরি ব্র্যান্ড পাত্তাই দিতে চায় না। ফরাসিরা যাই বলুক, চার্লির বাজার কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে। তুলনায় দাম কম। প্রথম দিকে মেয়েরা ব্যবহার করত। পরে পুরুষরাও মাখতে শুরু করে। রেভলন কোম্পানি পরে ঝন্টু নামে একটা পারফিউম বের করেছিল মেয়েদের জন্য। কিন্তু চার্লির মতো ঝন্টু বাজার পায়নি।

"শিবাশিসদা, কোচাই এখন কী করছে?"

প্রশ্নটা শুনে আমার সংবিৎ ফিরল। বললাম, "তেমন কিছু না। একটা রঙের ফ্যাকটরিতে চাকরি করছে।"

জয়ন্ত আক্ষেপ করল, "ইস, ওর আরও ভাল কিছু করা উচিত ছিল। এত ব্রিলিয়ান্ট একটা ছেলে... জানেন শিবাশিসদা, বাঙালি ছেলেদের না, কোনও অ্যাম্বিশন নেই। সেই স্কুল, কলেজ, চাকরি, বিয়ে... ব্যস, জীবন শেষ।"

বললাম, "ঠিক বলেছ।"

"মুম্বইয়ে না গেলে ঠিক বুঝতে পারতাম না, জগৎটা কী। এখানে আমি বন্ধুবান্ধবদের বলি, বসে থাকিস না। যে কোনও ছোটখাটো ব্যবসা শুরু কর। খুব খারাপ লাগে যখন দেখি, একটা চাকরির আশায় বসে থেকে এরা কত সময় নষ্ট করছে। শিখতে হয় গুজরাতিদের কাছ থেকে।"

"কী রকম?"

"গোঁফ গজালেই ধান্ধায় বসে যায় ওরা। বাপ-ঠাকুর্দা বসিয়ে দেয়। ওদের দেখাদেখি মরাঠিরাও শিখে গেছে। আগে জাভেরিবাজারে হীরে কাটিংয়ের একচেটিয়া কাজ করতাম আমরা বাঙালিরা। এখন মরাঠিরা আমাদের রাইভাল হয়ে যাচ্ছে। একদিন দেখবেন, জাভেরিবাজার আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাবে।"

প্রথম দিকে জয়ন্তকে পাত্তা দিচ্ছিলাম না। এখন ওর কথা শুনতে বেশ ভাল লাগছে। সত্যি কথা বলছে। বাইরে না বেরোলে জগৎটাকে ঠিক চেনা যায় না। ফ্রান্সে না গেলে আমিও চিনতাম না। আজ থেকে দশ-বারো বছর আগে বাড়ির কেউ যদি আমাকে বলত, পারফিউম বিজনেস তোর রক্তে আছে। নিজেকে সেই ভাবে তৈরি কর। আমি হয়তো করতাম। কিন্তু বাবা চাইল, আমি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হই। গন্ধপুরের ফ্যাক্টরির রাস্তাটা আমাকে চেনালই না। মা বোঝাল, "ছোটকাকার সঙ্গে ঝামেলায় গিয়ে লাভ নেই। তুই অন্য কিছু কর।" ভাগ্যিস, ওই সময় সুব্রতদা আমার মাথায় ঢুকিয়েছিল, "তুই পারফিউম নিয়ে পড়াশুনো কর।" তাই আজ একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। আমি দাঁড়াবই। এমন মাথা তুলে দাঁড়াব, সারা বিশ্বে হইচই পড়ে যাবে।

"জানেন শিবাশিসদা," জয়ন্ত বলল, "একেক সময় মনে হয় জাভেরিবাজারে যত বাঙালি কারিগর আছে, সবাইকে ডেকে বলি, চলুন বাংলায় ফিরে যাওয়া যাক। জাভেরিবাজারের মতো একটা বাজার গড়ে তোলা যাক ডোমজুড়ে। বাপ বাপ বলে ওরা তখন কাজ নিতে আসবে আমাদের এখানে। এত ফাইন কাজ পাবে কোথায়?"

"তা করছ না কেন?"

"কী করে সম্ভব বলুন? এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে? বাইরে থেকে যাঁরা কাজ করাতে আসবেন, একবার এই হাইওয়ে দিয়ে এলে, আর আসার ঝুঁকি তাঁরা নেবেন? রাস্তা ঘাট খারাপ, কোনও নিরাপত্তা নেই। মাঝে মাঝে আমাদেরই আসার ইচ্ছে উবে যায়। তারপর, পার্টির অত্যাচার তো আছেই। ক্যাডাররা তোলা আদায়ের কাজে নেমে যাবে। সরকারের কোনও হেলপ পাবেন না। পুরো ব্যবসাটা চৌপাট হয়ে যাবে।"

যা বলছে জয়ন্ত, সব ঠিক। আমার নিজেরও খুব বাজে অভিজ্ঞতা হচ্ছে। নিজে পারফিউম তৈরির ছোট্ট একটা ফ্যাক্টরি করব বলে মাস ছয়েক ধরে চেষ্টা করছি।

শিল্পোন্নয়ন পর্ষদে গিয়ে কয়েকবার হাঁটাহাটিও করলাম। কিন্তু কেউ পাত্তাই দিতে চায় না। রাজ্যের ছেলে বলে আমাদের বাড়তি কোনও সুবিধাই নেই। জয়ন্ত বলল, মহারাষ্ট্রে শিবসেনারা খুব সাহায্য করছেন মরাঠি ব্যবসায়ীদের। করাই তো উচিত। বাংলায় বসে বাজোরিয়া-কানোরিয়া-জালানরা কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিচ্ছেন। আর আমরা ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সুব্রতদার বাবা একদিন আমাকে বললেন, "তুমি ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে কিছু করার চেষ্টা করো বাবা।" শুনে কয়েকটা দিন ব্যাঙ্কে ঘোরাঘুরি করলাম। রাষ্ট্রায়ত্ত একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বেশ উৎসাহ দেখালেন। কুড়ি লাখ টাকার প্রোজেক্ট। ভাবলাম, লোন পাওয়া যাবে। কিন্তু পরে লোক মারফত জানতে পারলাম, লাখ তিনেক টাকা ঘুস দিতে হবে। শুনে ওই ব্যাঙ্কে আর পা বাড়াইনি। আমি নিশ্চিত, কোনও জালান বা খৈতান এই সুযোগটা পেলে হয়তো নষ্ট করতেন না। লোন-টা নিতেন কিন্তু লোন শোধ করার তাগিদ দেখাতেন না।

জয়ন্তর সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রায় সাড়ে ছ'টা বেজে গেল। বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। কমার কোনও লক্ষণ নেই। আশ পাশের দোকান আস্তে আস্তে বন্ধ হচ্ছে। চালাঘরের নীচে তাই অন্ধকার। মন্দিরের দরজার ফাঁক দিয়ে তেরছা আলো এসে পড়েছে বাইরে। সেই আলোয় আবছা দেখতে পাচ্ছি। স্কুলের দিকটায় কিছু লোকজন আছে। মন্দিরের ভেতরেও। বৃষ্টি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করব কি না, ঠিক করতে পারলাম না। বৃষ্টির মধ্যে বাইক চালাতে পারব না। কারণ হেড লাইটটা খারাপ।

পিচের রাস্তার দিক থেকে হঠাৎ জোরালো দু'টো হেড লাইট কয়েকটা চালাঘর ছুঁয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ইঞ্জিনের শব্দে বুঝলাম, মারুতি। বৃষ্টির মধ্যেই দরজা খুলে কেউ বোধহয় নামল। একটু পরে হেড লাইটের আলোয় দেখলাম, দু'টো ছেলে। একজনের হাতে টর্চ। কাউকে খুঁজছে। অন্য জন বলল, " শুয়ারের বাচ্চাটা একটু আগেই এখানে ছিল লখাদা।" লখা নামের ছেলেটা হিস হিস করে বলল, "পালাবে কোথায়? পেলে আজই শালাকে জলায় পুঁতে ফেলব। আমাদের সঙ্গে হারামিগিরি করা...।"

কয়েকটা চালাঘর ঘুরে লখা টর্চের আলোয় আমাকে দেখতে পেয়ে, কাছে এসে অন্য ছেলেটাকে বলল, "না বাচ্চু, এ নয়।"

লখা বা বাচ্চু—কারা, বুঝতে পারছি না। কাকে খুঁজছে, জানি না। আমাদের ডোমজুড়ে অ্যান্টি সোশাল কম। সেই অর্থে, কোনও দাদার নাম কখনও শুনিনি। কিন্তু মাকড়দা অঞ্চলে আমার মেলামেশা নেই। এখানে মাস্তান থাকলেও থাকতে পারে। ছেলে দু'টো যে সাধারণ ছিনতাইবাজ নয়, তা বোঝাই যাচ্ছে। তা হলে মারুতি করে আসত না। পার্টির ছেলে হতে পারে। কোনও রাজনৈতিক ঝামেলাও হতে পারে। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, চালাঘরের নীচে জয়ন্ত নেই। এই একটু আগে বকবক করছিল। গেল কোথায়? ছেলে দু'টো কি ওকেই খুঁজতে এসেছে? হতে পারে। না হলে ও নিঃশব্দে সরে পড়বে কেন?

চালাঘর থেকে নেমে ছেলে দু'টো মন্দিরে গিয়ে ঢুকল। ওদের হাব ভাব দেখে ভাল লাগল না। ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই। হঠাৎ চোখে পড়ল, মারুতির ভিতর আরও

একজন বলে। চোখাচুখি হতে লোকটা কাচ তুলে দিল। আশপাশের দোকানগুলোতে ঝটপট ঝাঁপি পড়ে যাচ্ছে। কাঁচা আনাজের ব্যাপারীরা কৌতূহলী চোখে ছেলে দু'টোকে দেখছে। দেখে মনে হল, ওরা ছেলে দু'টোকে চেনে আর চেনে বলেই তাড়াতাড়ি সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। হঠাৎই টর্চ হাতে ছেলেটা, মানে লখা দৌড়ে এসে মুখ খিস্তি করে আমাকে বলল, "এই যে একটু আগে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে তোর সঙ্গে গল্প করছিল, সে কোথায় গেল রে?"

ইচ্ছে হল, ঠাস করে একটা চড় মারি। তবুও মাথা ঠাণ্ডা রেখে বললাম, "জানি না।"

বাচ্চু বলে ছেলেটাও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে আমার কলারটা খামচে ধরে বলল, "জানিস না মানে? দু'টো লাথি খেলেই সুড়সুড় করে বলবি।"

কলারটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, "ভদ্র ভাবে কথা বলো।

"ইঃ ভদ্রতা।" লখা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে মুখ ফিরিয়ে বলল, "এই বাচ্চু, এই মালটাকেই ঠেকে নিয়ে চল।"

কথাটা বলেই লখা আমার হাত ধরে টানতে শুরু করল। হঠাৎ মাথায় রক্ত উঠে গেল। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, "কী চাইছ তোমরা বলো তো?"

আমি যে প্রতিবাদ করব, লখা বোধহয় আশা করেনি। মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, "সেটা আমার ঠেকে গেলেই টের পাবি।"

এই সব পরিস্থিতিতে আমি কোনও দিন ভয় পাই না। জীবনে নানা অভিজ্ঞতা এটা আমাকে শিখিয়েছে। ইন্সটিটিউটে আমাদের সঙ্গে পড়ত আলজিরিয়ান, মরক্কোন, মেক্সিকান আর ফরাসি ছেলেরা। আমাদের সঙ্গে র‍্যাগিংয়ের চেষ্টা করত ফরাসিরা। হোস্টেলে প্রায়ই হাতাহাতি হয়ে যেত। ফরাসিরা তাচ্ছিল্য করে আমাদের বলত, "তেঁত দ্য রুঈ।" অর্থাৎ কি না ভেতো, নির্বোধ। আলভাজ বলে একজন মেক্সিকান ছেলে তখন আমার রুম মেট। ও-ই আমাকে প্রয়োজনে টাফ হতে শেখায়। পরে তাতে সুফল পেয়েছি। তাই উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে লখাকে বললাম, "অত সোজা? তুই বললেই আমাকে তোদের ঠেকে যেতে হবে?"

"যাবি না মানে?" বলেই লখা ডান হাত চালাল।

মাঝপথেই ধরে ফেললাম। তারপর হাতটা সামান্য মুচড়ে দিয়ে বললাম, "ভুল জায়গায় মাস্তানি করে ফেলেছিস। ইচ্ছে করলে তোর এই হাত আমি ভেঙে দিতে পারি। দেব নাকি?"

লখা প্রাণপণে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করেও পারছে না। ওর চোখ-মুখ কুঁচকে গেছে যন্ত্রণায়। হাতটা উল্টো দিকে সামান্য চাপ দিয়েই ছেড়ে দিলাম। উফ্ বলে ও চেঁচিয়ে উঠল। তারপর হাত ধরে বসে পড়ল। ওর মুখ দিয়ে ভকভক করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। জামার কলারটা ধরে ওকে টেনে তুলতে তুলতে এবার বললাম, "এই হাতটা তিন-চার দিন আর নাড়তে পারবি না। মাকে বলিস, খাইয়ে দেবে।"

বাচ্চু বোধহয় কল্পনাও করতে পারেনি সঙ্গীর এই অবস্থা হবে। কিন্তু নেশার ঝোঁকে, মাস্তানি করার জন্য পকেট থেকে ছুরি বের করল। ওর এক হাতে টর্চ, অন্য

হাতে ছুরি। দু'পা ফাঁক করে ও শরীরের উপর দিকটা নড়াচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ছুরি ধরার গ্রিপ দেখেই বুঝলাম এই ছেলেটা আরও আনাড়ি।

চালা ঘরের নীচে যে কিছু একটা হচ্ছে, বাজারের লোকজন বুঝতে পেরে গেছে। মন্দিরের সামনে কিছু লোক বিস্ফারিত চোখে এ দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এক লাফে আমি চালাঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দশকর্মার দোকানের আলোয় এবারে লখা আর বাচ্চুকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছি। বৃষ্টির তোড় কমে গেছে। তবুও ভিজে গেলাম। বাচ্চুর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "রক্তারক্তি আমি পছন্দ করি না। যা, এখনও সময় আছে, পালা।"

উত্তরে বাচ্চু মায়ের নাম তুলে গালাগাল দিল। শুনেই আমার মাথায় খুন চেপে গেল। ডান পায়ে ভর দিয়ে, শরীরটা এক পাক ঘুরিয়ে বাঁ পায়ে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি মারলাম। বাচ্চু ছিটকে চলে গেল একটা চালা ঘরের নীচে। কাদায় ওর সর্বাঙ্গ মাখামাখি। টর্চটা উড়ে পড়েছে মন্দিরের দোরগোড়ায়। ও হামাগুড়ি দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে দেখে ফের ডান পায়ে লাথি চালালাম। এ বার পাঁজর লক্ষ্য করে। বাচ্চু আর উঠতে পারল না। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর তখনই আমি পায়ের ডিমে চিনচিনে একটা ব্যথা অনুভব করলাম। প্যান্টের ফোল্ডার তুলে দেখি, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

॥ তিন ॥

ফোকোর দোকানের সামনে সুব্রতদার গাড়ি এসে দাঁড়াল ঠিক সাড়ে ন'টায়। আধ ঘণ্টা লেট। তবু কথা রেখেছে শেষ পর্যন্ত। সকাল বেলায় জোজো মাকড়দায় গেল। যাওয়ার সময় আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে। ঠায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বসে আছি ফোকোর দোকানে। পা-টা অনেকক্ষণ ধরে টনটন করছে। ঘুম থেকে উঠেই শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল। কাল বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। সুব্রতদা বাঁ দিকের সামনের দরজাটা খুলে দিল। সিটে বসতেই শুনি, "গুডমর্নিং শিবাদা।"

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, মিলি। চোখাচোখি হতেই হাসল। পরনে তুঁতে রঙের সিন্থেটিক শাড়ি। খুব সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে। আজ সকাল থেকেই মন বলছিল, সুব্রতদার সঙ্গে মিলি আসবে। তবু অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বললাম, "আরে মিলি, তুমি?"

"কেমন সারপ্রাইজ দিলাম, বলো।"

"সত্যি, মা তোমাকে দেখে অবাক হয়ে যাবে।"

মিলি কী যেন বলতে যাচ্ছিল, সুব্রতদা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এই শিবা, তোদের এখানে কোথাও মিনারেল ওয়াটার পাওয়া যায়? এতটা ড্রাইভ করে এসেছি, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে।"

আপ্পারাওয়ের মন্দিরের পাশেই একটা রেস্তোরাঁ আছে। নিরালা। কোনওদিন

ওখানে ঢুকিনি। ওখানে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তাই বললাম, "কখন রওনা দিয়েছ, বাড়ি থেকে?"

"সেভেন থার্টি। তোদের এই যে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে, না কী একটা হয়েছে, বোগাস। সিক্সটির বেশি স্পিড তোলা যায় না। তারপর মাকড়দা বলে জায়গাটায় একটা ঝঞ্ঝাটে পড়লাম। না হলে ঠিক সময়েই পৌঁছে যেতাম।"

"কী ঝঞ্ঝাট গো মাকড়দায়?"

"জ্যাম। হাইওয়ের পাশে জলায় একটা তোদের বয়সী ছেলের ডেডবডি পাওয়া গেছে। তোদের এদিককারই নাকি ছেলে। দিন কয়েক আগে মুম্বই থেকে এসেছিল বেড়াতে। মার্ডার হয়ে গেছে।"

চট করে জয়ন্তর কথা মাথায় এল। লখা আর বাচ্চু কি শেষ পর্যন্ত ওকে ধরতে পেরেছিল? বোধহয় না। জয়ন্তর কিছু হলে ফোকোর দোকানে বসে নিশ্চয়ই তা শুনতে পেতাম। ডোমজুড়ে এটা বড় ঠেক। জয়ন্ত বেশ পরিচিত ছেলে। ও মার্ডার হলে এতক্ষণে ওই চায়ের দোকানে খবর চলে আসত। বললাম, "আগে এখানে খুন খারাপি হত না। ইদানীং খুব হচ্ছে।"

গাড়ি চালাতে চালাতে সুব্রতদা বলল, "এ সব খতরনাক জায়গায় কেউ থাকে? তুই কি এখানেই পড়ে থাকবি? এত করে বললাম, প্যারিসেই ফিরে চল। তোর লাইনে এত সুযোগ ওখানে। প্যারিস হল গিয়ে পারফিউম ওয়ার্ল্ডের ক্যাপিটাল। তুই কানেই দিচ্ছিস না কথাটা।"

সত্যি, গত দেড় বছরে সুব্রতদা দেড়শোবার এই কথাটা বলেছে। কিন্তু আমি পাত্তা দিইনি। আমি তো মন ঠিক করেই ফেলেছি। পিছনে আর তাকাব না। প্যারিসে বসে যা করতে পারতাম, এখানে বসেই তা করে ফেলেছি। যাক, সে কথা সুব্রতদাকে বলে লাভ নেই। আমাকে ভালবাসে বলেই, বারবার একই কথা তোলে।

সুব্রতদার গা থেকে ডিওরেসিমোর গন্ধ বেরোচ্ছে। গন্ধটা লিলি অফ ভ্যালিজের। বেশ দামি। তিরিশ মিলিলিটার বোতলের দামই হাজার চারেক টাকার। বেশ সেজেগুজে এসেছে সুব্রতদা। সবুজ লা কস্তে টি শার্ট। ঘিয়ে রঙের ট্রাউজার্স। শোভাবাজারের দেব বাড়ির ছেলেরা একটু ফর্সা হয়ই। প্যারিসে থাকে বলে সুব্রতদা আরও বেশি ফর্সা। চোখ মুখ থেকেও আলাদা একটা ঔজ্জ্বল্য ঠিকরে বেরোচ্ছে। এক পলক তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, "তুমি তো কাল বললে না, কী কারণে আসছ?"

"বলছি, দাঁড়া। গলাটা আগে একটু ভিজিয়ে নিই। সারাটা দিন আছি। আজ আবার কোনও কাজ-ফাজ রাখিসনি তো?"

"না।"

"গুড। তোর সঙ্গে গল্প করার জন্যই মিলি এল।"

নিরালা রেস্তোরাঁর কাছে গাড়িটা পৌঁছতেই সুব্রতদাকে গাড়িটা থামাতে বললাম, নেমে গিয়ে মিনারেল ওয়াটারের একটা বোতল চেয়ে নিলাম। সুব্রতদার মতলবটা বুঝতে পারছি না। গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বোতলে চুমুক দিচ্ছে। যেন কোনও তাড়া নেই। অথচ কাল বলেছিল, 'ইটস এ লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোয়েশ্চেন।' আশপাশে

তাকাতে তাকাতে সুব্রতদা হঠাৎ বলল, "তোদের এখানকার মেয়েরা এত চার্মিং কেন বল তো শিবা?"

প্রশ্নটা শুনে চমকে তাকালাম। প্যারিসে থাকা একটা লোক হাওড়ার মেয়েদের প্রশংসা করছে! কথাটা মিলির কানেও গেছে। ও হাসতে শুরু করেছে। ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে সুব্রতদাকে বললাম, "হঠাৎ এ কথা তোমার মনে হল।"

"কেন? ভুল বললাম নাকি? ওই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ। ওই যে বইয়ের দোকানটা থেকে বেরিয়ে আসছে..... কত বয়স হবে, চৌদ্দ বা পনেরো। হাইট পাঁচ ফুট ছয় তো হবেই। হাঁটাটা দেখেছিস? পামেলা বোর্দোর মতো। একেই যদি সাজিয়ে গুছিয়ে প্যারিসের কোনও ফ্যাশন শো-তে নামিয়ে দিস, তা হলে হইচই পড়ে যাবে। মেয়েটাকে একবার ডাকবি। কথা বলব।"

বললাম, "সুব্রতদা, প্লিজ গাড়িতে ওঠো। এখানকার লোকজন আমাকে খুব একটা চেনে না। তোমার জন্য আমি গণধোলাই খেতে পারব না।"

"কেন গণধোলাই খাবি কেন? আমি তো প্রশংসাই করছি। জানিস, মেয়েরা কত খুশি হয় এতে। এই যে সাত সকালে উঠে মিলি এত সেজেগুজে এল, তোর উচিত ছিল না বলা, বাহ মিলি তোমাকে দারুণ লাগছে। সত্যি শিবা, তোর কাণ্ডজ্ঞান দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

"তোমার সামনে বলব কেন?"

বোতলে চুমুক দিয়ে সুব্রতদা বলল, "তোদের নিয়ে এই প্রবলেম। এত গোপনীয়তার কী আছে বল তো? এদ্দিন প্যারিসে থেকেও ওদের কিছু শিখলি না? ওখানকার ছেলে-মেয়েরা কত খোলামেলা, দেখিসনি? মেট্রোতে তোর পাশে ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে দিব্যি চুমু খেতে খেতেই তো....."

সুব্রতদার বোধহয় মাথার ঠিক নেই। গাড়ির ভিতর বসে মিলি সব শুনতে পাচ্ছে, অথচ যা খুশি তাই বলে যাচ্ছে। থামানোর জন্যই বললাম, "সুব্রতদা, বোতলটা নিয়েই বাড়ি চলো। দেরি হয়ে যাচ্ছে। মা কিন্তু ব্রেকফাস্ট রেডি করে বসে আছে।"

সুব্রতদা বলল, "শিবা, একটা কাজ করলে হয় না। আগে তোদের বাড়ি না গিয়ে যদি খাটোরাতে যাই, তা হলে কেমন হয়? খাটোরায় আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে বলে মনে হয় না। এখানে কোথাও ফোন আছে? মাসিমাকে একটা ফোন করে দে না, পরে আসছি।"

"যেমন তোমার ইচ্ছে।" বলেই আমি রাস্তার উল্টোদিকে জগবন্ধু মেডিকেল স্টোর্সে গিয়ে ঢুকলাম। মায়ের ওষুধ কেনার জন্য মাঝেমধ্যে এই দোকানটায় আমাকে আসতে হয়। জানি, ফোন আছে। ফোন করব বলতেই দোকানের মালিক রিসিভারটা এগিয়ে দিলেন। সুব্রতদার খেয়ালিপনা তো জানি। হঠাৎ হঠাৎ মত বদলায়। ব্রেকফাস্টের পুরো আয়োজন নষ্ট হবে জেনেও মাকে বললাম, "আগে আমরা খাটোরায় যাচ্ছি। বাড়ি যেতে ঘণ্টা খানেক দেরি হবে।"

ফোনটা ছাড়ব, এমন সময় মা বলল, "শিবা, এখুনি তোর একটা ফোন এসেছিল। ফ্রান্সের সেই ভদ্রলোক রে, যার কথা চিঠিতে তুই খুব লিখতি। বেনোনিল দুগারি।

তোকে তাজ বেঙ্গলে ফোন করতে বলেছে।"

মঁসিয়ে বেনোনিল আমাকে ফোন করেছিলেন? ইস, এই সময়টায় আমি বাড়িতে নেই। আপসোস হতে লাগল। কাল রাতে মাকড়দা থেকে ফিরে আমারই ফোন করা উচিত ছিল। কিন্তু পা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম, মঁসিয়ে বেনোনিলের কথা আমার মনেই পড়েনি। পায়ে চোট লাগার কথা অবশ্য বাড়িতে কাউকে বলিনি। মা শুনলে অযথা টেনশনে পড়ত। কাল রাতেই আমার টিটেনাস নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। এখন বেশ টনটন করছে। মনে মনে ঠিক করলাম, আজ সুব্রতদারা চলে গেলেই ডাক্তার কাকাকে পা-টা একবার দেখিয়ে নেব। আর বেলার দিকে অবশ্যই একবার ফোন করব মঁসিয়ে বেনোনিলকে।

নিরালার কাছে ফিরতেই দেখি, সুব্রতদা গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে রেখেছে। এবার পিছনের সিটে মিলির পাশে বসলাম। ওর গা দিয়ে শ্যানেল নাম্বার ফাইভের গন্ধ বেরোচ্ছে। সুব্রতদা যতবার আসে, নানারকম পারফিউম নিয়ে আসে। আমাকেও এনে দিয়েছে। তবে আমি নিজে কোনও পারফিউম ব্যবহার করি না। আমাদের পারফিউম ব্যবহার করা উচিতও না। একটা গন্ধের প্রতি আসক্তি থাকলে অন্য গন্ধের তারতম্য বুঝতে অসুবিধে হবে।

হাওড়া-আমতা রোড পেরিয়ে খাটোরার দিকে সুব্রতদা গাড়ি ঘোরাতেই মিলি ফিসফিস করে আমাকে বলল, "দাদা এখন আকাশে উড়ছে।"

"সকাল থেকেই সেটা বুঝতে পারছি। কী ব্যাপার বলো তো?"

"প্রেমে পড়েছে।"

সুব্রতদা প্রেমে পড়েছে, ওটা আমার কাছে খবর। তবে সেই প্রেম কতদিনের জন্য আমার সন্দেহ আছে। সৌভাগ্যবতী মহিলাটি কে? জিজ্ঞেস করায় মিলি বলল, "তোমাদের এদিককারই মেয়ে। এখন বিয়ের প্রপোজাল দিতে যাচ্ছে।"

"সারপ্রাইজিং। সুব্রতদা আর মেয়ে পেল না।"

"দাদার কি কোনও কিছুই সারপ্রাইজিং বলে তোমার মনে হয়?"

"সে কথা ঠিক। কিন্তু সুব্রতদার সঙ্গে এই ভদ্রমহিলার আলাপ হল কী করে?"

"কলকাতায়। দাদার এক বন্ধুর বাড়িতে। আমি এখনও দেখিনি। তবে দাদার কথায় নাকি বিউটি কুইন।"

"ডোমজুড়ের জন্য এই প্রথম আমার গর্ব হচ্ছে মিলি।"

কথাটা শুনে মিলি হেসে উঠল। ওর হাসি শুনে সংবিৎ ফিরল সুব্রতদার। গাড়ি থামিয়ে বলল, "রাস্তায় তো কোনও ইন্ডিকেটার নেই। আর কদ্দূর রে শিবা?"

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, সামনেই একটা স্কুল আর খেলার মাঠ। দু'দিকে দু'টো রাস্তা চলে গেছে। তার মানে খাটোরায় এসে গেছি। উল্টো দিক থেকে একটা ছেলে হেঁটে আসছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ভাই, সুপ্রতিম ঘোষালের বাড়িটা কোনদিকে বলতে পারো?"

"ওই তো ডান দিকে। হলুদ রঙের বাড়ি। বলবেন, হিয়াদিদের বাড়ি। তা হলেই দেখিয়ে দেবে।"

মিলি ফুট কাটল, "বাবা-র থেকে দেখছি, মেয়েরাই বিখ্যাত রে দাদা। লক্ষণ ভাল না।"

হলুদ রঙের বাড়ির সামনে গাড়িটা থামাতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন সৌম্য দর্শন এক ভদ্রলোক। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। বয়স ষাটের কাছাকাছি। ইনিই তা হলে সুপ্রতিম ঘোষাল। মিলিকে দেখে ভদ্রলোক আন্তরিক গলায় বললেন, "এসো মা, এসো। তুমি নিশ্চয়ই মিলি মা।"

বাইরে থেকে বোঝা যায় না। বাড়ির ভেতর ঢুকে বুঝলাম, সুপ্রতিমবাবুরা বেশ বিত্তশালী। ড্রয়িং রুমটা বেশ সাজানো-গোছানো। মেঝেতে কাশ্মিরী কার্পেট। তিন দিকে বেশ দামি সোফা। দেয়ালে মকবুল ফিদা হুসেনের একটা অয়েল পেন্টিং। সোফায় বসতেই ভেতরে যাওয়ার দরজার দিকে চোখ গেল। কয়েকটা কৌতূহলী চোখ। বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছে না, পাত্রটা কে? আমি, না সুব্রতদা।

সুপ্রতিমবাবু বললেন, "পথে কোনও অসুবিধে হয়নি তো বাবা?"

মিলি বলল, "না। না মেসোমশাই। আমি পরিচয় করিয়ে দিই। এ হচ্ছে শিবাশিসদা। আপনাদের এ দিকেই পার্বতীপুরে থাকে। আর ইনি আমার দাদা। সুব্রত দেব।"

সুপ্রতিমবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, " তুমি পার্বতীপুরের ছেলে? চৌধুরীদের কেউ হও নাকি বাবা?"

বললাম, "হ্যাঁ। আমার বাবার নাম দেবাশিস চৌধুরী। চেনেন?"

"চিনব না মানে? তোমার ঠার্কুদা তো কৃষ্ণপদ চৌধুরী। বেঙ্গল পারফিউমের মালিক। এ অঞ্চলের গর্ব। তোমার বাবা তো কলকাতায় থাকতেন। কেমন আছেন এখন?"

"বাবা নেই।"

"ও হো। খুব বেশি বয়স তো হয়নি তোমার বাবার। আমার থেকে কিঞ্চিৎ ছোটই ছিলেন। উনি মাঝেমধ্যেই রামপুরের বিলে মাছ ধরতে যেতেন। তখন আমারও অ্যাঙ্গলিংয়ের খুব শখ ছিল। এখানে ছুটি-ছাটায় এলে আমিও মাছ ধরতে যেতাম। তখন তোমার বাবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হত। কত বড় বংশের ছেলে তুমি জানো? তোমাদের বেঙ্গল পারফিউমের খুশবু সেন্ট সারা ভারতে চলত। আমরা বোম্বেতে বসে পেতাম। তখন বাইরে থেকে তো পারফিউম আসত না। খুশবু সেন্ট....."

সুপ্রতিমবাবু আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে থামিয়ে দিলেন এক ভদ্রমহিলা। ঘরে ঢুকে তিনি বললেন, "আবার তুমি পুরনো গল্প শুরু করেছ? তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।"

দেখেই মনে হল, সুপ্রতিমবাবুর স্ত্রী। পরনে তাঁতের দামি শাড়ি। একেবারে লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো মুখ। ভদ্রমহিলা বেশ লম্বা। মিলির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, "আমি কেয়া-হিয়ার মা। ভেতরে চলো। এখানে আর দশ মিনিট বসলে তোমাদের মেসোমশাই ডোমজুড়ের পুরো ইতিহাস শুনিয়ে ছাড়বেন।"

এ বাড়িতে ঢোকার পর থেকে সুব্রতদা কোনও কথা বলেনি। সব চুপচাপ লক্ষ

করে যাচ্ছিল। হঠাৎ ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করল, "হিয়া কোথায়? কাল যে ফোনে বলল, আমার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে।"

সুপ্রতিমবাবুর স্ত্রী বললেন, "ওর কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না বাবা। সেই সকাল থেকে বেরিয়েছে। কখন ফিরবে কে জানে? বাপের আস্কারা পেয়ে আমার এই মেয়েটা বয়ে গেছে। চলো বাবা, ভেতরে চলো। কেয়ার ঠাকুরমা তোমাকে দেখতে চাইছেন। উনি অসুস্থ। নীচে নামতে পারেন না।"

মিলি আর সুব্রতদাকে নিয়ে উনি ভেতরে চলে গেলেন। ওরা জোরাজুরি করা সত্ত্বেও আমি গেলাম না। পা-টা টনটন করছে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করতে গেলেই ব্যথা লাগবে। ড্রয়িংরুমে বসে আমি আর সুপ্রতিমবাবু গল্প করতে লাগলাম। ভদ্রলোককে আমার বেশ ভাল লাগছে। মাত্র কয়েক মিনিট হল এ বাড়িতে পা দিয়েছি। কিন্তু মনে হচ্ছে, এরা অনেক দিনের চেনা। সুব্রতদার কপালটা সত্যিই ভাল। এমন একটা পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা হতে যাচ্ছে।

কথায় কথায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা কি অনেকদিন ধরে এই অঞ্চলে আছেন?"

"হ্যাঁ বাবা। তা একশো বছর তো হবেই। বলতে পারো চার পুরুষের বাসিন্দে। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা চাকরি করতেন হ্যামিল্টন অ্যান্ড সন্স কোম্পানিতে। সে আমলে ওটা খুব বিখ্যাত জুয়েলারির কোম্পানি ছিল। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা খোদ সাহেবদের কাছ থেকে জুয়েলারির কাজ শিখেছিলেন। ওঁর এক বন্ধু তখন থাকতেন নিবড়ে গ্রামে। চেনো জায়গাটা? এখন যেটাকে তোমরা নিবিড়া বল। তাঁর নাম ছিল চন্দ্রকান্ত কর্মকার। তা, আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা ওই চন্দ্রকান্ত কর্মকারের সঙ্গেই একটা সময় মুম্বইয়ে চলে যান। সোনার গয়না সেটিংয়ের কাজে খুব নাম ছিল দুজনের। এরপর আমার প্রপিতামহ যান মুম্বইয়ে। ক্রমে ক্রমে এটাই আমাদের পৈতৃক ব্যবসা হয়ে দাঁড়ায়। আমিও বছর দুয়েক আগে পর্যন্ত মুম্বইয়ে ছিলাম। শেষ পর্যন্ত পালিয়ে এলাম।"

সুপ্রতিমবাবুর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ জয়ন্ত কর্মকার বলে ছেলেটার কথা মনে পড়ে গেল। মাকড়দা বাজারে চালাঘরের নীচে দাঁড়িয়ে ছেলেটা আমার কাছে কাল সন্ধেবেলায় অনেকক্ষণ ধরে মুম্বইয়ের গল্প করেছিল। সুপ্রতিমবাবুর আর্থিক সচ্ছলতার কারণ, না হয় বুঝলাম। কিন্তু ভদ্রলোক 'পালিয়ে এলাম' কথাটা বললেন কেন? আমাকে অবশ্য জিজ্ঞেস করতে হল না। উনি নিজেই বলতে লাগলেন, "ওখানে আর থাকতে পারলাম না, আমাদের কিছু বাঙালি ছেলের বেইমানির জন্য। বেশি লোভ করতে গিয়ে এরা আমাদের খুব বদনাম করে দিয়েছিল।"

"কী রকম?"

"আসলে কী জানো বাবা, সোনার ব্যবসা খুব একটা ক্লিন ব্যবসা না। আন্ডার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে একটা লিঙ্ক আছে। দুবাই থেকে চোরাই সোনা আসে। জাভেরি বাজারে এমন কোনও বিজনেসম্যান নেই যে, স্মাগলড গোল্ড নিয়ে কাজ করে না। তারা গয়না তৈরি করে দেয়। সেই গয়না চোরাপথে ফের চলে যায় দুবাইতে।

স্মাগলড গোল্ডের তো কোনও রেকর্ড থাকে না। অনেক সময় একটা চিরকুট আর পুঁটলি মারফত সোনা এক হাত থেকে অন্য হাতে যায়। পুরোটাই বিশ্বাসের ব্যাপার। সোনা নিয়ে কেউ পালিয়ে গেলে পুলিশের কাছে যাওয়া যায় না। কিন্তু আন্ডার ওয়ার্ল্ডের লোকজন ঠিক তাকে খুঁজে বের করে। আমাদের এই ডোমজুড়ের কয়েকটা ছেলে ওই দুষ্কর্মটি করতে গিয়ে মাঝপথেই নিখোঁজ হয়ে গেছে। তা, পাঁচ-সাত বছর আগে কেশবপুরের একটা ছেলেকে আমি জাভেরি বাজারে নিয়ে গেছিলাম। ছেলেটার নাম বিশ্বপতি। ওই যে বললাম, লোভ। একদিন দশ কেজি সোনা নিয়ে সে পালিয়ে গেল। আন্ডার ওয়ার্ল্ডের লোকজন এমন পিছনে লাগল, আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। তোমার মাসিমা তখন বললেন, জীবনে যথেষ্ট রোজগার করেছ, এখন দেশে ফিরে চলো।"

"পাকাপাকি চলে এলেন?"

"বলতে পারো। আমার তো পুত্রসন্তান নেই। দু'টি মাত্র মেয়ে। ওদের বয়সের তফাত আট বছরের। বড় মেয়ের স্কুল-কলেজ সব মুম্বইয়ে। এম.এসসি করেছে। খুব ট্যালেন্টেড। মেয়েটাকে সুপাত্রে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত। আর ছোটটার স্কুলিং মুম্বইয়ে। একটু জেদি টাইপের। স্কুল থেকে বেরোবার পর ওকে আমি কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। বালিগঞ্জে আমার এক ভায়রাভাই থাকে। তার কাছে। ওখানেই বি. কম করেছে। বললাম, আরও পড়াশুনো কর। তা করল না। বাবা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কিছু মনে করবে না বলো?"

"না, না।"

"আমি মুখ্যসুখ্য মানুষ। জীবনে শুধু রোজগারই করেছি। হাই লেবেলে আমার জানাশুনোও কম। সুব্রত সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে পারিনি। হ্যাঁ বাবা, প্যারিসে সুব্রত ঠিক কী করে?"

"কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মেসোমশাই। সুব্রতদার মতো ছেলে পাওয়া কঠিন।"

"যাক বাবা। আসলে কী জানো, ওরা নিজেরাই বিয়ের ঠিক করেছে। বড় মেয়েকে নিয়ে তো চিন্তা নেই। আমার যা কিছু দুশ্চিন্তা, ছোটটাকে নিয়ে। ও যে ঠিক কী করতে চায় নিজেও জানে না।"

"কী করেন এখন?"

"তেমন কিছুই না। মাঝে একবার বলল, মডেলিং করবে। কলকাতায় গিয়ে দিন কয়েক রইল। ফিরে এসে বলল, দূর আমার দ্বারা মডেলিং হবে না। এখানে এখন বলছে, কিছু টাকা দাও। ব্যবসা করব। হেলথ ক্লাব খুলব। মাত্র কুড়ি বছর বয়স। কী বিজনেস করবে, বলো তো?"

শুনে আমার অবাকই লাগছে। আজ পর্যন্ত আমি কোনও বাঙালি মেয়েকে বলতে শুনিনি, বিজনেস করব। ছেলেরাই এই বয়সে ভাবে না! ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। সুপ্রতিমবাবুর দুই মেয়ের কাউকেই এখনও চোখে দেখিনি। তবে কথা শুনে মনে হচ্ছে দু'জনেই গুণী। বাড়ির ভেতর থেকে উলু দেওয়ার শব্দ ভেসে আসছে।

শাঁখেরও। তা হলে কি কোনও অনুষ্ঠান হচ্ছে? বুঝতে পারলাম না। শাঁখের শব্দ শুনে সুপ্রতিমবাবু একটু অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলেন, "এই দ্যাখো, ভেতরে শুভ কাজ শুরু হয়ে গেল। অথচ মেয়েটা এখনও ফিরে এল না। কোথায় যে যায়, বলেও যায় না। উফ্, ওর চিন্তায় আমার বোধহয় আরেকবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।"

কথাটা বলেই উনি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাস্তা দিয়ে ঘনঘন সাইকেল রিকশা যাতায়াত করছে। আর সুপ্রতিমবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছেন, কোনও রিকশা বাড়ির সামনে দাঁড়াল কি না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, চোখ-মুখে বিরক্তি নিয়েই উনি ভেতরে চলে গেলেন।

ড্রয়িংরুমে আমি একা বসে রইলাম। ভেতরে মনে হল, অনেক লোক। বোধহয় সুপ্রতিমবাবুর কিছু আত্মীয়স্বজনও এসেছেন। বাড়ির বড় মেয়ের বিয়ে। লোকজন আসাটাই স্বাভাবিক। সুব্রতদাকে ঘিরে নিশ্চয়ই আনন্দ হচ্ছে। প্যারিসে মাঝেমধ্যে সুব্রতদা বলত, "জানিস শিবা, পিঁড়িতে বসে বিয়ে আমার দ্বারা হবে না। ও সব বোকা বোকা ব্যাপার।" কথাটা মনে হতেই, হঠাৎ ইচ্ছে হল ভেতরে গিয়ে সুব্রতদার মুখটা একবার দেখে আসি। কথাটা সবার সামনে ফাঁস করে দিই।

সেন্টার টেবলে একটা ফ্যাশন পত্রিকা পড়ে রয়েছে। সেটা তুলে পাতা ওল্টাতে লাগলাম। বাড়ির দুই মেয়ের কেউ হয়তো কেনে। ঐশ্বর্য রাই সম্পর্কে বড় একটা আর্টিকেল বেরিয়েছে। মন দিয়ে পড়ছি, এমন সময় শুনলাম, "এক্সকিউজ মি, কাকে চান?"

মুখ তুলে দেখি, শুভ্রাদের বয়সী একটা মেয়ে। পরনে হাল্কা হলুদ রঙের সালোয়ার কামিজ। সুপ্রতিমবাবুর স্ত্রীর মুখটা যেন কেটে বসিয়ে দেওয়া। তবে চোখ দু'টো আরও উজ্জ্বল। মেয়েটা ঘাড় বেঁকিয়ে কৌতূহলী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। দেখেই বুঝলাম, হিয়া। ইচ্ছে করেই তাকিয়ে রইলাম। আমার বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা শিরশিরানি শুরু হল। জীবনে কোনও মেয়েকে দেখে এই প্রথম। হঠাৎই জুঁইয়ের গন্ধ পেলাম। সেই গন্ধের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আমি খুঁজতে লাগলাম, গোলাপ আছে কি না।

॥ চার ॥

বাড়িতে রমেনের ডোমজুড় কথা দিয়ে গেছে আজ। সকালে নজরে পড়েনি। ব্রেকফাস্ট করার পর নীচে ড্রয়িংরুমে এসে বসতেই চোখে পড়ল কাগজটা। ভাঁজ খুলে চোখের সামনে ধরতেই সোজা হয়ে বসলাম। সামনের পাতায় বড় বড় হেডিং "গন্ধপুরের কারখানা হাতবদল হচ্ছে।"

মানে? দ্রুত চোখ বোলাতে লাগলাম খবরটায়। লেখার শুরুতে সুস্মিতার নাম। "অতীতের বিখ্যাত সুগন্ধি কারখানা কলকাতার একটি সার কোম্পানি কিনে নিচ্ছে। মাকড়দার অনতিদূরে গন্ধপুরের এই কারখানাটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল। সম্প্রতি মালিকপক্ষ কারখানাটি বিক্রির ইচ্ছে প্রকাশ করলে শ্রমিকরা তাতে আপত্তি জানান।

কিন্তু এক রাজনৈতিক নেতার স্নেহধন্য এক ব্যবসায়ী বাষট্টি লাখ টাকায় কারখানাটি কিনে নিচ্ছেন। এক সময় যে কারখানা থেকে সুগন্ধি ছড়াত, আর কিছুদিনের মধ্যেই সেখান থেকে বেরুবে রাসায়নিক গন্ধ ছড়িয়ে আশপাশের মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটাবে। এই আশঙ্কায় মাকড়দা-ডোমজুড়ের পরিবেশ সচেতন কিছু মানুষ প্রতিবাদের উদ্যোগ নিচ্ছেন।"

খবরটা পড়ে মনে মনে রাগ হতে লাগল। আমাকে না জানিয়ে গন্ধপুরের কারখানাটা ছোটকাকা বিক্রি করে দিচ্ছে? গেল রবিবার সুস্মিতা আমাদের বাড়িতে এসেছিল। ওকে ছোটকাকার বাড়িতে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও কারণে বোধহয় ছোটকাকা কলকাতা থেকে আসেনি। সুস্মিতা ফিরে আসার পর আমি খোঁজ নিয়েছি, ছোটকাকার শরীর খারাপ ছিল। সুস্মিতা আজ আবার আসছে। আবার কাকার বাড়িতে যাবে। কারখানা বিক্রি সম্পর্কে ও আর কী জানে, সেটা আমাকে জানতে হবে।

কাল আমাদের মিলন সঙ্ঘের একটা মিটিং ছিল। আমাদের পার্বতীপুরের একটা মেয়ে দাবা খেলতে লন্ডনে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তাকে কিছু অর্থ সাহায্য করা দরকার। মিটিং সেরে ফেরার পথে কাকার বাড়ির পাশ দিয়ে ফিরছিলাম। দেখি, রকে দাঁড়িয়ে ছোটকাকা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। আমাকে দেখেও কথা বলল না। আমিও না-দেখার ভান করে চলে এলাম। তার মানে ছোটকাকা আজ এ বাড়িতে আছে। সুস্মিতা গেলে, পাবে।

মাঝে মাঝে আফসোস হয়। যদি গন্ধপুরের কারখানা হাতে পেতাম, এতদিনে বাজারে হইচই ফেলে দিতাম। গত এক বছরের চেষ্টায় আমি এমন একটা পারফিউম তৈরি করেছি, তা আজ পর্যন্ত কেউ পারেননি। এটা অবশ্য আমার ধারণা। একটা পারফিউম তৈরি করেই, বড় পারফিউমাররা চট করে বাজারে আনেন না। দীর্ঘদিন লোকের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, তবেই নিশ্চিত হন। বড় কোনও কোম্পানি পিছনে থাকলে এই সমীক্ষাটা করা সহজ হয়। আমার মাথার উপর কোনও ছাতা নেই। পায়ের তলায় জমিও তেমন শক্ত নয়। বন্ধুবান্ধবদের কয়েকজনকে পারফিউমটা দিয়েছি। বিশেষ করে, সদ্য বিবাহিতদের। ওরা তো বলল, ফল পেয়েছে। আমার পারফিউম ব্যবহার করে ওরা নাকি অনেক টগবগে হয়েছে। শারীরিক মিলনে তৃপ্তি পাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই যৌন ইচ্ছা বাড়ছে।

আমি জানি, এই পারফিউমটা বাজারে ছাড়লে প্রচুর বিক্রি হবে। আমাদের দেশে তো বটেই, বিদেশেও। কিন্তু তৈরিটা করব কোথায়? মাঝে একদিন আলোচনা হচ্ছিল সুপ্রতিমবাবুর সঙ্গে। এই ব্যবসা সংক্রান্ত কথা নিয়েই। উনি বললেন, "আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি বাবা, ব্যবসা যদি করতে চাও, তা হলে একটা স্টেপ নেওয়ার আগে পরের তিনটে স্টেপের কথা আগে ভেবে নেবে। না হলে কিন্তু তুমি তলিয়ে যাবে। এ সব খুব কাঠখোট্টা লোকেদের কাজ। তুমি বাবা, ক্রিয়েটিভ টাইপের ছেলে। তুমি কি এত গুছিয়ে চলতে পারবে?"

সত্যি বলতে কী, পরে সুপ্রতিমবাবুর এই কথাগুলো নিয়ে অনেক ভেবেছি। ফ্রান্স

থেকে ফিরে আসার পর আমি যা কিছু করেছি, তা কি ভবিষ্যতের কথা ভেবে করেছি? মোটেই তা নয়। উদ্যোগ নিয়ে যতবার অসফল হচ্ছি, প্রতিবার তাৎক্ষণিক সাফল্যের কথা ভেবে। উদাহরণ দিয়ে আমাকে বুঝিয়েছিলেন সুপ্রতিমবাবু, "জাভেরি বাজারের একটা ঘটনার কথা তোমাকে বলি বাবা। ওখানে গণেশ চতুর্থী বড় একটা ফেস্টিভ্যাল। একবার লোকাল কিছু বিজনেসম্যান পুজোর দায়িত্ব নিয়ে, আমাদের কাছে দশ হাজার, কুড়ি হাজার টাকার সব বিল ধরিয়ে দিল। আমরা কয়েকজন উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলাম। আমাদের একজন বিজনেসম্যান ছিল অচিন্ত্য হাজরা। লাখ লাখ টাকার কাজ হত ওর ঘরে। ও বেঁকে বসল, চাঁদা দেবে না। আমরা অনেক করে বোঝালাম। বুঝল না। গোঁ ধরে রইল। পরের স্টেপগুলো কী হবে, আমরা জানতাম। গণেশপুজোর দিন লোকাল কিছু মাস্তান এল। অচিন্ত্যর দোকান ভাঙচুর করল। মারধোর করে ওর কারিগরদের ভাগিয়ে দিল। কাস্টমার এলে ভয় দেখাতে শুরু করল। ব্যস, কাজকর্ম গুটিয়ে ওকে পালিয়ে আসতে হল। চাঁদা দেওয়ায় সে যাত্রায় আমরা বেঁচে গেছিলাম। পরে অবশ্য টিকতে পারলাম না। তবে আমরা সবাই বুঝতে পেরেছিলাম, সেবার কেন লোকাল ব্যবসায়ীরা গণেশপুজোর উদ্যোগ নিয়েছিল।"

সুপ্রতিমবাবুর সঙ্গে যত মিশছি, ততই ভদ্রলোক আমাকে আকর্ষণ করছেন। উনি এত অভিজ্ঞ, ঠিক পরামর্শটা দেন। আর কিছু করতে না পারুন, মনের জোরটা উনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। একদিন উনি বললেন, "দশ-পনেরো বছর আগে লোকে ব্যবসা করত ঢাকঢোল পিটিয়ে। দোকানে সাইনবোর্ড লাগাত। চটকদারিত্ব আনত। এখন কিন্তু নিয়ম সব পাল্টে গেছে বাবা। যে যত গোপনে ডিল করতে পারবে, সে তত বড় বিজনেসম্যান। তুমি কী করতে যাচ্ছ, কাউকে বলার দরকার নেই। সব সময় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকবে। তবে সুতোটা কখনও হাত থেকে ছাড়বে না। এই জিনিসটা ফলো করে দ্যাখো, সাকসেস পাও কি না।"

মাঝেমধ্যেই সুপ্রতিমবাবু ফোন করে আমার খোঁজখবর নেন। মায়ের সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেছে। বলেছেন, একদিন নাকি আমাদের বাড়িতে আসবেন। মা প্রায়ই আমাকে বলছে, সুপ্রতিমবাবুদের সবাইকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে। আমিই উৎসাহ দেখাচ্ছি না। মিত্তিরকাকার সামনেই একদিন কথা হচ্ছিল। উনি সুপ্রতিমবাবুকে খুব ভাল করে চেনেন। মায়ের সামনে কেয়াদি আর হিয়ার এত প্রশংসা উনি করলেন যে, মা একদিন বলেই বসল, "মেয়ে দুটোকে একদিন আমার কাছে নিয়ে আসবেন তো।" আমি একটু অস্বস্তিতে আছি। আমি চাই না, হিয়া মায়ের মুখোমুখি হোক।

"শিবাশিসদা, আসতে পারি?"

প্রশ্নটা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, সুস্মিতা। রমেনের সঙ্গে ওর আসার কথা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "এসো, ভেতরে এসো। রমেন কোথায়?"

সুস্মিতা ঘরের ভেতর ঢুকে সোফায় বসল। আজ ওর পরনে তাঁতের শাড়ি। সুন্দর লাগছে। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "আসবে। সকালে উঠেই জগদীশপুরের

দিকে গেছে। আমাকে ফোন করে বলল, তুমি একাই চলে যাও। আমি বেলা এগারোটা নাগাদ।"

বললাম, "এক-দু আগে তোমার রিপোর্টটাই পড়ছিলাম।"

"কোথায়? ডোমজুড় কথায়?"

"হ্যাঁ। কারখানা বিক্রির খবরটা তুমি পেলে কোথায়?"

"বিডিও অফিস থেকে।"

"কে কিনল, তার নামটা জানো?"

"জানি। বিপ্লব সাধুখাঁ। থাকেন কলকাতায়। গড়িয়াহাটে। রমেনদা তো বলছে, সারের কারখানা করতে দেবে না। লোকজন জড়ো করে আন্দোলনে নামবে।"

"কেন?"

"রমেনদার বাবাও ওই কারখানায় কাজ করতেন। টাকাপয়সা কিছু পাননি। তাছাড়া পুরনো এমপ্লয়িদের মধ্যে অনেকেই এসে ধরেছেন রমেনদাকে।"

"এদের সংখ্যা কত জানো?"

"রমেনদা বলতে পারবে। জানেন, ডোমজুড় কথায় খবরটা বেরোনোর পর ভাল রেসপন্স পাওয়া গেছে। যে সব এক্স-এমপ্লয়ি খবরটা জানতেন না, তাঁরাও গন্ধপুরের কারখানায় গিয়ে খোঁজ করেছেন। কাল নাকি গেট মিটিংও হয়েছে। কে কে চৌধুরীর সঙ্গে আপনি কথা বলিয়ে দেবেন, বলেছিলেন। ওঁকে কি পাওয়া যাবে?"

"মনে হয় পাওয়া যাবে। কাল বিকেলেও ওঁকে দেখেছি।"

"ওঁর সম্পর্কে কোনও তথ্য দিতে পারেন?"

"পারি। উনি আমার আপন কাকা।"

"মাই গড।" বলেই সুস্মিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "এই কথাটা রমেনদা জানে?"

"বলতে পারব না। জানে নিশ্চয়।"

"কারখানাটার মালিক কি একা আপনার কাকাই?"

"না। এটা আমাদের পৈতৃক ব্যবসা ছিল। তবে এখন আমাদের কোনও আগ্রহ নেই।"

"তাই বলুন।" সুস্মিতা যেন নিশ্চিত হল আমার কথাটা শুনে। তার পরই বলল, "জানেন শিবাশিসদা, কাল রাতে একটা লোক আমাদের বাড়িতে টেলিফোন করে আমার মাকে হুমকি দিয়েছে, মেয়েকে সাবধানে থাকতে বলবেন।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। কী বলেছে জানেন? আপনার মেয়ে রোজ কলকাতায় গিয়ে যে সব বাজে কাজ করে, তা আমরা জানি। এখানে আপনাদের থাকা প্রবলেম হয়ে যাবে। শুনে মা তো বেশ ভয় পেয়ে গেছে। বলছে, তোকে আর জার্নালিজম করতে হবে না। এ সব ঝামেলার কাজ মেয়েদের না।"

"তুমিও ভয় পেয়ে গেছ নাকি?"

"আপনার মাথা খারাপ? রিপোর্টারদের এ সব ঝঞ্ঝাট পোহাতেই হয়। আর দু'চার

দিন দেখি। তারপর ঠিক জেনে যাব, ঘোস্ট কল কোত্থেকে হচ্ছে।"

"— এখনই কৃষ্ণকমল চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে চাও?"

"যাওয়া যাবে?"

"চেষ্টা করে দেখতে পারো। আমাদের এই বাড়ি থেকে বেরিয়েই গুনে গুনে তিনটে বাড়ির পর মিলন সংঘ। তার পাশের লাল পাঁচিলওয়ালা বাড়িতেই উনি থাকেন।

সোফা থেকে উঠে সুস্মিতা বলল, "তা হলে আর সময় নষ্ট করব না। ঘুরে আসি। রমেনদা এলে আমার জন্য ওয়েট করতে বলবেন।"

সুস্মিতা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। আমি জানি, ছোটকাকা ওর সঙ্গে কথা বলবে না। হয়তো অপমান করে দেবে। তবুও পাঠালাম। ছোটকাকার উপর ওর রাগ হোক। আর রাগ হলে ওর জেদ বেড়ে যাবে। তখন নিজেই উদ্যোগ নিয়ে নানা খবর বের করে আনবে। সুপ্রতিমবাবুর দেওয়া ফর্মূলাটা আমি প্রয়োগ করব। কারখানার কোনও ব্যাপারে আগ্রহ দেখাব না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে রমেনদের উসকে দেব। দেখি, ছোটকাকা আন্দোলনটা সামলায় কী করে? পরিবেশ দূষণ এখন একটা ভাল বিষয়। সাধারণ মানুষ রমেনদের দিকে থাকবে। তারপর এমন কোনও ঘটনা ঘটাতে হবে, যাতে থানা-পুলিশ বা প্রশাসনের টনক নড়ে।

ভাবতে হবে। আমাকে অনেক খুঁটিনাটি ভাবতে হবে। ছোটকাকাকে এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে হবে, যাতে গন্ধপুরেই আর ঢুকতে না পারে। কী ভাবে সেটা সম্ভব? ছোটকাকা এমন মানুষ নয়, স্বেচ্ছায় সব ছেড়ে দেবে। যতটুকু দেখেছি, তাতে অমানুষই মনে হয়েছে। ছোটবেলায় একটা ঘটনার কথা মনে আছে। কোনও একটা কারণে ছোটকাকার এখানকার বাড়িতে আমরা নেমন্তন্ন খেতে গেছিলাম। আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। বাবা-কাকারা সবাই খেতে বসেছেন। ভাতে সামান্য একটা কাঁকর পেয়ে ছোটকাকা এত রেগে গেলেন, পেতলের বাটি ছুড়ে মেরেছিলেন কাকিমাকে। এই রকম একটা লোকের কাছ থেকে কি ন্যায় বিচার আশা করা যায়? কারখানা থেকে ছোটকাকাকে হটাতে গেলে আমাকে আরও নীচে নামতে হবে।

ফোনটা বাজছে। কর্ডলেসটা তুলে নিলাম। ও প্রান্তের গলাটা শুনে চিনতে পারলাম। কালুয়া। বললাম, "কেমন আছিস বল?"

"ভাল নেই শিবা। টাকা পয়সা দরকার।"

"কত?"

"শ'পাঁচেক। খুব ঠেকে গেছি। চাল কেনার পয়সা নেই।"

"কোত্থেকে ফোন করছিস?"

"তোমার কাছাকাছিই আছি। পাবলিক বুথ থেকে।"

"এসে নিয়ে যা। না, না, আসতে হবে না। মা এখনই নীচে নামবে। তোকে দেখলে আমাকে বকাবকি করবে। টাকাটা বিকেলে দিলে চলবে?"

"বিকেলে? তাই সই। কোথায় থাকব বলো।"

"নেহরু বালিকা বিদ্যালয়ের কাছে।"

"সে তো থানার কাছে হয়ে যাবে, বস। তার চেয়ে তুমি ফোকোর দোকানে এসো। বিকেল চারটেয় আমি থাকব।"

"ও কে।"

বলেই লাইনটা কেটে দিলাম। কালুয়া ডেঞ্জারাস টাইপের ছেলে। মা ওকে একদম পছন্দ করে না। শোভাবাজারে আমাদের বাড়ির পিছনেই একটা বস্তি ছিল। কালুয়ারা আগে সেখানেই থাকত। ছোটবেলা থেকে ওর সঙ্গে আলাপ। আমি যে বাড়ির ছেলে, তাতে কালুয়ার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাকার কথা নয়। তবু আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল ওর। এই কালুয়াই আমাকে প্রথম গঙ্গায় সাঁতার শেখায়। উত্তর কলকাতার নিষিদ্ধপল্লীতে কী হয়, তা বোঝায়। কৈশোরে আরও অনেক ব্যাপারে ও ছিল আমার গুরু। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, কালুয়া আর আমি একই দিনে জন্মেছিলাম।

আমি সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হলাম। ও গিয়ে পড়ল এক রাজনৈতিক নেতার খপ্পরে। বোমা বানাতে শিখল। পিস্তল আর পাইপগান চালাতে জেনে গেল। মাঝে মাঝে কোথাও দেখা হলে কিন্তু আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করত। দিদির পিছনে লেগেছিল রাজবল্লভ পাড়ার কয়েকটা ছেলে। একদিন নজরে পড়ায় কালুয়া ওদের এমন পেটাল, থানা-পুলিশ হওয়ার জোগাড়। ভোটের আগে একদিন শুনলাম, ও হাতিবাগানে কাকে নাকি মার্ডার করেছে। পুলিশ খুঁজছে। কালুয়া কিছুদিনের জন্য ফেরার। তারপরেই ভোট হওয়ার পর দেখলাম, ও দিব্যি পাড়ায় ঘুরছে। বাবা মারা যাওয়ার পর আমরা যখন পার্বতীপুরে এলাম, তখন কালুয়ার নামে ছয়টা মার্ডার কেস। ও শোভাবাজারের ত্রাস।

ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে একদিন মিলিদের বাড়ি থেকে পার্বতীপুর আসছি, হঠাৎ কালুয়ার সঙ্গে দেখা হল হাওড়ার বাস স্ট্যান্ডে। আমাকে দেখেই হাত তুলে দাঁড় করাল। সেই একই রকম আছে। কথায় কথায় বলল, "খুব ঝামেলার মধ্যে আছি শিবা। পাড়ায় ঢুকতে পারছি না। আগরওয়ালকে মার্ডার করার পরই পুলিশ আমার পেছনে। গণাদা মারা গেল। প্রোটেকশন দেওয়ারও লোক নেই আমার।"

"আছিস কোথায় এখন?"

"আন্দুলে। আমার এক স্যাঙ্গাতের কাছে। চুরি-ডাকাতি করে খেতে পারব না ভাই। আমরা প্রফেশনাল লোক। মাল নিয়ে কাজ করি। তোমার ফোন নম্বরটা দাও। যদি কোনওদিন দরকার হয়, ফোন করব।"

ফোন নম্বরটা দিয়েছিলাম। যখন হাতে কাজকর্ম থাকে না, টাকাকড়ির টান পড়ে, কালুয়া তখন আমাকে ফোন করে। মা জানে না। জানতে পারলে অসন্তুষ্ট হবে। কেন জানি না, ও যখন কিছু চায় তখন আমি না-করতে পারি না। আন্দুলে ওর কাছে একদিন আমি গেছিলাম। আশপাশের লোকজন ওকে দিলীপ নামে চেনে। ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে বসে। কেউ ওর পূর্ব ইতিহাস জানে না।

কালুয়ার কথা ভাবতে ভাবতেই ড্রয়িং রুম ছেড়ে রোয়াকে বেরিয়ে এলাম। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়বে রাতের দিকে। বুঝতে পারছি। ভোরের দিকে বেশ বৃষ্টি হয়েছিল। লনের কয়েকটা জায়গায় জল জমে আছে। হঠাৎ গেটের দিকে তাকিয়ে দেখি,

সাইকেলে চেপে রমেন আসছে। পরনে নীল রঙের জিনসের প্যান্ট, ঘিয়ে রঙের শার্ট। আগে ওকে পাজামা আর সস্তার পাঞ্জাবিতে দেখতাম। ইদানীং সাজগোজের বহর বেড়েছে। তবে বেশ স্মার্ট লাগছে ওকে দেখতে।

কাছে এসেই রমেন বলল, "ও আসেনি?"

ও কথাটা খট করে কানে বাজল। সুস্মিতার কথা জিজ্ঞেস করছে। বললাম, "হ্যাঁ। ছোটকাকার বাড়ি গেছে। তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছে। তোমার এত দেরি হল?"

সাইকেলে চাবি দিয়ে রমেন উঠে এসে বলল, "আর বলবেন না। আজ ভোরে জলার কাছে একটা লাশ পাওয়া গেছে। আমাদের চেনা ছেলে। কেশবপুরের। মুম্বইয়ে জুয়েলারির কাজ করত। তাই থানায় আটকে গেলাম।"

কয়েকদিন আগে সুব্রতদাও একটা মার্ডারের কথা বলেছিল। মাকড়দায় কী হল? হালকাভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, "কে এই ছেলেটা?"

"আপনি চিনবেন না শিবাশিসদা। জয়ন্ত কর্মকার। পুলিশ বলছে, গোল্ড স্মাগলারদের কাজ। বোধহয় কোনও রেষারেষি ছিল। লোক লাগিয়ে মেরে দিয়েছে। এখানে ও সব খুব হচ্চে। সুস্মিতা....।"

রমেন আরও কী সব বলে যাচ্ছে। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসছে জয়ন্তর মুখ। ওই রকম একটা জোয়ান ছেলে খুন হয়ে গেল? তা হলে কি লখা আর বাচ্চুই এই কাজটা করল?

॥ পাঁচ ॥

শ্বশুরবাড়ি থেকে শুভ্রা কয়েকদিনের জন্য পার্বতীপুরে এসেছে। বাপের বাড়িতে এলেই ও রোজ একবার না একবার আমাদের বাড়িতে আসবে। আজ অনিন্দ্যকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছে। দোতলায় বসে খবরের কাগজটা দেখছিলাম। দু'জনকে একসঙ্গে দেখে মনটা খুশিতে ভরে উঠল। বেশ কিছুক্ষণ জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে। অনিন্দ্যর সঙ্গে শুভ্রার বিয়েতে আপত্তি ছিল জ্যাঠার। আমি রাজি করাই। সে জন্য ওরা দু'জনেই আমার প্রতি কৃতজ্ঞ।

শুভ্রাকে বললাম, "এই তো কয়েকদিন আগে এসেছিলি? আবার এলি? শ্বশুরবাড়িতে মন টিকছে না বুঝি?"

উত্তরটা দিল অনিন্দ্য, "একটা খুশ খবর আছে দাদা। শুভু মা হচ্ছে। এই কথাটা জানাতেই এবার এসেছি।"

"বাঃ খুব ভাল খবর। সাবধানে রেখো। এক্সপেক্টেড ডেটটা কবে?"

"পুজোর সময়।"

শুভ্রা বলল, "ধ্যাত, পুজোর সময় হবে... ঠাকুর দেখতে পাব না। ভাল লাগে? আমার বর-টা হিসেব করে কিছু করে না। তখন বললাম, শুনলই না।"

শুভ্রা আমার থেকে সাত বছরের ছোট। কিন্তু খোলামেলা কথাবার্তা বলে।

অনিন্দ্যর সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও বন্ধুর মতো। বিয়ের পর পরই একদিন এসে ও বলেছিল, "জানেন দাদা, শুভুর সব ভাল। কিন্তু একটু ফ্রিজিড টাইপের। আগ্রহ দেখায় না।"

আইডিয়াটা তখনই আমার মাথায় খেলে গেছিল। বলেছিলাম, "আমি তোমাকে একটা পারফিউম দিচ্ছি। রাতে শোয়ার সময় দু'জনেই একটু মেখো। একমাস পর আমাকে বলো তো কোনও রেজাল্ট পাও কি না?"

আমার তৈরি পারফিউমটা ওদেরই প্রথম দিয়েছিলাম। পরীক্ষার জন্য। এক সপ্তাহ পর জগদীশপুর থেকে অনিন্দ্য লাফাতে লাফাতে এল।

বলল, "কাজ হচ্ছে শিবাদা।"

শুনে বুকের রক্ত চলকে উঠেছিল। কিন্তু পরীক্ষাটা তো একজনের উপর করেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। অনেকের উপর করা দরকার। আবার এমন পারফিউম, বলে বলে সবাইকে দেওয়াও যায় না। অনিন্দ্য মাঝেমধ্যে ওর বন্ধুদের জন্য নিয়ে গেছে। খারাপ কোনও রিপোর্ট পাইনি। কয়েকটা ক্ষেত্রে শুনলাম, পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের উপর প্রভাব হচ্ছে বেশি। শুনে আবার কিছু ফর্মুলা বদলেছি।

অনিন্দ্য বিছানার উপর এসে বসেছে। শুভ্রা বলল, "আমি যাই, কাকির সঙ্গে কথা বলে আসি। তোমরা কি চা খাবে?"

অনিন্দ্য বলল, "হ্যাঁ।"

শুভ্রা নীচে নেমে গেল। বেশ ঢলঢল করছে ওর মুখটা। মা হওয়ার আগে যেমন হয়। এই শুভ্রা কয়েক বছর আগে দু'বেণী ঝুলিয়ে স্কুলে যেত। বেণী ধরে টানলে এসে মায়ের কাছে নালিশ করত। চুলও ছিল ওর। একেবারে কোমর পর্যন্ত। জীবনে প্রথমবার শাড়ি পরে ও আমাকে দেখাতে এসেছিল। "কেমন লাগছে বল তো, ছোড়দা।" সেই শুভ্রা কয়েক মাস পরে মা হয়ে যাবে। ভাবতেই অবাক লাগছে।

অনিন্দ্য বলল, "দাদা, আপনার কিছু হল?"

"চেষ্টা করে যাচ্ছি। একটা না একটা কিছু হবেই।"

"আপনাদের মতো ট্যালেন্টেড লোক যদি বসে থাকে, তা হলে এ দেশের ভবিষ্যৎ কী শিবাদা?"

"আমি আর কয়েকটা মাস দেখব। কিছু করতে না পারলে, ভাবছি ফর্মুলাটা বিদেশের কোনও কোম্পানিকে বিক্রি করে দেব।"

"পেটেন্ট করে নিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। আমাদের লাইনে এত জোচ্চুরি হয়, পেটেন্ট না করে রাখলে পস্তাতে হবে।"

"শিবাদা, শুভু বলছিল এ বাড়িতে নাকি আপনি একটা ল্যাবরেটরি করেছেন, কোথায় সেটা?"

"এই তো পাশেই। দেখবে?"

"চলুন।"

আমার ল্যাবরেটারিটা বাড়ির পশ্চিম দিকে। পুকুরের ঠিক ওপরে। আগে এই

ঘরটায় বসে লেখাপড়া করতেন বাবা। বিরাট একটা সেন্টার টেবল ছিল তখন থেকে। আমি কয়েকটা কাচের শো কেস করে নিয়েছি। কেমিকেলের শিশি রাখার জন্য। একটা আলমারিতে দরকারি সব বই। অর্ধেকের বেশি ফরাসি ভাষায়। সবই পারফিউম সংক্রান্ত। ঘরটা সারাদিন আমি বন্ধ রাখি। কাউকে ঢুকতে দিই না। রাতে কাজ করার সময়ও কেউ আমাকে বিরক্ত করতে আসে না।

আমার ল্যাবটা ছোট্ট। কিন্তু রিসার্চ করার পক্ষে আদর্শ। ঘরের ভিতর সব সময় মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে বেড়ায়। অনিন্দ্য ঘরে পা দিয়েই লম্বা নিঃশ্বাস টেনে বলল, "বাহ।"

চেয়ারে বসে বললাম, "এই হল আমার ড্রিমল্যান্ড।"

অনিন্দ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখতে লাগল। শো কেস আর টেবলের উপর ছোট বড় হাজারখানেক শিশি। সে দিকে তাকিয়ে ও জিজ্ঞেস করল, "এই শিশিগুলোতে কী আছে শিবাদা?"

"কেমিকেল। এ সব মিশিয়েই পারফিউম তৈরি করতে হয়।"

"এত নাম মনে থাকে আপনার?"

"রাখতে হয়। এটাই তো আমার কাজ। কিছু আছে ক্রিস্টাল, কিছু লিকুইড, কিছু কনসেন্ট্রেটেড অয়েল আর রেসিনয়েড। আমরা তো ছোটমাপের পারফিউমার। সাত-আটশো ধরনের জিনিস নাড়াচাড়া করি। বিশ্বে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা চার-পাঁচ হাজার ধরনের কেমিকেলের নাম মনে রাখতে পারেন। যেমন, আমার আইডল এডমন্ড রুদেনেৎস্কি। ক্রিশ্চান ডিওরের টপ পারফিউমার।"

"এত ধরনের গন্ধ আপনি মনে রাখতে পারেন?"

"সবই চর্চার উপর নির্ভর করে, বুঝলে। দাঁড়াও, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

হাতের কাছেই সি আই এস থ্রি হেক্সিলনের একটা শিশি। সেটার মুখ খুলে বললাম, "এই কেমিকেলের গন্ধটা শুঁকে বলো তো, কী মনে হচ্ছে তোমার?"

শিশিটা নাকের সামনে তুলে অনিন্দ্য বলল, "মনে হচ্ছে, শাক-পাতা জাতীয় কোনও গন্ধ।"

হেসে বললাম, "কাছাকাছি গেছ। শাক নয়, ঘাস কেটে রাখার পর যে গন্ধটা বেরোয়, এটা সেই গন্ধ। আর কোনও গন্ধ এতে পাও কি না, দেখো তো?"

"না, আর কোনও গন্ধ তো পাচ্ছি না শিবাদা।"

"আমি বলে দেওয়ার পর পাবে। ভাল করে শুঁকে দেখো, চর্বিজাতীয় একটা গন্ধ পাবে। সেই সঙ্গে কাঁচা ফল আর স্যালারি পাতারও।"

অনিন্দ্য ফের শিশিটা নাকের সামনে তুলে বলল, "ঠিক বলেছেন তো, এবার আরও দু'একটা গন্ধ পাচ্ছি।"

"গন্ধ চেনাটা অভ্যাসের ব্যাপার। বুঝলে অনিন্দ্য। আমি শ' চারেক গন্ধ আইডেন্টিফাই করতে পারি। পারফিউম তৈরির সময় একটা গন্ধের সঙ্গে আরেকটার বিয়ে দিই। ফরাসিরা বলে মারিয়াজ। মানে, ম্যারেজ। জানো, একটা পারফিউম তৈরি করতে চব্বিশ-পঁচিশটা গন্ধ লাগে!"

অনিন্দ্য অবাক হয়ে বলল, "তাই নাকি? জানতাম না তো?"

"লক্ষ করো, কোনও একটা পারফিউম লাগানোর পর যে গন্ধটা পেলে, শুকিয়ে যাওয়ার পর সেটা আর পাচ্ছ না। তখন অন্য একটা গন্ধ পাবে। এর কারণ, পারফিউমে তিনটে স্তর থাকে। টপ নোট, মিডল নোট আর বেস নোট। টপ নোট অর্থাৎ প্রথম গন্ধটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেন না, ওটা শুঁকেই লোকে পারফিউম কেনে।"

কথা বলার ফাঁকেই শুভ্রা চায়ের কাপ হাতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "ছোড়দা, তোর ঘরে আয়। আমি জলখাবারও নিয়ে এসেছি।"

অনিন্দ্যকে নিয়ে আমার ঘরে এলাম। মা লোককে খাওয়াতে খুব ভালবাসে। এই অল্প সময়ের মধ্যে লুচি-আলুর দম তৈরি করে পাঠিয়ে দিয়েছে। খাওয়ার সময় শুভ্রাও এসে আড্ডায় বসল। অনিন্দ্য বলল, "শুভু, তুমি দেখতে পেলে না। শিবাদা আজ ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে আমাকে অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাল।"

শুভ্রা বলল, "এখানে থাকার সময় মাঝে মাঝেই বাড়িতে সুন্দর গন্ধ পেতাম। তখনই বুঝতাম, ছোড়দা ল্যাবে কাজ করছে।"

অনিন্দ্য হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "শিবাদা, আপনি যে পারফিউমটার পেটেন্ট নিয়েছেন, তার কোনও নাম দিয়েছেন?"

বললাম, "না। ভাল একটা নাম খুঁজে পাচ্ছি না। এত ভাবছি, অথচ মাথায় আসছে না।"

"আশ্চর্যের ব্যাপার। রামায়ণ বা মহাভারত দেখুন না। ওতে অনেক ভাল ভাল নাম পেয়ে যাবেন।"

"একবার ভেবেছিলাম। কিন্তু আমার এমন একটা নাম চাই, যা বিদেশেও লোকে সহজে উচ্চারণ করতে পারবে। নামটা পছন্দসই না হলে আমার প্রোডাক্ট লোকে ছোঁবে না।"

পারফিউম বিজনেসে বড় বড় কোম্পানিগুলোই এই সমস্যায় পড়ে, আমি তো কোন ছার। বিশ্ববিখ্যাত বহু পারফিউমের নাম আচমকাই বেরিয়ে এসেছে। যেমন চার্লি, তৈরি হয়ে যাওয়ার পর, নামই খুঁজে পাচ্ছিলেন না কোম্পানির কর্তারা। তখন একজন বললেন, নাম দিয়ে দাও চার্লি। যে তৈরি করেছে, তার নাম চার্লস। সবাই রাজি হয়ে গেলেন। চার্লি চ্যাপলিনের জন্য, চার্লি নামটা সেই সময় সারা বিশ্বে খুব পরিচিত। আরেকটা বিশ্বখ্যাত পারফিউম শ্যানেল নাম্বার ফাইভ। এর নামটাও বেরিয়ে এসেছিল অদ্ভুতভাবে। চিফ পারফিউমার পাঁচটা স্যাম্পেল তৈরি করে রেখেছিলেন ল্যাবরেটরিতে। বোতলের গায়ে ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর, ফাইভ— লিখে রেখে তিনি বাড়িতে চলে যান। পাঁচ নম্বর বোতলটাই নির্বাচিত হয় বাজারে ছাড়ার জন্য। ব্যস, শ্যানেল কোম্পানির নতুন পারফিউমের নাম হয়ে যায় শ্যানেল নাম্বার ফাইভ।

এই সব মুগ্ধ হয়ে শুনছে অনিন্দ্য। এক ফাঁকে বলল, "শিবাদা, এই কারণেই আপনার কাছে আসি। অনেক কিছু জানা যায়।"

কথায় কথায় হঠাৎ শুভ্রা বলল, "ছোড়দা, তুই কি হিয়া ঘোষালদের বাড়িতে প্রায় যাস?"

আচমকাই হিয়ার নামটা শুনে চমকে উঠলাম। তারপর নিজেকে সামলে বললাম, "তুই কি ওদের চিনিস?"

"কেন চিনব না? হিয়া আর আমি তো দিলীপ কর্মকারের কাছে একসঙ্গে গান শিখতাম। মেয়েটার গানের গলা দারুণ। স্যার ওর খুব প্রশংসা করতেন। কিন্তু ওর একটাই দোষ। খুব জেদি আর চঞ্চল। তোর সঙ্গে পরিচয় হল কীভাবে ছোড়দা?"

"কেয়াদির সঙ্গে তো আমাদের সুব্রতদার বিয়ে হচ্ছে।"

"আশ্চর্য। সেদিন ওদের দু'জনের সঙ্গে দেখা হল খাটোরায়। একবারও বিয়ের কথা বলল না। হিয়া খুব ট্যালেন্টেড মেয়ে রে ছোড়দা। ও যদি গানের লাইনে থাকত, খুব নাম করত। সেদিন আমাকে বলল, মডেলিং করবে। ও যা মেয়ে, যে লাইনে যাবে ফাটিয়ে দেবে।"

হিয়ার সম্পর্কে আরও কিছু জানার জন্য মনটা ছটফট করে উঠল। বললাম, "এখনও গান শেখে?"

"না। সামান্য কারণে গানের স্কুলটা ছেড়ে দিল। অ্যানুয়াল ফাংশানের আগে প্রোগ্রাম নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে ওর ঝামেলা হল। তারপর থেকে আর এলই না। স্যার নিজে ওর বাড়িতে গেছিলেন। অনেক বোঝালেন। তবুও আসতে রাজি হল না।"

"হিয়ার বাবাও খুব ভদ্রলোক।"

"পুরো ফ্যামিলিটাই দারুণ। হিয়া তোর সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞেস করছিল। কী ব্যাপার রে? ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস নাকি ছোড়দা?"

"হতে পারে।" বলেই আমি মিটিমিটি হাসতে শুরু করলাম।

"খবর্দার এই ভুলটা করিস না ছোড়দা। হিয়া হচ্ছে টাট্টু ঘোড়া। ওকে বশ করা খুব কঠিন। তোর লাইফ হেল করে দেবে।"

আরও কিছুক্ষণ গল্প করে অনিন্দ্যরা চলে গেল। সন্ধেটা খুব সুন্দর কাটল ওদের জন্য। আমার ঘরের লাগোয়া বারান্দায় সুন্দর একটা জায়গা আছে। সেখানে বসলে পুরো পুকুরটা দেখা যায়। কোনও কিছু চিন্তাভাবনার জন্য আমি ওই কোণটা বেছে নিই। পুকুরের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনটা স্থির হয়ে যায়। তখন শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবি। ইজিচেয়ারে বসে একের পর এক জট ছাড়াতে থাকি।

আজ ওই কোণটায় গিয়ে বসতেই হিয়ার মুখটা ভেসে উঠল। এই কিছুদিন আগেও আমার মনটা সবসময় পড়ে থাকত সুগন্ধির জগতে। হিয়াদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর সেই তপস্যায় ব্যাঘাত ঘটেছে। খাটোরায় আমি দিন তিনেক সুপ্রতিমবাবুর কাছে গেছি। সুব্রতদার এনগেজমেন্টের দিনটা ছাড়া আর দেখাই হয়নি হিয়ার সঙ্গে। প্রথম দিনের সাক্ষাতের সেই মুহূর্তগুলো যত ভাবি, ততই ওর ওপর টান বেড়ে যাচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এই টাট্টু ঘোড়াটাকে আমার চাই।

প্রথম দিন প্রথম দেখার মুহূর্তটা মনে পড়ছে। ওদের ড্রয়িংরুমের সোফায় আমি বসে। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হিয়া ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "হাঁ করে কী দেখছেন?"

আমি অকপটে সত্যি কথাটাই বললাম, "তোমাকে।"

হিয়া ক্যাট ওয়াক করে আমার কাছে এসেই আবার ফিরে গেল নিজের জায়গায়। তারপর বলল, 'কী দেখলেন?'

"নেক্সট মিলিনিয়ামের সুস্মিতা সেনকে।"

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল হিয়া। বলল, "হু, মুখে তো খই ফুটছে দেখছি। নামটা জানতে পারি?"

"আমি বর পক্ষের লোক।"

হিয়া এগিয়ে এসে বলল, "শিবাশিসদা। নিশ্চয়ই আপনি শিবাশিসদা। সুব্রতদা এত গল্প করেছে আপনার সম্পর্কে, এখন বুঝতে পারছি।"

বললাম, "শুধু ফিগার নয়। মডেলদের তা হলে মস্তিষ্কও আছে।"

"পরে সেটা বোঝাচ্ছি। তা, এখানে বসে কী করছেন? চলুন, ভেতরে চলুন।"

হিয়ার সঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম। উঠোনে সুব্রতদাকে ঘিরে ভিড়। কিছু অল্প বয়সী মেয়ে পিছনে লেগেছে। সুখের সব মুহূর্ত। হবু বরকে উদ্দেশ্য করে নানা টিপ্পনী চলছে। পাশে বসে মিটিমিটি হাসছে কেয়াদি। আর মিলি। প্রথম দেখাতেই কেয়াদিকে আমার ভাল লেগে গেল। সুব্রতদার পছন্দ আছে বটে। দু'জনকে বেশ ভাল মানাবে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কেয়াদি মিলিকে কী যেন জিজ্ঞেস করল। তারপর হাত নেড়ে ইশারা করল কাছে বসার জন্য। কাছে গিয়ে আমি বললাম, "না বাবা, আপনার পাশে বসব না। আমি বরপক্ষের লোক। বরের পাশেই বসি।"

সুব্রতদার পাশে বসে হিয়া বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল। অদম্য উৎসাহ ওর। সুব্রতদা এনগেজমেন্ট রিঙ পরাতে চাইছে কেয়াদিকে। আঙটিটা কেড়ে নিয়ে হিয়া বলল, "আগে আমার পাওনাটা দিন। তারপর আঙটি পরাতে দেব। আমাদের ফাঁকি দিয়ে দিদিকে নিয়ে যাবেন, তা হবে না।"

সুব্রতদা বলল, "সবার সামনে তো দেওয়া যাবে না। তোমার জন্য একটা স্পেশাল জিনিস রাখা আছে।"

হিয়া পাল্টা বলল, "চালাকি। কলকাতার ছেলেদের আমার জানা আছে। যা দেওয়ার, সবার সামনে দিন।"

সুব্রতদা আমাকে টানল, "এই শিবা, শোভাবাজারের নিন্দে হচ্ছে। আর তুই চুপ করে বসে থাকবি?"

বললাম, "কী করব বলো। মুম্বইয়ে শিবসেনাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে পার্বতী সেনারাও যে গজিয়ে উঠেছে, এখানে না এলে তা জানতেও পারতাম না। হাতের কাছে যা আছে, দিয়ে দাও।"

হিয়া ফোঁস করে উঠল, "যুগ বদলাল। কিন্তু এখনও রামভক্ত হনুমানদের চরিত্র বদলাল না।"

কথাটা শুনে সবাই হেসে উঠল। হাল ছেড়ে দিয়ে সুব্রতদা বলল, "ঠিক আছে হিয়া, তুমি চোখ বন্ধ করো। হাতের সামনে যা পাব, দিয়ে দিচ্ছি।"

হিয়া চোখ বন্ধ করার পর, মিলি সাইড ব্যাগ থেকে পারফিউমের একটা প্যাকেট বের করে সুব্রতদার হাতে দিল। দেখেই বুঝলাম, জয়। খুব দামি পারফিউম।

ফ্রান্সের জঁ পাতু কোম্পানির। এক মিলি লিটারের দামই একশো ফ্রাঁ। মানে প্রায় সাতশো টাকা। সুব্রতদার হাতে কুড়ি মিলি লিটারের বোতল। দাম হবে চৌদ্দ হাজার টাকা। ম্যাজিসিয়ানদের মতো দু'একবার গিলি গিলি গিলি করে, সুব্রতদা বলল, "চোখ খোলো হিয়া। এই নাও তোমার পাওনা।" জয়ের প্যাকেটটা দেখেই আমার মনে হল, সুব্রতদা আসলে এনেছিল কেয়াদির জন্য। বাধ্য হয়ে এখন দিচ্ছে হিয়াকে।

চোখ খুলে প্যাকেটটা দেখে হিয়া বলল, "দাঁড়ান মশাই। আগে দেখি, যা দিলেন সাচ্চা, না ঝুটা। আপনাদের বিশ্বাস নেই।"

মুখ ফসকে বলে ফেললাম, "অত সুন্দর জিনিসটা সুব্রতদা, তুমি কিন্তু অপাত্রে দান করলে।"

"তাই বুঝি।" বলেই হিয়া প্যাকেটটা খুলে ফেলল। তারপর বোতল বের করে বলল, "তা হলে এটা সুপাত্রেই দান করা যাক।"

স্প্রে-র মুখটা চেপে ধরল হিয়া। অটোমেটিক স্প্রে। হিস শব্দ তুলে বাতাসে জুঁইয়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। স্প্রে-র মুখটা আমার দিকে তাক করেছে ও। তরল সুগন্ধি বায়বীয় আকারে বেরিয়ে আসছে বাইরে। ফ্রান্সে গ্রাসে বলে একটা শহর আছে। সেখানকার জুঁই ফুলের নির্যাস দিয়ে তৈরি এই পারফিউম। সঙ্গে বালগেরিয়ান গোলাপ মৃগকস্তুরী। পুরোপুরি ফ্লোরাল টোন। জয়ে কেমিকেলের অংশ মাত্র তিরিশ। তাই এত মর্যাদার। এত দামি। এত সুন্দর উপহারটা হিয়া এভাবে নষ্ট করছে? মেয়েটা কি পাগল?

কেয়াদির মা এই পাগলামি দেখে ধমকে উঠলেন, "এটা তুই কী করছিস হিয়া? দামি জিনিসটা এ ভাবে উড়িয়ে দিচ্ছিস?"

আমার সারা গায়ে ফুলের গন্ধ ম ম করছে। সুব্রতদা অবাক হয়ে হিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। তবু মুখে হাসি টেনে রেখে বলল, "তোমাদের খাটোরায় যে এত এয়ার পলিউশন, তা তো জানতাম না হিয়া।"

কারও কোনও কথা যেন হিয়ার কানে যাচ্ছে না। স্প্রে-র মুখটা ও টিপেই যাচ্ছে। কেয়াদির মা বিব্রতমুখে বললেন, "কিছু মনে কোরো না সুব্রত। ও কারও কথা শোনে না। আবদার দিয়ে দিয়ে ওর বাবাই মাথাটা খেয়েছে।"

জয়ের বোতলটা খালি হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, "সবটাই খরচ করে ফেললে হিয়া। খানিকটা তোমার হেলথ ক্লাব-কাম-বিউটি পার্লারের জন্যও রেখে দিতে পারতে। তোমার ব্যবসা রমরমিয়ে চলত তা হলে।"

হিয়া গ্রীবা ঘুরিয়ে বলল, "আমার ব্যাপারে সব খবরই নেওয়া হয়ে গেছে দেখছি। কোনও বদ মতলব নেই তো মনে মনে?"

বললাম, "বিন্দুমাত্র না। আলামোহন দাসের পর হাওড়া জেলা থেকে আরেকজন ব্যবসায়ী উঠে আসছে, সেই কারণেই সাজেশনটা দিচ্ছিলাম।"

মিলির মুখটা গম্ভীর। কেয়াদিও অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। সুব্রতদা রাগলেও বোঝা যায় না। হিয়ার ছেলেমানুষিতে সব থেকে রাগ হওয়ার কথা সুব্রতদারই। তবুও স্বাভাবিক গলায় বলল, "হিয়া, এবারে অন্তত অনুমতি দাও। এনগেজমেন্ট রিঙটা

পরিয়ে দিই।"

হিয়া স্প্রে বন্ধ না করেই বলল, "আগে অপাত্র কথাটা উইথড্র করতে বলুন আপনার চ্যালাকে।"

"ঠিক আছে, ওর হয়ে আমি উইথড্র করে নিলাম। আঙটিটা দাও ভাই। ওটা তোমার দিদির জন্য এনেছি।"

এনগেজমেন্ট রিঙ পরানো হয়ে যাওয়ার পর মিলি আর সুব্রতদাকে নিয়ে কেয়াদি দোতলায় উঠে গেল। হিয়ার পিছনে লাগার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, "বোঝা গেল, পারফিউমটা সাচ্চা, না ঝুটা?"

হিয়া ঠোঁট উল্টে বলল, 'নিশ্চয়ই ঝুটা। আপনার গডফাদারকে তো হাহুতাশ করতে দেখলাম না।"

....বারান্দায় বসে সেদিনকার সব কথা মনে পড়ছে। মিলি প্রচণ্ড চটে গেছিল। ফেরার সময় গাড়িতে হিয়া সম্পর্কে একবার মন্তব্যও করেছিল, "অসভ্য।" সুব্রতদা কী একটা বলায়, মিলি বলেছিল, "দাদা, এই সব ন্যাকামি তুই প্রশ্রয় দিস না। আমাদের আর কী। সম্পর্কটা তোর সঙ্গেই থাকবে। একটা সময় ইচ্ছে করছিল, মেয়েটাকে ঠাস করে চড় মারি।"

মিলির কথায় সায় দিয়েছিলাম আমি, "তুমি যা-ই বলো সুব্রতদা, কাজটা কিন্তু হিয়া মোটেই ভাল করেনি।"

সুব্রতদা চুপ করে গেছিল। আমাদের বাড়িতে আসা পর্যন্ত আর কোনও কথাই বলেনি। সেদিন মিলির সামনে নিন্দে করেছিলাম বটে, পরে কিন্তু মনে হয়েছিল, হিয়া এমন কিছু অন্যায় করেনি। হবু-জামাইবাবুকে মেয়েরা একটু অতিষ্ঠ করতেই পারে। সেটা এমন কিছু দোষের নয়। ওর প্রাণচঞ্চলতা, সূক্ষ্ম রসিকতাবোধ অন্য কোনও মেয়ের মধ্যে কিন্তু কখনও চোখে পড়েনি। হিয়ার সব কিছুই মানিয়ে যায়। সব কিছুর জন্যই ওকে মাপ করে দেওয়া যায়।

বারান্দায় যখনই বসি, কর্ডলেস ফোনটা হাতের সামনে রাখি। যাতে উঠে গিয়ে ধরতে না হয়। ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। কানে তুলে নিয়ে হ্যালো বলতেই ও প্রান্তে শুনি, "শিবাশিসদা, আমি হিয়া।"

কী আশ্চর্য! এতক্ষণ তো ওর কথাই ভাবছিলাম। গলাটা শোনার পরই আমার বুকের রক্ত চলকে উঠল।

॥ ছয় ॥

তাজ বেঙ্গলের লাউঞ্জে যখন পৌঁছলাম, বেলা তখন বারোটা। মঁসিয়ে বেনোনিলের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সোয়া বারোটায়। মাঝে বেশ কয়েকটা দিন উনি চেন্নাই আর বাঙ্গালোরে ছিলেন। আজ বিকেলের ফ্লাইটে উনি মুম্বই চলে যাবেন। রাতে প্যারিস। কাল রাতে ফোন করে কথা বলার সময় উনি একটু ধমকের সুরেই বললেন, "প্রায় দেড় মাস ভারতে রইলাম। একবার আমার সঙ্গে দেখা করার সময়

পেলে না? তোমার সঙ্গে আমার খুব দরকার। অবশ্যই আসবে।"

তাই মিনিট পনেরো আগে হোটেলে চলে এসেছি। তাজ বেঙ্গলে আগে কখনও আমি ঢুকিনি। হোটেলটা এত বড় জানতাম না। হোটেলে ঢুকেই ইন হাউস ফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম মঁসিয়ে বেনোনিলের সঙ্গে। ও প্রান্তে এক ভদ্রমহিলা ফোন ধরে ইংরাজিতে বললেন, "উনি স্নান করতে ঢুকেছেন। আপনি লাউঞ্জে বসুন। মিনিট পনেরোর মধ্যেই উনি নীচে নামবেন।"

ভদ্রমহিলার কথা শুনে মনে হল না ফরাসি। তা হলে কে? ব্যবসার ব্যাপারে কথা বলতে আসা কেউ হতে পারেন। মঁসিয়ে বেনোনিল বিপত্নীক। অঁতনিতে থাকার সময় মাঝেমধ্যে দেখতাম, সান্তাল নামের এক ভদ্রমহিলা প্রায়ই ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে যেতেন মঁসিয়ে বেনোনিলের সঙ্গে। ভদ্রমহিলা স্কুল শিক্ষিকা। থাকতেন কোনও গ্রামের দিকে। নাম মনে নেই। মঁসিয়ে বেনোনিল একবার আমাকে নিয়েও গেছিলেন মাদামোজায়েলের বাড়িতে। মঁসিয়ে বেনোনিলের দুই মেয়েও আমাদের সঙ্গে গেছিল সেদিন।

ফ্রান্সে ইন্সটিটিউটে পড়াশুনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমাকে হোস্টেল ছেড়ে দিতে হয়েছিল। সেই সময় জাঁ পাতু কোম্পানি বছর দু'য়েক আমাকে কাজ শেখার সুযোগ দেয়। আমার থাকার তখন জায়গা নেই। অনেক খোঁজাখুজির পর একজন মঁসিয়ে বেনোনিলের সন্ধান দেয়। ওঁর এক কামরার একটা ফ্ল্যাট খালি পড়েছিল। ইন্ডিয়ান শুনে উনি ফ্ল্যাটটা আমাকে ভাড়া দিতে রাজি হয়ে যান।

পরে অবশ্য জেনেছি, কেন দিয়েছিলেন। মঁসিয়ে বেনোনিলের ঠাকুর্দা দীর্ঘদিন ছিলেন চন্দননগরে। ভারত সম্পর্কে দুর্বলতা ওঁর এই কারণেই। মাঝেমধ্যে উনি আমাকে নিজের ফ্ল্যাটে ডাকতেন। চন্দননগর সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চাইতেন। আমি কখনও চন্দননগরে যাইনি। শুনেছি, ওখানে একসময় প্রচুর ফরাসি থাকতেন। ওই সময় মঁসিয়ে বেনোনিল বলতেন, "ভারতে যাওয়ার খুব ইচ্ছে হয় মাঝেমধ্যে। সুযোগ পেলেই একবার চলে যাব তোমাদের দেশে।"

অবশেষে মঁসিয়ে বেনোনিল সেই ইচ্ছেটা পূরণ করলেন। লাউঞ্জে বসে মনে হল, সাদা চামড়াদের কত সুবিধে। আমাদের দেশে ওঁদের জন্য সব হোটেল আর রেস্তোরাঁর দরজা খোলা। অথচ প্যারিসে এখনও এমন রেস্তোরাঁ আছে, যাতে আমাদের প্রবেশাধিকার নেই। সাঁজেলিজেতে একটা রেস্তোরাঁ আছে, ফুকে। শ্যেন নদীর ধারে আরেকটা, ট্যুর দ্য আয্যাঁ। সেখানে আমরা কখনও ঢুকতে পারিনি। জানি না, নিয়মটা এখন বদলেছে কি না।

মঁসিয়ে বেনোনিল তখন চাকরি করতেন একটা ওষুধের কোম্পানিতে। হঠাৎ কেন পারফিউম বিজনেসে এলেন, ভেবে অবাকই লাগছে। আমি কয়েকটা জিনিস ভেবে দেখা করতে এসেছি। ইন্সটিটিউট থেকে প্রতি তিন মাসে একটা করে ম্যাগাজিন এখনও আমরা, প্রাক্তন ছাত্ররা পাই। তাতে দেখলাম, মঁসিয়ে বেনোনিলের কোম্পানি একটা নতুন কেমিকেল বের করেছে। ফোর্থ জেনারেশন স্যাণ্ডাল কেমিকেল। এখনও আমাদের দেশে আসেনি। ওই কেমিকেলের এজেন্সি নিতে হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটা

হল, আমার তৈরি পারফিউমটা জিবোদান রুরকে দিতে চাই। সেটা কিনতে ওরা রাজি কি না। তৃতীয় একটা প্রস্তাব, প্যারিসে একটা সংস্থা আছে— সোসাইটি টেকনিক অফ পারফিউমারি ফ্রঁসে। সারা বিশ্বে প্রতি বছর নতুন যে সব পারফিউম বের হয়, তার মধ্যে কোনটা সেরা— এই সংস্থাটা তা বিচার করে। সেই প্রতিযোগিতায় আমার পারফিউম মঁসিয়ে বেনোনিলের হাত দিয়ে আমি পাঠাতে চাই।

আসার সময় হাওড়া স্টেশন থেকে আনন্দবাজার কাগজটা কিনেছিলাম। খুলে দেখার সময় পাইনি। লাউঞ্জে বসে চোখ বোলাতে শুরু করলাম। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় করে ছাপা হয়েছে শিল্পায়নের খবর। সারা ভারতের বাছা বাছা শিল্পপতিকে ডেকে এনে একটা সম্মেলন করা হয়েছে রায়চকে। সম্মেলনের নাম দেওয়া হয়েছে 'গন্তব্য পশ্চিমবঙ্গ।' এতদিনে রাজ্য সরকারের টনক নড়েছে, বাংলায় শিল্পোদ্যোগে উৎসাহ দেওয়া দরকার। সে সম্পর্কিত খবর, পুরো প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে।

এসব খবর আমি পড়ি না। কোনও আগ্রহ নেই আমার শিল্পায়ন নিয়ে। বর্ধমানে এক তান্ত্রিক শিশুমুণ্ডু নিয়ে তন্ত্র সাধনা করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন। সেই খবরটাই পড়তে পড়তে শিউরে উঠলাম। প্রথম পাতায় মনোমতো খবর পড়ে খেলার পাতায় চলে যাওয়ার অভ্যাস আমার। এখন পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট টেস্ট চলছে। প্রথম পাতাতেই খেলার খবর। ভারত হেরে গেছে। সৌরভ ভাল রান পায়নি। সে সব নিয়ে দু'টো খবর। চট করে পড়ে ফেললাম। কাল রাতে টিভি-তে খেলাটা দেখার সুযোগ পাইনি। লোডশেডিং হয়েছিল ডোমজুড়ে। আনন্দবাজারের সাংবাদিক রিপোর্টে খুব গালাগালি করেছেন ক্যাপ্টেন আজহারউদ্দিনকে। পড়ে একটা প্রশ্ন জাগল, পুরো দল যেখানে খারাপ খেলছে, সেখানে শুধু আজহারকে দোষ দিয়ে লাভটা কী?

খেলার খবরে চোখ বুলিয়ে চলে গেলাম এডিট পেজে। এই পাতাতেও শিল্পায়ন নিয়ে প্রবন্ধ। কেন গন্তব্য পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যের শক্তি ও সামর্থ্য। আমেরিকার বিখ্যাত কনসালটেন্সি সংস্থা ম্যাকিনসে নানা দিক পর্যালোচনা করে একটা রিপোর্ট দিয়েছে। কীভাবে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প বিপ্লব ঘটানো সম্ভব, তা নিয়ে। কী মনে হল, সময় কাটানোর জন্য প্রবন্ধটা পড়তে শুরু করলাম।

মোদ্দা কথা, পশ্চিমবঙ্গে নাকি শিল্প লগ্নির পরিবেশ এখন অনেক ভাল। মূলত, বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের প্রতি সরকারের মনোভাবেরও যে পরিবর্তন হচ্ছে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। কেন না, প্রকল্পগুলো দ্রুত অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকার 'এক জানলা শিল্প পরিষেবা' চালু করেছে। এর মানে শিল্প স্থাপনের জন্য আর সরকারের নানা দফতরে কাউকে ঘুরে বেড়াতে হবে না। একটা জায়গা থেকেই সব কিছু সহজে করিয়ে নেওয়া যাবে। দুই, শ্রমিক অশান্তি, না করে শিল্পপতিদের পুরো সাহায্য করবে ট্রেড ইউনিয়নগুলো। তিন, লগ্নি টানতে রাজ্য সরকার বিশেষ কর ছাড়ও দেবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

লেখাটা পড়তে পড়তে মনে হল, সত্যিই কি আমাদের রাজ্যে এসব নিয়ে ভাবনা-

চিন্তা হচ্ছে। তা হলে, এত যে কলকারখানা বন্ধ, আগে সেগুলো খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন? আমাদের কারখানাটা খোলার জন্য কেন ছোটকাকাকে চাপ দেওয়া হচ্ছে না? হাতের কাছেই তো উদাহরণ। কাগজে সব ফালতু কথা লেখে। যারা সরকার চালাচ্ছে, একটা সময় তারাই তো কারখানার গেটে গেটে ঝাণ্ডা ওড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে। স্রেফ দাবিদাওয়া আদায় করতে শিখিয়েছে। এখন উল্টো কথা বলছে। লোকে তা বিশ্বাস করবে?

"হাই শিবা, হাউ আর য়ু?"

প্রশ্নটা শুনে মুখ তুলে তাকালাম। মাঁসিয়ে বেনোনিল। দেড় বছর আগে শেষবার দেখেছিলাম। একই রকম আছেন। তবে মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। দেখে মনেই হয় না বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন। ফরাসিরা বোধহয় চট করে বুড়ো হন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "ফাইন। কমো তালে ভু? (আপনি কেমন?)

ফরাসি শুনে মঁসিয়ে খুব সন্তুষ্ট হলেন। তারপর বললেন, 'ফরাসি ভাষাটা এখনও ভোলোনি দেখছি।"

বললাম, "আমি আপনাকে লাঞ্চ খাওয়ানোর জন্য বাইরে নিয়ে যেতে চাই। প্লিজ, না করবেন না।"

মঁসিয়ে বেনোনিল বললেন, "তা হয় নাকি? তুমি আমার গেস্ট। চলো, চাইনিজ রেস্তোরায় গিয়ে বসি। তোমাদের এখানে বেশ গরম। বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করছে না।"

কথাটা বলেই মঁসিয়ে বেনোনিল আমার হাত ধরে টানলেন। হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে গিয়ে রেস্তোরাঁয় বসলাম। এই সময়টায় ভেবেছিলাম, ভিড় থাকবে না। রেস্তোরাঁয় ঢুকে দেখি, বেশ ভিড়। বেশিরভাগই অবাঙালি পরিবার। এদের হাতে এখন প্রচুর পয়সা। এরা ছাড়া এ সব জায়গায় কে আসবে? কোণের দিকে সিট রিজার্ভ করেই নেমেছেন মঁসিয়ে বেনোনিল। শ্যাম্পেন আর খাবারের অর্ডার দিয়ে বললেন, "তোমাকে দেখে আমার খুব ভাল লাগছে শিবা। মনে হচ্ছে, এতদিনে নিজের একটা লোকের দেখা পেলাম। তবে একটা জিনিস, মাঝে মাঝে তুমি বলতে কলকাতা শহরের প্রাণ আছে। এখানে ক'দিন কাটিয়ে দেখলাম, যা বলতে সত্যি।"

মঁসিয়ে বেনোনিল আমার পুরো নামটা উচ্চারণ করতে পারতেন না। ছোট করেই তাই ডাকতেন, শিবা। একদিন নামের মানেটা উনি জানতে চেয়েছিলেন। বুঝিয়ে দিতে, উনি বেশ মজা পেয়েছিলেন। জানি না, এখনও সেটা ওঁর মনে আছে কি না। ওঁর সঙ্গে প্রায়ই কলকাতা নিয়ে আলোচনা হত। মাদার টেরিজা সম্পর্কেও। জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় কোথায় ঘুরলেন কলকাতায়?"

"সময় পেলেই আমি ডোমিনিক ল'পেয়ার হয়ে গেছি। হেঁটে হেঁটে নানা জায়গায় গেছি! মাদার টেরিজার ওখানেও গেছিলাম।"

"আমাকে আগে জানালেন না কেন?"

"চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তোমার যে কনটাক্ট নাম্বারটা দিয়েছিলে, সেটা রেসপন্স করছিল না। আপসোস রয়ে গেল, আমি চন্দননগর যেতে পারলাম না। আগামী

ডিসেম্বরে ফের আসছি তখন নিশ্চয়ই যাব।"

"কী কাজ ছিল আপনার কলকাতায়?"

"তোমাদের এখানকার একটা কোম্পানি আমাদের টেকনোলজি আর দু'টো ব্র্যান্ড নিতে চাইছে। এখানে তৈরি করে ভারতের বাজারে ছাড়তে চায়। সেই ব্যাপারেই আলোচনা করার জন্য এসেছিলাম।"

"কোন কোম্পানি?"

"জালান পারফিউমস। লোকটার নাম সুরেশ জালান। চেনো?"

"না। এই লোকটার সঙ্গে আপনার পরিচয় হল কীভাবে?"

"মাস তিনেক আগে ইন্টারনেট মারফত এই লোকটা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। গত মাসে প্যারিসে গিয়েও আমার সঙ্গে কথা বলে এসেছে। এর কাছ থেকে আমরা স্যান্ডাল অয়েল নেব। তার বদলে টেকনোলজি আর ব্র্যান্ড ইকুয়িটি দেব। কিন্তু লোকটাকে আমাদের খুব একটা পছন্দ হচ্ছে না।"

"আপনি বললে আমি খোঁজ খবর নিতে পারি।"

"সুরেশ জালান লাঞ্চের পরই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। ওকে তখন দেখতে পাবে।"

কথা বলার ফাঁকেই বেয়ারা এসে শ্যাম্পেন ঢেলে দিয়ে গেল। মঁসিয়ে বেনোনিল খুব শৌখিন মানুষ। আজ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন। খোদ শ্যাম্পেনের দেশের লোক। অঁতনিতে মাঝেমধ্যেই আমাকে শঁপা-র আড্ডায় ডাকতেন। বোর্দো থেকে ওঁর এক বন্ধু শঁপা পাঠাতেন। শুক্রবার রাতের আড্ডায় আমাদের ডেকে এনে বোতল খুলতেন। তখন দেখেছি, প্রথমবার শঁপায় চুমুক দিয়ে উনি মুখে কুলকুচির মতো করতেন। মুখের ভেতরে সর্বত্র স্বাদটা নিতেন। আজও দেখলাম, তাই করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখন কী করছ শিবা?"

"আমি একটা নতুন পারফিউম তৈরি করেছি।"

"কনসেপ্টটা কী?"

"ওরিয়েন্টাল। মাস্ক টাইপের পারফিউম। মৃগনাভির গন্ধ দিয়ে তৈরি।

"এর বিশেষত্বটা কী?"

"আমার পারফিউম মানুষের যৌন ইচ্ছা বাড়িয়ে দেবে।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে শ্যাম্পেনে চুমুক দিচ্ছিলেন মঁসিয়ে বেনোনিল।

কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসলেন, "কী বললে তুমি?"

"পুরুষ ও নারীর সেক্স বাড়াবে।"

"কী বলছ তুমি? আমারা এই প্রোজেক্টের জন্য গত ছয় বছরে দশ মিলিয়ন ফ্রাঁ খরচা করেছি। সফল হইনি। আর তুমি এখানে বসে বানিয়ে ফেললে?"

"হ্যাঁ মঁসিয়ে বেনোনিল। কিছু লোকের উপর আমি পরীক্ষাও করেছি। তারা সবাই বলেছে, ফল পেয়েছে। এই পারফিউমটা পুরোপুরি ফেরোমোন ভিত্তিক। মুঘল আমলের পুরনো এক পুঁথিতে এই সুগন্ধির ইঙ্গিত পাই। সম্রাট আকবরের সময়ে লেখা। সেই আইডিয়া নিয়ে আমি নিজেও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি।"

"তুমি আমাকে দেখাতে পারবে?"

"আপনাকে দেওয়ার জন্যই আমি তিনটে বোতল নিয়ে এসেছি।" বলেই আমি অ্যাটাচি কেস খুলে একটা বোতল বের করলাম। বোতলের মুখটা খুলে মঁসিয়ে বেনোনিল ঘ্রাণ নিতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, "টপ নোট-টা তো মনে হচ্ছে বার্গামোট, ল্যাভেন্ডার আর সাইবেরিয়ান পাইন অয়েলে তৈরি। মিডল নোটটা কী?"

অ্যাটাচি কেস থেকে মোটা কাগজের লম্বা একটা ফালি বের করে এগিয়ে দিলাম মঁসিয়ে বেনোনিলকে। পারফিউমের বিভিন্ন স্তর বুঝতে আমরা এটা ব্যবহার করি। কাগজের টুকরো দ্রুত অ্যালকোহল শুষে নেয়। ফলে মিডল আর বেস নোট তাড়াতাড়ি বুঝে নেওয়া যায়। মঁসিয়ে বেনোনিল বোতলের মধ্যে কাগজের ফালিটা ডুবিয়ে একটু শুকিয়ে নিলেন ফুঁ দিয়ে। তারপর নাকের সামনে রেখে বললেন, "মিডল নোটে তো দেখছি ফ্লোরাল টোন। জেসমিন, ইলাং ইলাং, লিলি অফ ভ্যালি। এলাচ আর দারচিনিও আছে।"

বললাম, "ঠিক ধরেছেন। আর বেস নোটে চন্দন, খস, সিভেট আর কস্তুরী মৃগনাভি। আমি সিন্থেটিক মৃগনাভি ব্যবহার করেছি। আসল মৃগনাভি দিলে সেক্সের মাত্রা আরও বাড়বে।"

"এই পারফিউম নিয়ে তুমি কী করবে শিবা?"

"ব্যবসা করব।"

"টাকা-পয়সা পাবে কোথায়?"

"আমাদের ওটা পারিবারিক ব্যবসা। ফ্যাক্টরিও আছে। আমার ঠাকুর্দা এ দেশে পারফিউম বিজনেসে একজন পাইওনিয়ার। একটা সময় আমাদের একটা ব্র্যান্ড সারা ভারতে চলত। তখন অবশ্য এত বিদেশি পারফিউম আমাদের দেশে আসত না।"

"এটা তো কখনও আমাকে বলোনি শিবা।"

"আপনি কখনও জানতেও চাননি।"

"ইন্ডিয়ান মার্কেট সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিতে পারো? কী ধরনের গন্ধ এখানকার লোক পছন্দ করেন?"

"ফুলের গন্ধ। যা অনেকক্ষণ থাকবে।"

কথা বলতে বলতেই খাবার এসে গেল। দু'জনে খেতে শুরু করলাম। মঁসিয়ে বেনোনিল যে কিঞ্চিৎ অবাক হয়েছেন, তা চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। কয়েক মিনিট পর উনি বললেন, "তোমাদের এখানে জিনেদান জিদান শুনেছি, খুব পপুলার।"

"ফুটবলারের কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ। আমাদের বিশ্বকাপ হিরো।"

"হ্যাঁ, খুব জনপ্রিয়। তবে ছেলেদের মধ্যে। মেয়েদের মধ্যে নয়। এ কথা জানতে চাইলেন কেন?"

"আর কয়েকদিনের মধ্যেই একটা ব্র্যান্ড আমরা বাজারে আনছি। নাম জিদান। মূলত মেয়েদের জন্য। এখন আমাদের দেশে জিদান হল সেক্স সিম্বল। আমরা সেই

সুযোগটাই নিচ্ছি।"

পকেট থেকে কুড়ি এম এল-এর একটা বোতল বের করলেন মঁসিয়ে বেনোনিল। দেখে আমি চমকে উঠলাম। বোতলটার ডিজাইন অনেকটা পুরুষাঙ্গের মতো। তবে ঠিক পুরুষাঙ্গ নয়। মুখটা অর্ধবৃত্ত। প্রথম নজরে মনে হবে, ফুটবল। আমাদের দেশে এই ডিজাইনের বোতলে পারফিউম বিক্রি হলে অনেকে ঘরেই ঢোকাবেন না। কিন্তু ও দেশে চলবে। ফরাসি মেয়েরা কেনার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন। হয়তো দেখা যাবে, এই জিদান-ই এ বছর টপ সেলার হয়ে যাবে। শুঁকে দেখলাম, মাস্ক টাইপের পারফিউম।

মঁসিয়ে বেনোনিল বললেন, "কেমন লাগছে দেখে তোমার?"

"ভাল। তবে এ দেশে চলবে না। আমরা এখনও কনজারভেটিভ। লজ্জায় মেয়েরা কেউ দোকানে হাতই দেবে না।"

"আরও দু'চারজন আমাকে এ কথা বলেছেন। কিন্তু সুরেশ জালান তো আমাকে উল্টো কথা বলছে।"

"উনি কী ভেবে বলেছেন, জানি না।"

"তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ করবে শিবা?"

"করতে পারি। তবে আপনাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। আমার পারফিউম আমি এস টি পি এফের কনটেস্টে পাঠাতে চাই। আপনাকে নিয়ে যেতে হবে।"

"স্বচ্ছন্দে। আর তোমার কী চাই বলো।"

"এখানে অনেক কেমিকেল পাওয়া যায় না। তার কয়েকটা আমি জিবোদান রুরের কাছ থেকে নিতে চাই।"

"কোনও অসুবিধে নেই। তুমি কাগজপত্তর পাঠাও। আমি সবরকম সাহায্য তোমাকে করব। আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখো। কোনও কিছুর দরকার হলে তুমি দ্বিধা করো না।"

খাওয়া শেষ হতেই আমরা দু'জন বাইরে বেরিয়ে এলাম। হাঁটতে হাঁটতে লাউঞ্জে এসে দাঁড়াতেই এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে মঁসিয়ে বেনোনিলকে বললেন, "চলুন, আপনার জন্যই আমি অপেক্ষা করছি।"

মঁসিয়ে বেনোনিল, আমাকে বললেন, "শিবা, এই ভদ্রলোকই সুরেশ জালান।"

বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। মাঝারি হাইট। পরনে সাফারি সুট। আমি দু'হাত জড়ো করে নমস্কার করলাম। উনি প্রতি নমস্কার করে বললেন, "আপনি?"

কী করে বুঝলেন জানি না। উত্তরটা দিলেন মঁসিয়ে বেনোনিল, "এ হচ্ছে শিবা। পারফিউমার। আমাদের দেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছে পারফিউমে।"

শুনে খুশি হওয়ার ভান করলেন সুরেশ জালান। বললেন, "তাই নাকি? আমি তো এ রকমই একজন লোকের খোঁজে রয়েছি। চাকরি করবেন আমার কোম্পানিতে?"

বললাম, "না। আপনার প্রস্তাবটার জন্য ধন্যবাদ।"

উত্তরটা শুনে চুপসে গেলেন সুরেশ জালান। আমাকে আর পাত্তা না দিয়ে

ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন, "মিঃ বেনোনিল, চলুন তা হলে রওনা দেওয়া যাক।"

আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন মঁসিয়ে বেনোনিল। তারপর সুরেশ জালানের সঙ্গে কাচের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। মিনিট দু'য়েক পর চিড়িয়াখানার গেটের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। হাওড়ায় যাওয়ার জন্য একটা ট্যাক্সি ধরব বলে। হুস করে একটা কনটেসা বেরিয়ে গেল রেস কোর্সের দিকে। সামনের সিটে বসে সুরেশ জালান। পিছনের সিটে মঁসিয়ে বেনোনিল আর একটা চেনা মেয়ে। কোত্থেকে জুটল এই মেয়েটা? তা হলে কি লাউঞ্জের কোথাও বসেছিল? অথবা সুরেশ জালানের গাড়িতেই ছিল। হোটেলে ঢোকেনি।

রাস্তায় দাঁড়িয়েই ভাবতে লাগলাম, কোথায় মেয়েটাকে দেখেছি। ট্যাক্সিতে হাওড়ায় পৌঁছনোর পর হঠাৎ মনে পড়ল। হ্যাঁ, ডোমজুড়েই দেখেছি। মেয়েটার নাম পলি। পলি বিশ্বাস। সাত-আট বছর আগে বাড়ির ড্রাইভারকে বিয়ে করে ডোমজুড়ে হই চই ফেলে দিয়েছিল। এখন ডিভোর্সি। এই মেয়েটা সুরেশ জালানের সঙ্গে কী করছে?

॥ সাত ॥

সকাল থেকেই আকাশটা আজ মেঘলা। ঘুম ভাঙতেই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। মিলন সংঘের মাঠে সরস্বতী পুজো হচ্ছে। মাইকে হিন্দি গান বাজছে। অন্য দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে এ সব গান শুনতে ভাল লাগে। গত দু'তিন দিনে বাড়িতে এমন সব ঘটনা ঘটে গেছে, মনটা খুব বিক্ষিপ্ত।

সেদিন মঁসিয়ে বেনোনিলের সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসতে সন্ধে হয়ে গেছিল। বাড়িতে ঢুকতেই দেখি, দিদির সঙ্গে মায়ের কথা কাটাকাটি হচ্ছে। শোভাবাজারের বাড়ি থেকে আমরা চলে আসার পর দিদি ভাড়া বাড়ি ছেড়ে ও বাড়িতে চলে যায়। এখন ওখানেই আছে। বাড়িটার উপর দিদির খুব লোভ। অনেক দিন ধরে মাকে চাপ দিচ্ছে, বাড়িটা জোজোর নামে লিখে দেওয়ার জন্য। বাবা বেঁচে থাকার সময়ই দিদি অনেক কিছু আদায় করে নিয়েছিল। তাই মা চায়, শোভাবাজারের বাড়িটা আমার নামে থাক। আমি প্যারিস থেকে ফিরে আসার পর এ নিয়ে একবার টেনশন হয়েছিল। তখন আমি বলেছিলাম, "দিদি যা চাইছে, দিয়ে দাও।"

তবুও মা রাজি হয়নি। মায়ের মধ্যে অদ্ভুত একটা জেদ লক্ষ করছি। দিদিকে সহ্য করতে পারছে না। সেদিন দিদি ঝগড়া করে চলে যাওয়ার পর মা অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরদিন ভোরে সেরিব্রাল অ্যাটাক। মাকে হাজরা নার্সিং হোমে ভর্তি করেছি।

কাল রাতে নার্সিং হোম থেকে ফেরার সময় ডাক্তার কাকা হঠাৎ বললেন, "শিবা, মনটাকে শক্ত করে রাখো। মা সবার চিরদিন থাকে না।"

কথাটা শুনে বুকটা দুরদুর করে উঠেছিল। মা ছাড়া জগৎটা আমি ভাবতেই পারি না। বাড়িতে আমি থাকব কী করে তা হলে? এই যে আমার এত স্বপ্ন দেখা, সব মাকে খুশি করার কথা ভেবে। ফ্রান্সে গিয়ে চার চারটে বছর আমি কাটিয়েছি মাকে ছাড়া।

সপ্তাহে দু'দিন ফোন করতামই। তখন ভাবতাম, মা যত দূরেই থাক, ভাল আছে। এখন ফাঁকা বাড়িতে প্রতি মুহূর্তে মায়ের অভাব টের পাচ্ছি। অদ্ভুত সব চিন্তা ঘুরছে মাথার মধ্যে। অনেক অভিজ্ঞতাও হল সংসার সম্পর্কে।

মা নার্সিং হোমে, এই খবরটা শোভাবাজারে দিতেই দিদি ফোনে বলেছিল, "চিন্তা করিসনা, মা ভাল হয়ে যাবে।" বিকেলে অবশ্য একবার ডোমজুড়ে এসেছিল। মাকে নার্সিং হোমে দেখেই ফিরে গেছিল। বাড়ি অবধি আর আসেনি। মা অবশ্য জানতে পারেনি, দিদি এসেছিল কি না। নার্সিং হোমে ভর্তি করার পর মায়ের জ্ঞান এখনও ফেরেনি। রোজ রাতে দিদি ফোনে একবার করে খবর নেয়। দু'চারটে কথা বলেই ফোন ছেড়ে দেয়। মাঝে দিদি একবার মিত্তির কাকাকে শোভাবাজারে ডেকে পাঠিয়েছিল। আমি আর মিত্তির কাকার কাছে জানতে চাইনি, কেন? দিদিকে নিয়ে আমার কোনও আগ্রহই নেই।

এই সময়টাই জোজো যদি বেলুড়ে থাকত, অবশ্যই আমার পাশে এসে দাঁড়াত। সপ্তাহখানেক আগে দলবল নিয়ে ও ট্রেকিংয়ে গেছে, গঙ্গোত্রী না কোথায়। ফিরবে মাসখানেক বাদে। যাওয়ার দিন সকালে জোজো মায়ের সঙ্গে ফোনে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল। তারপরই নাকি মা খুব গম্ভীর হয়ে যায়। একথাটা আমি শুনেছি, মিনু পিসির মুখে। মা নাকি সেদিন এত আপসেট ছিল, সারাটা দিন কিছু খায়নি।

এ ক'দিন কোচাই অবশ্য খুব দৌড়োদৌড়ি করছে আমার সঙ্গে। মিত্তির কাকার ছেলে। প্রথম দু'দিন তো ও বাড়িতেই ফেরেনি। রাতেও নার্সিং হোমে থেকে গেছে। খাটোরায় ওর অনেক বন্ধু। ওরাও দরকারে দৌড়ে আসছে। ছেলেগুলো এত ভাল, ভাবতে পারিনি। কাল রাতে ওদের দু'জন নার্সিং হোমে ছিল। রোজ সকালে একজন ফোন করে আমাকে খবর দিয়ে তারপর বাড়ি ফিরে যায়। আজ সকাল সাতটা বেজে গেল। এখনও কেউ ফোন করল না।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা এমন চঞ্চল হয়ে উঠল, বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লাম। এখনই একবার নার্সিং হোমে যেতে হবে। ব্রাশ করে জামা প্যান্ট পরছি, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। এ ক'দিন ফোন এলেই বুকটা কেঁপে ওঠে। এই বোধহয় নার্সিং হোম থেকে খারাপ কোনও খবর এল। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে কর্ডলেসটা তুলে নিলাম।

"শিবাদা আছে?"

হিয়ার গলা। শুনেই বুকের কাঁপুনিটা থেমে গেল। হিয়া মাঝেও একদিন ফোন করেছিল। মা কেমন আছে, জানার জন্য। ফোনে ওর গলা শুনেই মনটা প্রসন্ন হয়ে গেল। বললাম, "বলো।"

"মাসিমা কেমন আছেন, শিবাদা?"

"ভাল না।"

কথাটা বলার সময় গলাটা সামান্য কেঁপে গেল। ও প্রান্তে দু' তিন সেকেন্ড কোনও কথা নেই। তারপর হিয়া বলল, "বাবা জিজ্ঞেস করতে বললেন।"

"উনি আছেন?"

"হ্যাঁ। দোতলায়। ডাকব?"

"না। তোমরা কেমন আছ হিয়া? সুব্রতদার কোনও খবর পেলে?"

"রোজই তো ফোন করছে ফ্রান্স থেকে। দিদির সঙ্গে কথা বলছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আচ্ছা, ও দেশে কি ফোন করতে পয়সা লাগে না?"

কথাটা শুনে হাসি পেল। বললাম, "তোমার হিংসে হচ্ছে কেন?"

"বয়ে গেছে আমার হিংসে করতে।"

"কেয়াদি কোথায়?"

"আমার পাশেই বসে আছে। কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে গান শুনছে।"

"থাক, তা হলে ওকে বিরক্ত করে লাভ নেই।"

"বলছিলাম কী, বেলা ন'টার সময় একবার বাণীশ্রী হলের উল্টো দিকে আসতে পারবেন?"

"কী ব্যাপার, হিয়া?"

"আমার হেলথ ক্লাবের আজ ইনগোরেশন। আমার দুই বন্ধু কাল কার্ড দিয়ে এসেছে আপনার বাড়িতে। তখন আপনি ছিলেন না।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল ওর হেলথ ক্লাবের কথা। সৌরভ গাঙ্গুলিকে নিয়ে আসার জন্য ও একবার অনুরোধ করেছিল। আমার মনে ছিল না। সৌরভ অবশ্য সিরিজ শেষ করে ফিরে এসেছে। হিয়ার অনুষ্ঠানে ওকে আনতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এখন আমার মাথায় অন্য কিছু নেই। মায়ের চিন্তায় রাতে ঘুম হচ্ছে না। তাই বললাম, "হিয়া, আমি এখন একবার নার্সিং হোমে যাচ্ছি। মা যদি ভাল থাকে, তোমার ওখানে ঘুরে আসব।"

"আপনি এলে খুব খুশি হব।"

ফোন ছেড়ে দিয়ে বাইরে এসে গ্যারাজ থেকে বাইকটা বের করলাম। স্টার্ট দিতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি মিত্তির কাকা হনহন করে হেঁটে আসছেন। কাছে এসে উনি বললেন, "বেরিয়ে যাচ্ছ বাবা। তোমার সঙ্গে জরুরি একটা দরকার আছে।"

"কী কথা, কাকা?"

"তোমার ছোট কাকাকে নিয়ে। একটা প্রস্তাব নিয়ে উনি তোমার কাছে আসবেন। বোধহয় আজই বিকেলের দিকে। তুমি কিন্তু বাবা, ভেবেচিন্তে ডিসিশন নিও।"

"কী প্রস্তাব, কাকা?"

"তোমাদের ফ্যাক্টরিটা উনি বিক্রি করে দিচ্ছেন। উনি তোমাকে রাজি করাতে আসবেন।"

সব আমার জানা। তবুও বললাম, "কী করা যায়, বলুন তো? মায়ের এই অবস্থা। অন্য কিছু নিয়ে আমি মাথা ঘামাতেই পারব না।"

"আমার মতে, তোমার বাধা দেওয়া উচিত।"

এই উত্তরটা শুনতে চাইছিলাম। আমাদের স্বার্থ ছাড়া মিত্তির কাকা অন্য কিছু দেখবেন না। বাবার খুব বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। বাবা মারা যাওয়ার পর আমাদের সম্পত্তি উনিই সব আগলেছেন। শোভাবাজারের বাড়ি, এজরা স্ট্রিটে দোকান, প্রায়

পঞ্চাশ বিঘে দোফসলা জমি— সব এখনও টিকে আছে মিত্তির কাকার জন্য। উনি যা খাটাখাটনি করেন, সে পরিমাণ পারিশ্রমিকও নেন না। এমন সৎ লোক খুব কম পাওয়া যায় এখনকার যুগে। কোচাইটাও হয়েছে বাবার মতো। আমাদের ফ্যামিলির একজন।

মিত্তির কাকাকে তাই বললাম, "ফ্যাক্টরির যা অবস্থা এখন, রেখে লাভ হবে কাকা? বিক্রি হলে, তবু কিছু টাকা পাওয়া যাবে। আমার ভাগে যা পড়বে, ব্যাঙ্কে রেখে দিলে, পরে কাজে লাগবে।"

কথাটা শুনে যেন হতাশ হলেন মিত্তির কাকা। বললেন, "তোমার ছোট কাকাকে তুমি চেনো না বাবা। তুমি প্রাপ্য টাকা পাবে না। ইতিমধ্যেই তোমার দিদিকে টোপ দিয়ে রেখেছে। তোমাদের অংশ নিয়ে ভাই-বোনে ঝগড়া বাধিয়ে দেবে। তোমার দিদি এ নিয়ে বউমণির সঙ্গে অশান্তি করে গেছে। বউমণি সেদিনই অসুস্থ হয়ে পড়ে।"

এটা আমার কাছে খবর। মায়ের সেরিব্রাল অ্যাটাক হওয়ার কারণ তা হলে এটাই। শোভাবাজারের বাড়ি নয়। দিদিটা অত্যন্ত লোভী। ছোটকাকা সেটা জানে। আর জানে বলেই, টাকার টোপ দিয়ে দিদিকে পটিয়ে ফেলেছে। ছোটকাকা আগে আমার কাছে আসার সাহস পায়নি। আমি একটু দূরত্ব রেখে চলি। আমাকে তাই ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। দিদি বোধহয় ভরসা দিয়েছে, শিবা সাদাসিধে ছেলে। ওকে বাগে আনতে অসুবিধে হবে না। তাই আঁটঘাট বেঁধেই ছোট কাকা এখন আমার কাছে আসছে।

মনে মনে হাসলাম। আসুক, তখন দেখা যাবে। মায়ের যদি খারাপ কিছু হয়, তা হলে ছোট কাকা তো বটেই, আমি দিদিকেও ক্ষমা করব না। এতদিন অনেক আবদার সহ্য করেছি। আর না। মিত্তির কাকাকে বললাম, "কারখানায় দিদির তো কোনও শেয়ার নেই কাকা।"

"নেই। কিন্তু ক্লেইম করতে বাধা কোথায়? তোমার ছোট কাকা খুব মিন মাইন্ডেড। আইনের কোনও মারপ্যাঁচে ফেলে দেবে। তুমি টের পাবে না। তোমার বাবাই পেরে উঠলেন না। তোমার অভিজ্ঞতা তো আরও কম।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কাকা। ওই ফ্যাক্টরি বিক্রি হবে না।"

আমার গলায় কিছু একটা ছিল। সেটা শুনে মিত্তির কাকা যেন নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর বললেন, "তুমি এ দিকে একটু মাথা দাও বাবা। অ্যাদ্দিন বউমণির মুখের দিকে তাকিয়ে তোমাকে কিচ্ছু বলিনি। তোমাদের পারিবারিক ব্যাপার। চোখের সামনে দেখলাম, কীভাবে তোমার ছোট কাকা ফ্যাক্টরিটা তুলে দিলেন। এই ফ্যাক্টরির সঙ্গে তোমাদের পিতৃপুরুষের স্মৃতি জড়িয়ে। ওটা বিক্রি হতে দিও না। পুরনো লোকজন এখনও আমার কাছে আসেন। এই পরশুই এসেছিলেন রমাপ্রসাদবাবু। তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। তোমার কাছে নিয়ে আসব বাবা?"

"কে রমাপ্রসাদবাবু?"

"তোমাদের কোম্পানির এক স্টলওয়াট। তোমার ছোট কাকার সঙ্গে বনল না। চাকরি ছেড়ে কলকাতার কর কোম্পানিতে চলে গেলেন। উনি একদিন তোমার সঙ্গে বসতে চান।"

"এখন না, কাকা। আগে বাড়ি নিয়ে আসি। তারপর।"

"ঠিক আছে। তাই হোক, বাবা।"

কথাটা শেষ করে বাইকে স্টার্ট দিলাম। সকাল প্রায় সাড়ে আটটা। এখনও নার্সিং হোম থেকে কোচাইরা কেউ খবর দিল না। নার্সিং হোমে গিয়ে মাকে কী অবস্থায় দেখব, কে জানে? মিত্তির কাকার জন্য একটু দেরি হয়ে গেল। তা হোক। উনি কিন্তু নতুন একটা খবর দিলেন। দিদির সঙ্গে ছোট কাকার যোগাযোগ রয়েছে। এত বয়স হল, ছোটকাকা এখনও বদলায়নি। আমার পিছনে দিদিকে লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

সেদিন সুস্মিতার সঙ্গে ছোটকাকা খুব খারাপ ব্যবহার করেছিল। দেখা তো করেই নি। উল্টে, দুটো ছেলেকে দিয়ে হুমকি দিয়েছিল। তারপরই আমার কাছে দুটো জিনিস স্পষ্ট হয়ে গেছে। এক, সুস্মিতার বাড়িতে উড়ো ফোন যাচ্ছে, ছোট কাকারই নির্দেশে। দুই, সেটা বুঝতে পেরে সুস্মিতারও জেদ চেপে গেছে। ছোট কাকাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। ছোটকাকা পুরনো আমলের লোক। মিডিয়ার শক্তি জানে না। আচ্ছা, আচ্ছা লোক শায়েস্তা হয়ে যায়। সে তুলনায় ছোটকাকা তো নস্যি।

ছোট কাকার বাড়ি থেকে ফিরে এসেই সেদিন সুস্মিতা আমাকে বলে গেছে, "লোকটা অসভ্য। আমি কিন্তু ওকে ছাড়ব না শিবাদা।" সত্যি সত্যি, ডোমজুড় কথার পরের সংখ্যায় ও আবার একটা লেখা লিখেছিল। পুরনো কর্মীদের বকেয়া টাকা না মিটিয়েই কৃষ্ণকমল চৌধুরী গোপনে সেন্টের কারখানা বিক্রি করে দিচ্ছেন।

জগদীশপুর রোডে পৌঁছতেই দেখলাম, রাস্তা বেশ জমজমাট। কয়েক হাত অন্তর সরস্বতী পুজোর প্যান্ডেল। শোভাবাজারে থাকার সময় মা প্রতি বছর বাড়িতে সরস্বতী পুজো করত। আগের দিন বিকেলে আমাকে নিয়ে কুমোরটুলিতে গিয়ে ঠাকুর কিনে আনত। আমার স্কুলের বন্ধুরা অনেকেই ওইদিন আমাদের বাড়িতে আসত। খুব হইহই হত। মিলিও সারাটা দিন কাটাত আমাদের বাড়িতে। ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময় ওই সরস্বতী পুজোর দিনই মিলি আমাকে বলেছিল, "শিবাদা, আমাকে নিয়ে ভিক্টোরিয়ায় যাবে? আমার খুব ইচ্ছে।" কেউ যদি দু'জনকে এক সঙ্গে দেখে ফেলে? সেই ভয়ে সেদিন আমি রাজি হইনি। মিলির মুখটা কালো হয়ে গেছিল। তারপর আর কোনও দিন আমার কাছে ও এই ধরনের ইচ্ছে প্রকাশ করেনি।

রূপছবি সিনেমা হলের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় পাশের রিকশা থেকে কে যেন ডাকল, "শিবাশিসদা, ও শিবাশিসদা? কোথায় চললেন?"

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, রিকশায় রমেন আর সুস্মিতা। ওদের দেখে রাস্তার ধারে বাইকটা দাঁড় করিয়ে বললাম, "নার্সিংহোমে।"

রমেন বলল, "একটু আগে দেখা হল কোচাইয়ের সঙ্গে। বলল , মাসিমা নাকি ভালই আছেন।"

শুনে বুক থেকে পাষাণভারটা নেমে গেল। বললাম, "তোমরা চললে কোথায় এ দিকে?"

"হিয়াদির হেলথ ক্লাবের উদ্বোধন। আপনাকে বলেনি?"

"বলেছে। একবার যাব কি না ভাবছি।"

"চলুন তা হলে। এক সঙ্গেই যাওয়া যাক। একটু আগে এই রাস্তা দিয়ে সৌরভ গাঙ্গুলি গেল। বাপরে, সে কী ভিড়। চলুন না শিবাদা। ওখানে বন্ধুর সঙ্গে আপনারও আজ দেখা হয়ে যাবে।"

কথাটা শুনে এক মুহূর্ত ভাবলাম। একবার নার্সিংহোমে যাওয়াটা খুব জরুরি। আগে মাকে দেখে তারপর হেলথ ক্লাবে যাওয়া যায়। মা ভাল আছে, এই খবরটা আমাকে দেওয়া উচিত ছিল কোচাইয়ের। তা হলে সারাটা সকাল উদ্বেগের মধ্যে কাটাতে হত না। বোধহয় অঞ্জলি দেওয়ার জন্য মিলন সংঘে গেছে কোচাই। সেখানেই দেখা হয়েছে রমেনদের সঙ্গে। রিকশা থেকে তাড়া দিল সুস্মিতা, "চলুন শিবাদা, অনুষ্ঠান বোধহয় এতক্ষণে শুরু হয়ে গেছে।" কথাটা শুনেই বললাম, "চলো, তা হলে।"

হাত ঘড়িতে দেখলাম, প্রায় ন'টা। রোদের তাত বাড়ছে। আর অপেক্ষা না করে বাইক ছুটিয়ে দিলাম বাণীশ্রী সিনেমা হলের দিকে। আজ পর্যন্ত ওই হলে আমি কোনও দিন সিনেমা দেখতে যাইনি। একটা বই এসেছিল 'ব্যবধান।' মিনু পিসির মুখে প্রশংসা শুনে মা আমাকে টিকিট কাটতে বলেছিল, "চল না শিবা, তুই আর আমি গিয়ে দেখে আসি।" আমি সেদিন রাজি হইনি। মাকে বলেছিলাম, "তোমাকে আমি ক্যাসেট এনে দিচ্ছি। বাড়িতে বসে দেখে নিও।" মা মনঃক্ষুণ্ণ হলেও সেদিন মুখে কিছু বলেনি। কথাটা মনে পড়তেই হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল। ঠিক করলাম, মা ভাল হয়ে উঠলেই একদিন সিনেমায় নিয়ে যাব।

সিনেমা হলের কাছে পৌঁছতেই মাইকে শুনতে পেলাম, "এবার প্রধান অতিথি সৌরভ গাঙ্গুলিকে পুষ্পস্তবক দিচ্ছেন হেলথ ক্লাবের ডিরেক্টর হিয়া ঘোষাল।" হিয়া নামটা শোনামাত্রই মনটা ঝরঝরে হয়ে গেল। ওকে দেখার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। হেলথ ক্লাবের সামনে প্রচুর গাড়ি। বাইক রাখার জায়গা নেই। একটু এগিয়ে বাইকটা পার্ক করে ফিরে এলাম। রাস্তার ধারে বিরাট তোরণ। প্রচুর লোকের ভিড়। তোরণের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়ে ভলেন্টিয়াররা। কার্ড দেখে ওরা ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে। আমার কাছে কোনও কার্ড নেই। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় কার্ডটা নিয়ে আসিনি। তাই ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভেতরের মণ্ডপে কী হচ্ছে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মাইকে সব শুনতে পাচ্ছি। শৈলেন মান্নাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করল হিয়া। শৈলেন মান্না হাওড়া জেলারই মানুষ। জেলার গর্ব। হিয়া সে কথা মনে করিয়ে দিতেই প্রচুর হাততালি পড়ল।

"আরে শিবাশিসদা, আপনি এখানে? এত পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভেতরে যাবেন না?"

হাসি হাসি মুখে একটা মেয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। একসঙ্গে তিনটে প্রশ্ন করে বসল। মেয়েটাকে আমি চিনি না। হিয়ার ক্লাবেরই কেউ হবে। আমাকে কোথাও দেখেছে। বললাম, "পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেছি। এখুনি চলে যেতে

boiRboi.net

হবে।"

"মাথা খারাপ? চলে যাবেন মানে? হিয়াদি শুনলে আমাদের উপর মারাত্মক রেগে যাবে। সৌরভদা এসেই আপনার খোঁজ করেছে। চলুন, ভেতরে চলুন। আপনি চেষ্টা না করলে সৌরভদাকে কি আমরা আনতে পারতাম? আপনি ওকে এনে দিলেন, অথচ নিজেই ভিড়ের মাঝে লুকিয়ে রয়েছেন?"

কী বলছে মেয়েটা? সৌরভকে আমি এনে দিয়েছি? এই গল্পটা তা হলে হিয়াই ছড়িয়েছে। ভুলটা ভেঙে দেওয়া দরকার। তাই বললাম, "তুমি বোধহয় ভুল শুনেছ। আমি সৌরভকে আনিনি।"

মেয়েটা বলল, "আপনি বললেই আমরা বিশ্বাস করব নাকি? ডোমজুড়ে সবাই জানে, সৌরভ গাঙ্গুলি আর আপনি একই স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। যাক গে। আপাতত, ভেতরে চলুন। আপনার জন্য জায়গা রাখা আছে।"

মেয়েটা প্রায় জোর করেই আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। মঞ্চে বসে রয়েছে সৌরভ। স্কুলে পড়ার সময় ওর চোখে চশমা ছিল না। চশমা চোখে ওকে বেশ ব্যক্তিত্ববান মনে হচ্ছে। ওর বাঁ পাশে ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী আর নিমাইসাধন বসু। দু'জনই হাওড়া জেলার বিশিষ্ট মানুষ। এতগুলো নামী লোককে হিয়া আজ একই মঞ্চে নিয়ে এসেছে। সত্যিই মেয়েটার এলেম আছে। অবাক হচ্ছি ভেবে, সৌরভকে ও নিয়ে এল কী করে? সৌরভের এখন যা গ্ল্যামার, তাতে কলকাতায় কোনও অনুষ্ঠানে ওকে নিয়ে যাওয়া কঠিন। ডোমজুড় তো অনেক দূর।

ক্লাবের মেয়েটা মঞ্চের একেবারে সামনের সারিতে নিয়ে এসে আমাকে বসিয়ে দিল। শৈলেন মান্না শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভাল ভাল কথা বলছেন। লোকে মন দিয়ে তা শুনছে। উইংসের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে হিয়া। পরনে সবুজ রঙের কাঞ্চিপুরম শাড়ি। দুর্দান্ত লাগছে ওকে। আমি মুগ্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎই ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতে হিয়া হাসল। ওই হাসি দেখে আমার সারা শরীর শিরশির করে উঠল। পাল্টা হাসতেও ভুলে গেলাম। হিয়া এগিয়ে এসে সৌরভের কানে কানে কী যেন বলল। তখনই সৌরভ আমার দিকে তাকাল। তারপর চিনতে পেরে হাত তুলে ইশারা করল। তখনই ভাবলাম, ইস্ মা যদি আজ নার্সিংহোমে না থাকত, তা হলে সৌরভকে অবশ্যই বাড়ি নিয়ে যেতাম।

মঞ্চটা এমনভাবে সাজানো, হিয়ার হেলথ ক্লাবের কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে শুরু করলাম, ভিড়ের মাঝে চেনা কেউ আছেন কি না। বাঁদিকের শেষ প্রান্তে সুপ্রতিমবাবু বসে। আজকের অনুষ্ঠান দেখে নিশ্চয়ই হিয়া সম্পর্কে মনোভাব উনি বদলাবেন। হঠাৎই মঞ্চের দিকে চোখ যেতে দেখি, উইংসের পাশে রমেন কী যেন বলছে হিয়াকে। উজ্জ্বল আলোর নীচে হিয়ার মুখটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎই যেন মুখটা ফ্যাকাশে মনে হল। রমেন আর হিয়া দু'জনে আমার দিকে তাকাল। তারপর দু'জনেই মঞ্চের পিছন দিক দিয়ে ঘুরে আমার কাছে এসে বলল, "শিবাশিসদা, উঠে আসুন। দরকার আছে।"

হিয়ার গলাটা শুনে আমার বুক দুরদুর করে উঠল। দু'পাশের চেয়ারে লোক ঠাসা।

মাঝখানে এক ফালি রাস্তা বাইরের তোরণ পর্যন্ত। ওদের পিছনে বাইরে এসে দাঁড়াতেই রমেন বলল, "একবার নার্সিংহোমে যেতে হবে শিবাশিসদা। ডাক্তারকাকা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

কথাটা শুনেই দু'টো পা থরথর করে কেঁপে উঠল। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল। হিয়ার চোখে জল দেখেই আমি বুঝে ফেললাম, মা আর নেই।

॥ আট ॥

ছোট কাকা আমার কাছে এল মায়ের কাজকর্ম চুকে যাওয়ার এক সপ্তাহ পর। শ্রাদ্ধের দিন আশা করেছিলাম। ছোটকাকা পার্বতীপুরেই আসেনি। তবে লোক মারফত খবর পেলাম, দিদি নাকি নিয়মিত কলকাতায় ছোটকাকার বাড়িতে যাতায়াত করছে। মায়ের কাজে এসে দিদি অবশ্য এখনও এখানে রয়ে গেছে। দিদি থাকতে থাকতেই ছোটকাকা আমার সঙ্গে কথা বলতে আসুক, মনে মনে এটাই চেয়েছিলাম। ঠিক সেটাই হল।

ছোটকাকা এসেই বলল, "বৌদিমণির কাজে আসার খুব ইচ্ছে ছিলরে শিবা। কিন্তু শরীরটা তখন এত খারাপ, বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতাই তখন ছিল না।"

"কী হয়েছে তোমার কাকা ?"

"প্রসটেটের প্রবলেম। মাঝে নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিলাম। তোর কাকিমাও তাই আসতে পারল না। তা, মাতৃবিয়োগ হল। তুই চুল-টুল কামাসনি? এটা কী করলি?"

জানতাম, কাকা সরাসরি কথা পাড়বে না। ইনিয়ে বিনিয়ে প্রথম দিকে অন্য কথা বলবে। আমার মন-মেজাজ বুঝে নেবে। তারপর আসল কথায় যাবে। তাই মাথা কামানোর প্রসঙ্গেই ঢুকলাম না। আমিও গলায় মধু ঢেলে জিজ্ঞেস করলাম, "কোন ডাক্তারকে দেখাচ্ছ ছোটকাকা?"

"ডাঃ দীপক গুহ। খুব বড় ইউরোলজিস্ট।"

"ডাঃ ব্যোমকেশ ভটচার্যকে একবার দেখিয়ে নাও না। ইদানীং তোমার বয়সী লোকেদের প্রসটেটে খুব ক্যান্সার হচ্ছে।"

কথাটা শুনে ছোটকাকার মুখটা সামান্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দেখে আমি মনে মনে হাসলাম। নিজেকে দ্রুত সামলে ভুঁ কুঁচকে ছোটকাকা বলল, "না রে। অন্য কোনও ডাক্তার দেখানোর দরকার নেই। সারা জীবন আমি কারও কোনও ক্ষতি করিনি। মা চণ্ডী অমন কঠিন অসুখের মধ্যে আমাকে ফেলবেন বলে মনে হয় না।"

"তবুও একটি সেকেন্ড ওপিনিয়ান নিয়ে রাখা ভাল।" কথাটা ইচ্ছে করেই বললাম, যাতে ছোটকাকা আমার উপর চটে। ছোট বেলা থেকে দেখছি, ছোটকাকা কারও সাজেশন পছন্দ করে না। আজ মুখোশ পরে কথা বলতে এসেছে। দেখি, কতক্ষণ মুখোশটা থাকে।

"শোন শিবা, তোর সঙ্গে একটা ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছিলুম। বোধহয়

boiRboi.net

কিছু শুনে টুনেছিস। গন্ধপুরে আমাদের এই কারখানাটা..... ওটা বোধহয় আর রাখা যাবে না। আমার বয়স হয়ে গেছে। নিজের সন্তানাদি কিছু নেই। তুইও দায়িত্ব নেওয়ার জন্য এগিয়ে এলি না। কী করা যায়, বল তো কারখানাটা নিয়ে?"

"রাখা যাচ্ছে না কেন ছোট কাকা?"

"অত বড় জায়গা। জবর দখল হয়ে যাচ্ছে। ফ্যাক্টরির সব ধসে পড়ছে। তুই তো ফ্রান্স থেকে কী সব শিখে এলি! আমি বলি কী, কারখানার ভার তুই এবার নে।"

"আমি? না, ছোটকাকা। আমি এখানে থাকব কি না, তার ঠিক নেই। আমি এই দায়িত্ব নিতে পারব না।"

দিদি এতক্ষণ চুপচাপ কথা শুনছিল। এবার জিজ্ঞেস করল, "তুই এখানে থাকছিস না মানে? কোথায় যাচ্ছিস?"

"কোথায় আবার, ফ্রান্সে। ওখানকার একটা কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছি। বছরে কুড়ি লাখ টাকার। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারও এসে গেছে।" ইচ্ছে করেই মিথ্যে কথাটা বললাম। দিদি নিশ্চিন্ত হোক। ছোট কাকাও মনে করুক, এদের বাড়া ভাতে আমি ছাই দিতে চাই না।

খুশি খুশি গলায় দিদি বলল, "কই, অ্যাদ্দিন তো কিছু বলিসনি ভাই। দ্যাখ না, আমার জোজোটাকেও নিয়ে যেতে পারিস কি না।"

"আগে নিজে গিয়ে সেটল করি। তারপর না হয় ভাবা যাবে।"

এইবার সরাসরি কথাটা পাড়ল ছোটকাকা, "শিবা, একটা পার্টি পাওয়া গেছে। কারখানাটা তারা কিনতে চাইছে। লাখ পঞ্চাশ পাওয়া যাবে। তোর মতামতটা তাই জানতে এলুম।"

ডিল হচ্ছে বাষট্টি লাখ টাকায়। ছোট কাকা বলছে, পঞ্চাশ লাখ। একটু বাজিয়ে নেওয়ার জন্যই বললাম, "তুমি যা ভাল বোঝো, করো কাকা। আমার কোনও ওপিনিয়ন নেই। তবে দামটা কম মনে হচ্ছে।"

"সেটা নেগোশিয়েট করে বাড়িয়ে নেওয়া যাবে। তোর দিদির কোনও আপত্তি নেই। এই বার তুই যদি হ্যাঁ করিস, তা হলে ফাইনাল ডিল-টা করতে পারি।"

শুনে গা পিত্তি জ্বলে গেল। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলাম না। উল্টে বললাম, "সে যা করার তুমি করো। দিদির যখন আপত্তি নেই, তখন আমার আর কী বলার আছে। দিদি ছাড়া আপন বলতে এখন আমার কে আছে বলো?"

কথাগুলো বলেই আমি দিদির দিকে তাকালাম। গত তিন-চারদিন ধরে দিদি আমার পিছনে ঘুরঘুর করছে মায়ের কয়েকটা গয়না হাতিয়ে নেওয়ার জন্য। একবার জিজ্ঞেসও করেছে, "হ্যাঁ রে ভাই, মায়ের সিন্দুকে যে চার গাছা মকরমুখী বালা ছিল, সেগুলো এবার নিয়ে যাব। গেল বার মা আমাকে দিতে চেয়েছিল। নিয়ে যাইনি। সিন্দুকের চাবিটা একবার আমায় দিবি?"

আমি দিইনি। মনে মনে বলেছিলাম, "বিচ।" মায়ের মৃত্যুর জন্য কোনও রকম শোক লক্ষ করিনি দিদির মধ্যে। দিব্যি রয়েছে। অথচ আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ঘুরতে-ফিরতে। মায়ের সিন্দুক আমি খুলেছি। বাবার উইলপত্রও সব ঘেঁটে দেখে

নিয়েছি। দিদির জন্য কিচ্ছু নেই। দিদি অবশ্য সেটা জানে না। জানলে নোংরামি শুরু করবে। ঠিক এই মুহূর্তে সেটা আমি চাইছি না। হাতে আমার অনেক সময়। দিদিকে টাইট করতে আমার বেশি দিন লাগবে না। সুপ্রতিমবাবুর পরামর্শ মতো, এখন একটা পা ফেলার আগে পরের তিনটে পদক্ষেপের কথা ভাবার চেষ্টা করছি। তাই গলায় আমার এখন মিষ্টি। 'দিদি ছাড়া আমার আর কে আছে বলো' এই কথাটা শুনে দিদি এত গলে গেল, বলল, "ভাই, ফুলকাকাকে আমি আগেই বলেছি, শিবা আমার কোনও কথায় না করবে না।"

শুনে ফের মনে মনে হাসলাম। মা মারা যাওয়ার আগে যে শিবা আমি ছিলাম, আজ তা নেই। টের পাবে, তুমি ভালমতোই টের পাবে। হাটখোলায় একটা এক কামরার ফ্ল্যাটে তুমি আর দীপেনদা যেখানে ভাড়া থাকতে, সেখানেই তোমাকে ফেরত পাঠানোর বন্দোবস্ত আমি করছি। মায়ের শরীরের কথা ভেবে, এক কথায় আমি শোভাবাজারের অত বড় দোতালা বাড়িটা তোমাকে দিয়ে চলে এসেছিলাম। ওটা আমার ফেরত চাই। আজ তো মা নেই। আমারও কোনও পিছুটান নেই। তোমার আবদার আমি আর সহ্য করব না।

ছোট কাকা আর দিদির মধ্যে একবার চোখাচোখি হয়ে গেল। তারপর ছোট কাকা বলল, "যাক, নিশ্চিন্দি হওয়া গেল। কবে মরে টরে যাব। তার আগে সব ভাগ বাটোয়ারা করে দিতে চাই।"

"তুমি কষ্ট করে আসতে গেলে কেন কাকা? আমাকে ডাকলেই তো চলে যেতাম।"

"তা কী হয় রে বাবা। বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার। সামান্য কারণে কোর্ট অবধি গড়াতে পারে।"

এটা প্রচ্ছন্ন হুমকি। কাকাই দিতে পারে। বাবাকে নাস্তানাবুদ করেছিল। আমাকে পারবে না। কারখানার সব কাগজপত্র আমার দেখা হয়ে গেছে। মায়ের শ্রাদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর এক সপ্তাহ ধরে আমি আর মিত্তির কাকা খুব খেটেছি। সুপ্রতিমবাবুর কাছে গিয়েও কিছু পরামর্শ নিয়ে এসেছি। ওদের খাটোরায় থাকেন কলকাতার হাইকোর্টের এক অ্যাডভোকেট সুশান্ত চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে কয়েকবার দলিল দস্তাবেজ নিয়ে বসেছি। ফুলকাকাকে আমি কোর্ট পর্যন্ত যেতে দেব না। এটা আমার স্ট্র্যাটেজি। বললাম, "বিক্রির ডিড কি করা হয়ে গেছে?"

"কথাবার্তা বলে রেখেছি। কাল-পরশুর মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। তোর আর কস্তুরীর ভাগে পড়ছে সাড়ে বারো লাখ করে। সামান্য বাড়তেও পারে। তোর কোনও আপত্তি নেই তো শিবা?"

প্রস্তাবটা শুনে ফের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল। তবুও নিরীহমুখে বললাম, "ঠিক আছে, আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। সই করে দেব।"

ফুলকাকা উঠে দাঁড়াল। তারপর ছড়িটা হাতে নিয়ে বলল, "আরেকটা কথা, কারখানাটা বিক্রি করা নিয়ে লোকাল কিছু ছেলে গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছে। তুই কি সে সম্পর্কে কিছু জানিস?"

ভাল মতোন জানি। তা সত্ত্বেও মুখে বললাম, "না কাকা। এরা কারা? আমি তো এখানে কারও সঙ্গে মিশি না। কিছু তো শুনিনি।"

"তাও ঠিক। আমিও ইদানীং ছেলে ছোকরাদের খবর-টবর রাখি না। এরা বলার চেষ্টা করছে, যারা কিনছে তারা ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি করলে নাকি এয়ার পলিউশন হবে। সে দিন একটা মেয়ে আমার বাড়িতে এ নিয়ে কথা বলতে গেছিল। আমি কোনও কথা বলিনি। তোর কাছে কেউ এসেছিল?"

"না কাকা। শুনে অবাকই লাগছে।"

"আমি অবশ্য পুরনো লোকজনদের লাগিয়ে দিয়েছি। কিন্তু দিনকাল তো বুঝিসই, বদলে গেছে। কিছু টাকা পয়সা খরচা করতে হবে উৎপাত বন্ধ করার জন্য। মুসকিলটা হচ্ছে, ছেলেগুলো ফোনে হুমকি দিচ্ছে। এখানে তো বটেই, কলকাতার বাড়িতেও।"

"তাই নাকি? তুমি পুলিশে জানাচ্ছ না কেন?"

"তাতে লাভ হবে না। কারখানার পুরনো লেবাররা এই ছেলেগুলোর পিছনে আছে। শুনলাম, কারখানার গেটে কিছু পোস্টারও মেরেছে। মিটিং করেছে। লিফলেট ছেড়েছে। কিছু টাকা পয়সা চায় আর কী। পুজোয় কিছু চাঁদা দিয়ে দেব ভাবছি।"

"দাও। তুমি যদি বলো, তা হলে ছেলেগুলোর সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি।"

"না, না। তুই বাচ্চা ছেলে। ও সব ঝামেলায় যাস না। রাস্তা ঘাটে তোকে কোনওদিন একা পেলে, হেকেল করে দেবে। ছেলেগুলো রাফিয়ান টাইপের। আমাকেই হ্যান্ডল করতে দে। চণ্ডী পুজোটা কেটে যাক। তারপর ওদের ব্যবস্থা করছি।"

ছোট কাকা এবার দরজার দিকে পা বাড়াল। বাবা মারা যাওয়ার অনেক আগে থেকেই এ বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। বেরিয়ে যাওয়ার আগে ছোটকাকা ঘরের ভেতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। মনে মনে বললাম, এই দেখাই তোমার শেষ দেখা হবে। কাকার সঙ্গে আমি আর গেট পর্যন্ত গেলাম না। দিদিকে বললাম, "তুই এগিয়ে দিয়ে আয়।" গেটের কাছে পৌঁছলে যাতে দিদি বলতে পারে, "দেখলে তো কাকা, ভাইটা কী বোকা।"

আজই হিয়াদের বাড়িতে বসে রমেন আমাকে অনেক খবর দিয়ে গেছে। গন্ধপুরের ফ্যাক্টরিটা আসলে নিচ্ছে সুজিত ঢোলকিয়া নামে একটা লোক। বিপ্লব সাধুখাঁ নয়। রমেনরা গিয়ে দেখা করে এসেছে সুজিত ঢোলকিয়ার সঙ্গে। খুব চমকেছে। আন্দোলনের কথা শুনে ঢোলকিয়া বলে দিয়েছে, ছোটকাকা ইতিমধ্যেই পনেরো লাখ টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে বসে আছে। একটু আগে সে কথাটা ঘুণাক্ষরেও বলল না ছোটকাকা।

রমেন আরও বলল, "জানেন শিবাশিসদা, ঢোলকিয়া লোকটা ব্যবসাদার তো। ওই রকম একটা জায়গায় ফ্যাক্টরির লোভও ছাড়তে পারছে না। আমাদের একরকম কথা বলল, আবার শুনলাম, আপনার ছোটকাকার সঙ্গে ফ্যাক্টরিতে এসে

রিনোভেশনের কাজ আরম্ভ করে দেবে কাল থেকে। যদি আসে, তা হলে কিন্তু আমরা ঘেরাও করব। ফ্যাক্টরির ভেতর দু'জনকে আটকে রাখব। কিছু লোক এমন খেপে আছে, মারধরও হয়ে যেতে পারে।" রমেনের এই কথাগুলো শুনে আমি কোনও মন্তব্য করিনি।

ছোটকাকা চলে যাওয়ার পর দোতলায় উঠে এলাম। আজ আর কোথাও বেরোনোর নেই। এই মুহূর্তে কোনটা অগ্রাধিকার দেব, ঠিক বুঝতে পারছি না। মঁসিয়ে বেনোনিল খুব উৎসাহ দিয়ে গেছেন। আমি নিয়মিত যোগাযোগও রাখছি ওঁর সঙ্গে। কাগজপত্র যা পাঠানোর, পাঠিয়েছি। একটা কেমিকেল এজেন্সি খুলে, জীবন ধারণের একটা সুরাহা করে, বাকি সময়টায় রিসার্চ করার পিছনে দেব, না ফ্যাক্টরি করে আমার পারফিউম বাজারে ছাড়ব—সে ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। মাঝে ফোনে মঁসিয়ে বেনোনিল সাবধানও করে দিলেন, "তোমার মধ্যে যে সৃষ্টির প্রতিভা আছে, তাতে মরচে পড়তে দিও না।"

ইসিপকা, অর্থাৎ আমার ইন্সটিটিউট থেকে নতুন একটা ম্যাগাজিন কাল বিকেলে এসেছে। পড়া হয়নি। সেটা নিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এই ম্যাগাজিনটা এলে আমি প্যারিসের একটা গন্ধ পাই। পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। নতুন অনেক তথ্য জানা যায়। ডোমজুড়ে বসেই জানতে পারি, পারফিউম জগতের কোথায় কী ঘটছে। তাই ম্যাগাজিনটা আমি রয়ে সয়ে পড়ি। প্রথমে একবার চোখ বুলিয়ে যাই। তারপর কোনও সময় একেবারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি।

ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে গিয়ে হঠাৎ একটা পরিচিত ছবি দেখে উঠে বসলাম। আরে, এ তো বোর্নিয়ে! আমার সঙ্গে ইসিপকায় পড়ত ইমানুয়েল বোর্নিয়ে। শুধু পড়ত, বলা ভুল হবে, হোস্টেলে আমার রুমমেট ছিল। ম্যাগাজিনে ওর ছবি কেন? তাড়াতাড়ি পড়তে শুরু করলাম। ছবির নীচে ওর পরিচিতি। তাতেই জানলাম, ও এখন আমেরিকায়। চাকরি করছে জিয়ান্নি ভিভ সুলেমান নামে বিরাট একটা ফ্যাশান হাউসে। একটা নতুন পারফিউম তৈরি করেছে বোর্নিয়ে। বিশ্বে এটাই নাকি সবথেকে দামি পারফিউম।

আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। বোর্নিয়ের এই পারফিউমের একটা বোতলের দামই কুড়ি লাখ টাকা। নাম পারফুম সিক্স। নামটা পড়েই মনে হল, এটা শ্যানেল ফাইভকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা। জিয়ান্নি কোম্পানি মাত্র ১৭৩টা বোতল বিক্রি করবে। পারফিউম ফুরিয়ে গেলে আবার তারা বোতল ভর্তি করে দেবে। যাঁরা কিনবেন, তাঁদের ইচ্ছেমতো বোতলটা সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই পারফিউমটা তৈরি করতে বোর্নিয়ের লেগেছে তিন তিনটে বছর। গন্ধটা জুঁইয়ের। তবে গ্রাসে শহরের সেরা গোলাপের নির্যাসও থাকছে। এ ছাড়া রয়েছে আরও উপাদান। সে সম্পর্কে কিছু লেখা নেই। বোর্নিয়ে বলেছে, পারফুম সিক্সের ফর্মুলাটা ও পেয়েছে ব্যাবিলনের একটা প্রাচীন পুঁথি থেকে।

ব্যাবলিন কথাটা পড়ার পরই বোর্নিয়ের মুখটা আমার মনে ভেসে উঠল। ও মার্সেই-য়ের ছেলে। মা মিশরীয়, বাবা ফরাসি। মিশরে ওর যাতায়াত ছিল। ছুটি

পেলেই ও চলে যেত মামার বাড়িতে। হোস্টেলে ওর মুখে মিশরের অনেক গল্প শুনতাম। মনে আছে, ও একবার বলেছিল, "ইজিপশিয়ানরা পারফিউমকে কী বলে জানো? ঈশ্বরের ঘাম। জিনিসটা এত পবিত্র আর মূল্যবান ওদের চোখে। মিশরকে তখন আমার রহস্যভরা একটা দেশ বলে মনে হত। ইসিপকা থেকে বেরিয়েই বোর্নিয়ে হয়তো চলে গেছিল মামার বাড়ির দেশে। খুঁজতে খুঁজতে গুপ্ত কোনও পুঁথি থেকে পেয়ে গেছে সুগন্ধির কোনও সূত্র।

বোর্নিয়ের আবিষ্কার সম্পর্কে ম্যাগাজিনে পড়লাম, পারফুম সিক্স কেনার জন্য নাকি ইতিমধ্যেই গ্রাহক হয়ে গেছেন পঞ্চাশজন। এঁদের মধ্যে আছেন হলিউডের বিখ্যাত সব তারকা, রাজ পরিবার আর কর্পোরেট জগতের লোক। ক্রিসমাস আর ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে উপহার দেওয়ার জন্য তাঁরা এই মহামূল্যবান পারফিউমটা কিনছেন। বোতলটা খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ক্রিস্টালের তৈরি বোতলের উপরে থাকবে প্লাটিনামের পাত্র। তাতে লাগানো হবে চুনী, পান্না ও হীরে। প্লাটিনামের পাত্রটি খোলার জন্য গ্রাহকদের দেওয়া হবে সোনার চাবি। এই বোতলটার ডিজাইন করে দিয়েছেন রোলস-রয়েস কোম্পানির দক্ষ কারিগররা। পারফুম সিক্সের এত দাম হবে কেন, মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল। তা বোতলের সাজসজ্জার কথা পড়ে মনে হল, কুড়ি লাখ টাকা দাম হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না।

প্রবন্ধটা পড়ে মনের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হতে থাকল। আমারই ক্লাসের একটা ছেলে আমেরিকায় গিয়ে হইচই ফেলে দিল। আর আমি? ডোমজুড়ের মতো জায়গার বাইরেই বেরোতে পারলাম না। এখন একটা পরিত্যক্ত কারখানা হাতের মুঠোয় নেওয়ার জন্য ঘরে বসে প্যাঁচ কষছি। কথাটা ভাবতেই নিজের উপর ঘেন্না হতে লাগল। মাত্র চার-সাড়ে চার বছরের মধ্যে বোর্নিয়ে আজ বিশ্বখ্যাত। আর আমি এক পাও এগোতে পারলাম না।

ভার্সেইতে মাঝেমধ্যে আমাদের ক্লাস নিতে আসতেন জ্যাঁ কার্লিও। পাতু কোম্পানির চিফ পারফুমার। সুগন্ধি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উনি আমাদের উৎসাহ দিতেন। চাইলে দামি কেমিকেলও পাঠিয়ে দিতেন। কার্লিও-র প্রিয় ছাত্র-দের মধ্যে আমিও ছিলাম। বোর্নিয়েকে উনি চিনতেন না। এ নিয়ে মাঝে মাঝে বোর্নিয়ে ঠাট্টা করত, "তোমার আর কী। পাশ করে বেরোলেই পাতু কোম্পানি তোমাকে নিয়ে নেবে। ভবিষ্যতে আমাদেরই কিছু হবে না।"

এই সব কথা যত মনে পড়ছে, ততই রাগ হচ্ছে নিজের উপর। কার্লিও বলতেন, "তোমার মধ্যে যদি সৃষ্টিধর্মী একটা মন না থাকে, তা হলে তুমি সুগন্ধি তৈরি করতে পারবে না। এই মনটাই তোমাকে নিরন্তর তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে। তোমাকে কখনও সুস্থির থাকতে দেবে না।" তা, কোথায় সেই তাগিদ? কোথায় আমার আত্মপ্রকাশের চেষ্টা? একটা পারফিউম আমি আবিষ্কার করেছি, যা অনবদ্য। অথচ সেটা বোতলবন্দি হয়েই পড়ে রইল। ডোমজুড়ে আমার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ছাড়া আর কেউ তা জানতে পারল না।

ইসিপকা-র ম্যাগাজিনটা টেবলের উপর রেখে, চোখ বন্ধ করে মনটাকে শান্ত

করতে লাগলাম। আমি আর বোর্নিয়ে একটা সময় একটা জায়গা থেকে শুরু করেছিলাম। সেই সময় কম কষ্ট করিনি। ইন্সটিটিউটে তখন প্রচুর খরচ। সেটা মেটানোর জন্য দু'জনে প্রায়ই অবসর সময়ে রেস্তোরাঁয় বয়ের কাজও করেছি। শ্যেন নদীতে রয়েছে পারিসিয়ান বলে একটা লঞ্চ কোম্পানি আছে। লঞ্চে করে ট্যুরিস্টদের তারা দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরিয়ে দেখায়। সেখানে একটা রেস্তোরাঁ ছিল। ক্লাস-শেষ করেই আমরা দু'জন সেখানে ছুটতাম। প্রতি ঘন্টায় কাজের জন্য চল্লিশ ফ্রাঁ। ছুটির দিনে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক। ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে টিপস নিতেও হাত কাঁপত না। সপ্তাহে হাজার খানেক ফ্রাঁ জুটে যেত। রোজ ক্লান্ত হয়ে হোস্টেলে ফিরতাম রাত ন'টায়। দিনের পর দিন এইভাবে কাটিয়েছি। মাকে কিছু জানতে দিইনি।

কস্তুরী মৃগনাভি দিয়ে পারফিউম তৈরি করে মানুষের যৌনলিপ্সা বাড়ানোর কথা আমি প্রথম আলোচনা করি ওই বোর্নিয়ের সঙ্গে। সেদিন ক্লাসে পড়ানো হচ্ছিল ফেরোমোন সম্পর্কে। কথা প্রসঙ্গে মৃগনাভির উদাহরণ দিয়েছিলেন প্রফেসর থমা। বলেছিলেন, পুরুষ হরিণের গন্ধ অণুতে আকৃষ্ট হয়ে যৌন তাড়নায় আড়াই কিলোমিটার দূর থেকেও হরিণী ছুটে আসতে পারে। জীবজন্তুর জগতে এই গন্ধ অণুই ভাষার কাজ করে। ইচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। সে দিনই মনে প্রশ্ন জেগেছিল, মানুষেরও কি ফেরোমোন আছে? মানবদেহের গন্ধ অণুতে আকৃষ্ট হয়ে একজন নারীও কি হরিণীর মতো পুরুষের কাছে ছুটে যেতে পারে? অন্য কথায়, এমন কোনও গন্ধ অণু কি কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা সম্ভব, যা ফেরোমোনের কাজ করবে?

কেন জানি না, পরবর্তীকালে আমার মনে হত, এমন গন্ধ তৈরি করা সম্ভব। এবং তা ওই কস্তুরী মৃগনাভি দিয়েই। ইন্সটিটিউটেই একদিন জ্যাঁ কার্লিও-কে এ নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি মুচকি হেসে বলেছিলেন, "ফেরোমোন ভিত্তিক পারফিউম তৈরির চেষ্টা অনেকেই করছেন। জানি না, কেউ সফল হয়েছেন কি না।"

"মঁসিয়ে, আমি চেষ্টা করব?"

"করতে পারো। তবে তুমি তো জানোই, মাসকোন (অর্থাৎ মৃগনাভি) কত দুষ্প্রাপ্য। সোনার চেয়ে কত মূল্যবান।" মঁসিয়ে কার্লিও আমাকে সেদিন উৎসাহ দেননি। আবার দমিয়েও দেননি। কিন্তু চিন্তাটা আমার মাথা থেকে মুছে যায়নি।

সত্যিই, আসল মাসকোন আমাদের মতো সামান্য পারফিউমারদের পক্ষে জোগাড় করা কঠিন। সারা বিশ্বে বছরে মাত্র সাড়ে তিনশো কেজি কস্তুরীর দানা পাওয়া যায়। এর অর্ধেকটাই চলে যায় ওষুধ উৎপাদনে। বাকিটা আসে পারফিউম জগতে। নামী কোম্পানি ছাড়া কারও হাতে তা পৌঁছয় না। আশ্চর্যের ব্যাপার, জ্যাঁ কার্লিও আরও কয়েকবার আমাদের ইন্সটিটিউটে আসা সত্ত্বেও এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। হয়তো আমার উচ্চশা দেখে মনে মনে কিছুটা বিরক্তই হয়েছিলেন।

দেশে ফিরে কস্তুরী নিয়ে আমি প্রচুর পড়াশুনো করেছি। পড়তে পড়তেই আমার আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকে—আমি যা চাই, সম্ভব। শেষে মোঘল আমলে লেখা এক পুঁথির সন্ধান দেন পণ্ডিত গৌরীনাথ ভট্ট। মৃগকস্তুরীর প্রভাব সম্পর্কে প্রচুর তথ্য ছিল সেই পুঁথিতে। মোঘল সম্রাট আকবর নাকি মৃগ কস্তুরীর সুগন্ধ অসম্ভব পছন্দ

করতেন। পানের মধ্যেও তিনি কস্তুরী ব্যবহার করতেন।

একবার গোসল করতে যাওয়ার আগে একটা পাত্রে তিনি অর্ধভুক্ত পান ফেলে দিয়ে গেছিলেন। তিনি স্নান সেরে চলে যাওয়ার পর গোসলঘর পরিষ্কার করতে ঢোকে এক পরিচারিকা। অর্ধভুক্ত পানের উচ্ছিষ্ট থেকে তখন মৃগকস্তুরীর গন্ধ বেরোচ্ছিল। সেই গন্ধের টানে লোভ সংবরণ করতে না-পেরে পরিচারিকাটি উচ্ছিষ্ট খেয়ে ফেলে। কী পরিণতি হবে, তা জানা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। গন্ধের উগ্রতায় সে কামাতুরা হয়ে ওঠে। পরে তার শরীর ঠাণ্ডা করা হয় দীঘির জলে চুবিয়ে।

প্রাচীন এই পুঁথিটা আমাকে একটা সূত্র দিয়েছিল। আমার পারফিউম কেন শারীরিক মিলনের ইচ্ছে বাড়ায়, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারব না। আমি শুধু তৈরির প্রক্রিয়াটা আয়ত্ত করেছি, বোর্নিয়ের আবিষ্কারের থেকে আমার কৃতিত্ব অনেক অনেক বেশি। ওর মাথায় ছাতা ধরে আছে জিয়ান্নি কোম্পানি। আমাকে ভিত গড়ারই সুযোগ দিল না কেউ। হঠাৎই মনে হল, জীবনটা একটা লম্বা দৌড়। এখনও সেই দৌড় শেষ হয়নি। শেষ ফিতেটা আমাকে ছুঁতেই হবে। তার জন্য যা কিছু করা দরকার, আমাকে করতেই হবে।

॥ নয় ॥

কী একটা কারণে সুপ্রতিমবাবু ডেকেছেন। বাইকটা নিয়ে বেরিয়েছি খাটোরায় যাব বলে। ভুলেশ্বরের মন্দিরের কাছে হঠাৎ দেখা হিয়ার সঙ্গে। পার্বতীপুরে ওর কয়েকজন বন্ধু থাকে। বোধহয় সেখানেই যাচ্ছে। আমাকে দেখে রিকশাওয়ালাকে দাঁড়াতে বলল। পরনে হলুদ রঙের শিফন শাড়ি। হালকা প্রসাধনেও ওকে দুর্দান্ত লাগছে। আমি বাইক থামাতেই বলল,

"কোথায় যাচ্ছেন শিবাশিসদা?"

বললাম, "তোমাদেরই বাড়িতে। তুমি এদিকে?"

"সীমার বাড়িতে যাচ্ছিলাম। আমার হেলথ ক্লাবের মেম্বার।"

"যাওয়াটা কি খুব জরুরি?"

"না। তেমন কিছু নয়। মেয়েটা বেশ কিছুদিন ধরে আসছে না। তাই ভাবছিলাম একবার খোঁজ করে আসি।"

কী মনে হল, বলে ফেললাম, "নেমে এসো। চলো, তোমাদের বাড়িতে ঘুরে আসা যাক।" কথাটা বলেই একটু সংকোচ বোধ হল। যদি হিয়া এড়িয়ে যায়। তা হলে লজ্জার আর শেষ থাকবে না।

হিয়া কিন্তু অনুরোধটা রাখল। রিকশাওয়ালাকে ছেড়ে দিয়ে তারপর আমাকে বলল, "চলুন, বাড়িতেই ফিরে যাওয়া যাক।"

আমার সাহস বোধহয় একটু বেড়ে যাচ্ছে। বললাম, "আরেকটা অনুরোধ রাখবে হিয়া? অনেকদিন ভুলেশ্বর মন্দিরের ভেতরে যাইনি। একবার যাবে?"

হিয়া বলল, "চলুন। আমিও বহুদিন ভেতরে ঢুকিনি।"

বাইকটা মন্দিরের বাইরে রেখে দু'জনে ভেতরে ঢুকলাম। মা নার্সিং হোমে থাকার সময় একবার এসে অনেকক্ষণ বসেছিলাম। ভেতরে বাঁধানো পুকুরের সিঁড়িতে। মনটা সেদিন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে গেছিল। আজ হিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চাতালে ঢোকার সময় মনে অন্য রকম একটা অনুভূতি হতে লাগল।

আমাদের এখানকার লোকদের মধ্যে একটা প্রথা চালু আছে। কোনও পরিবারে বিয়ে হলে নববধূকে নিয়ে যাওয়ার আগে ভুলেশ্বরের এই মন্দিরে একবার নিয়ে আসতে হয়। মন্দিরে ঢুকেই দেখলাম, বিয়ে বাড়ির লোকজনে ভর্তি। তবে কোনও চেনামুখ চোখে পড়ল না।

দু'জনে মিলে বিগ্রহকে প্রণাম করছি, হঠাৎ ফিসফিসানি কানে এল। "কোন বাড়ির মেয়ে গো। কী সুন্দর দেখতে মেয়েটাকে। দিদি দ্যাখো, কী সুন্দর মানিয়েছে দু'জনকে। ছেলেটা তো চৌধুরী বাড়ির। এই সেদিন মা মারা গেছে।" চোখ বোজা অবস্থাতেই বুঝতে পারছি, বিয়ে বাড়ির লোকজনের চোখ আমাদের দিকে।

মন্দিরের সেবাইত ভদ্রলোক আমাকে চেনেন। সবে বোধহয় দুপুরের পুজো সেরে উঠেছেন। হাতে প্রসাদী থালা। সামনে এসে আমার কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বললেন, 'তোমার মা ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবতী। মৃত্যুর খবর আমি শুনেছি। আমাকে একদিন ডেকো বাবা। চণ্ডীপাঠ করিও বাড়িতে। ওঁর আত্মার শান্তিতে।"

সেবাইত ভদ্রলোক সিঁদুরের টিপ দিলেন হিয়ার কপালে। তারপর বললেন, "আয়ুষ্মতী হও মা। সুখী হও।"

পকেট থেকে পার্স বের করে আমি একশো টাকার একটা নোট থালায় রেখে দিলাম। হিয়া আমার দিকে পাশ ফিরে বলল, "ইস, আমি পার্স আনতেই ভুলে গেছি।"

হিয়ার কপালে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুরের টিপ। ওর মুখের সৌন্দর্যটাই কেমন যেন বদলে গেছে। মুগ্ধ হয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম। বিব্রত হয়ে বলল, "কী হল চলুন।"

সিঁড়ি দিয়ে নেমে পুকুরের দিকে যেতে যেতে বললাম, "এসো, এখানে একটু বসি।"

বাঁধানো ঘাটে পাশাপাশি বসলাম। আকাশ মেঘলা। রোদের তাপ কম। মৃদু বাতাস বইছে। পুকুরের জল তিরতির করছে। অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম, হিয়ার সঙ্গে আলাদা বসে কথা বলব। সুযোগ হচ্ছিল না। মায়ের মৃত্যুর পর বেশ কয়েকবার ও আমাদের বাড়িতে গেছে। ওর সেই চপলতা হঠাৎই যেন উবে গেছে। এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে হিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। ওকে যে দিন প্রথম দেখি, সেইদিনই আমি মনস্থির করে ফেলেছি। তবে আমার ইচ্ছের কথা এখনই ওকে জানাতে চাই না। আজ হঠাৎই ওকে একান্তে পেয়ে গেলাম। জানি না, এর পিছনে ভুলেশ্বর বাবার কোনও ইচ্ছে আছে কি না।

মন্দিরের চাতাল থেকে উলুধ্বনির আওয়াজ ভেসে আসছে। তা শুনে হিয়া বলল, "বিয়ে বাড়ির লোকগুলো আমাদের নিয়ে কী রকম বোকা বোকা কথা বলছিল, শুনেছেন?"

সবই শুনেছি, তবুও বললাম, "কই না তো? কী বলছিল ওরা হিয়া?"

"কিচ্ছু শোনেননি আপনি? তা হতে পারে নাকি? শুনেও আপনি না শোনার ভান করছেন।"

"বিশ্বাস করো, আমি কিচ্ছু শুনিনি। আমি তখন চোখ বুজে তোমাকে দেখছিলাম।"

"চোখ বুজে আমাকে দেখছিলেন? বাব্বা, আপনাকে দেখে তো এত রোমান্টিক মনে হয় না।"

"কী মনে হয় হিয়া?"

"বলব কেন? আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? বেশ কিছুদিন আগে মাকড়দার বাজারে আপনি নাকি একাই দুই মাস্তানকে পিটিয়ে ঠান্ডা করে দিয়েছিলেন? কথাটা কি সত্যি?"

"কে বলল তোমাকে?"

"ওখানকার দু'টো ছেলে আসে আমার ক্লাবে। ওরাই কথায় কথায় একদিন আমাকে বলল।"

"বাপ রে, তোমার হেলথ ক্লাব তো দেখছি, খবরের কাগজের অফিস। তোমার ছেলে দু'টো আমাকে চিনল কী করে?"

"আপনি যতই মনে করুন, কেউ আপনাকে চেনে না, সবাই কিন্তু আপনাকে চেনে। একটা সিক্রেট খবর দেব আপনাকে?"

"কী খবর?"

"আমার ক্লাবে যে সব মেয়ে আসে, তারা অনেকেই কিন্তু আপনাকে মনে মনে পতিদেবতা হিসেবে চায়।"

কথাটা বলেই হাসতে লাগল হিয়া। আমার চোখের সামনে দিয়ে হঠাৎই যেন এক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ে গেল। কথার পিঠেই বললাম, "আর ক্লাবের মালিক? সে কী চায়?"

"তার কোনও চাহিদা নেই। তার হাতে এখন অনেক কাজ। তার অনেক অ্যাম্বিশন। সেগুলো ফুলফিল না করে সে কোনও দেবতার ঘাড়ে চাপবে না।"

"অ্যাম্বিশনগুলো কী, জানতে পারি?"

"এক নম্বর, মডেল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। দু'নম্বর, সব দিক থেকে আত্মনির্ভর হওয়া। তিন নম্বর...."

"সত্যিই কি তুমি মডেলিং করতে চাও হিয়া?"

"আপনার কি কোনও সন্দেহ আছে?"

"না। তা নয়। তবে এখানে ... এই ডোমজুড়ে পড়ে থেকে তুমি কতটা এগোতে পারবে?"

"কে বলেছে আমি ডোমজুড়ে পড়ে আছি? সপ্তাহে তিনদিন আমি কলকাতায় যাচ্ছি ক্লাস করার জন্য। ড্রিম মার্চেন্টস বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সে। সঞ্চারী বলে আমারই বয়সী একটা মেয়ে ট্রেনিং দেয়, বিপাশা বসু শুরু

করেছিল ওর কাছেই।"

"তুমি কি বিউটি কনটেস্টেও নামতে চাও?"

"অফ কোর্স। ইন ফ্যাক্ট, আর দু'সপ্তাহ পরেই তাজ বেঙ্গলে একটা কনটেস্ট আছে। তার জন্য আমি তৈরি হচ্ছি। সঞ্চারীদি বলেছে, আমাকে নামাবে। মিস ক্যালকাটা কনটেস্টে।"

প্রথম দিন হিয়াকে জেদি, অবাধ্য ধরনের মেয়ে বলে মনে হয়েছিল। আজ কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। কথাবার্তায় বেশ আত্মবিশ্বাসের ছাপ। এই বয়সে বাঙালি মেয়েরা বিয়ে -থা করে অন্য জীবনের স্বপ্ন দেখে। তবুও তো হিয়া একটা পেশা নিয়ে ভাবছে। দশ-পনেরো বছর আগেও বাঙালি মেয়েরা মডেলিং বা বিউটি কনটেস্ট নিয়ে মাথা ঘামাত না। সুস্মিতা সেন মিস ইউনিভার্স হওয়ার পর অনেকেই এই পেশাটা নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে। মন্দ কী।

"একটা কথা বলব শিবাশিসদা? হাসবেন না বলুন।"

"আরে না, না। বলো।"

"গ্রাসিম মিঃ ইন্ডিয়ার জন্য সঞ্চারীদি ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আপনি নামবেন? বুধবার গ্রান্ড হোটেলে উনি ছেলেদের ইন্টারভিউ নেবেন। যাবেন? আমার মনে হয়, আপনি সিলেক্টেড হয়ে যাবেন।"

ঠাট্টা করে বললাম, "ট্রেনিংটা যদি তুমি দাও,তা হলে যেতে পারি।"

হিয়া বলল, "আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি।"

"তোমার মাথা খারাপ হিয়া? আমি গন্ধের কারবারী। গন্ধের জগৎ নিয়ে বেশ আছি। আমার দ্বারা ও সব হবে না।"

"আপনার প্রফেশনটা অদ্ভুত, না শিবাশিসদা? সেদিন টি ভি-তে রীতা আনন্দ বলে মহিলার ইন্টারভিউ হল। ফুড ফ্লেভার এক্সপার্ট। উনি কি আপনাদের লাইনের?"

"না। ওটা একটু আলাদা লাইন। যেমন, কসমেটিক্স একটা লাইন।"

"মিলিদি একদিন আমাকে বলল, আপনি নাকি একটা আশ্চর্য গন্ধ তৈরি করেছেন? সত্যিই কি গন্ধ তৈরি করা যায়?"

"অবশ্যই করা যায়। আমাদের কাজই তো গন্ধ তৈরি করা। মানে, সুগন্ধি তৈরি করা। আমাদের কাজের কদর সারা বিশ্ব জুড়ে।"

"লোকে এত পারফিউম মাখে?"

"পারফিউম তো শুধু মাখার জন্য নয়। দৈনন্দিন নানা দরকারে এখন লাগে।"

"তার মানে?"

"বলছি। আগে বলো তো, সারা দিনে তুমি কতবার পারফিউম ব্যবহার করো?"

"একবার অথবা বড় জোর দু'বার।"

"মোটেই না। অনেকবার। তুমি নিজেই জানো না।"

"ধ্যাত। তা হতে পারে?"

"বলব? সকালে ঘুম থেকে উঠেই যে টুথ পেস্টটা তুমি ব্যবহার করো, তাতে পারফিউম আছে। দাঁত ব্রাশ করে তুমি চা খেতে বসলে। সঙ্গে বিস্কুট অথবা কেক।

তাতে নিশ্চয়ই একটা মিষ্টি গন্ধ পাও। সেটা পারফিউমের। এর পর তুমি স্নানে গেলে। যে তেল বা শ্যাম্পু মাখো, তা তৈরি করতেও পারফিউম লাগে। তারপর ধরো, সাবান। এইভাবে, সারা দিন এমন অনেক জিনিস তুমি ব্যবহার করো, যা পারফিউম ছাড়া লোকে কিনবেই না।"

হিয়া অবাক হয়ে শুনছে। বলল, "ঠিক বলেছেন তো। এতদিন খেয়ালই করিনি। আপনি বলার পর এখন মনে হচ্ছে সত্যি।"

"একটা কথা বলব হিয়া। সে দিন যখন তুমি সুব্রতদার দেওয়া পারফিউমটা নষ্ট করছিলে, আমার খুব খারাপ লেগেছিল।"

"সুব্রতদাকে টেস্ট করছিলাম। রেগে যায় কি না।"

"এখনও কি রোজ ফোন করে সুব্রতদা?"

হিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, "না। অনেক দিন যোগাযোগ করছে না।"

"অদ্ভুত লোক তো! বিয়ের জন্য এত আগ্রহ দেখিয়ে গেল। অথচ ....."

"সুব্রতদার ব্যাপারে একটা কথা জিজ্ঞেস করব শিবাশিসদা। প্যারিসে কি ওর সঙ্গে কোনও মহিলা থাকেন?"

"থাকার তো কথা নয়।"

"যতবার আমি সুব্রতদার অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করছি, এক মহিলা ফোনটা তুলছেন। উনি ফরাসি ভাষায় কী বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না। দিদি এ সব শুনে মন খারাপ করে রয়েছে।"

"আমি ফোন করে দেখব তো একবার। এই কারণেই কি তোমার বাবা আজ আমাকে ডেকেছিলেন?"

"হ্যাঁ। বাবা আপনাকে খুব বিশ্বাস করেন। আপনার কথাতেই এই বিয়েতে মত দেন।"

"আজ রাতেই সুব্রতদাকে একবার ধরার চেষ্টা করব। তুমি ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও। তোমার হেলথ ক্লাব কেমন চলছে, বলো?"

"খুব ভাল। আপনি তো একদিনও দেখতে এলেন না।"

"চলো। আজ যাই।"

"যাবেন? চলুন তা হলে।" বলেই হিয়া উঠতে গিয়ে ফের বসে পড়ল। তারপর বলল, "আমার পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেছে। আমাকে একটু তুলুন।"

হাতটা ধরে ওকে তুললাম। ও আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "দাঁড়ান, ছাড়বেন না। এখনও ছাড়েনি।"

হিয়া আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ওর শরীর থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। কোনও পারফিউমের গন্ধ নয়। পূর্ণযৌবনা একটা শরীরের গন্ধ। হিয়া সামান্য মুখ কুঁচকে আছে। খানিকটা বিব্রত হওয়ার ভঙ্গিতে। ওর চূর্ণ কুন্তল, কপাল, নাক, ঠোঁট, চিবুক, গ্রীবা দেখতে দেখতে আমার শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হতে লাগল। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আমি হঠাৎ অনুভব করলাম, মানুষেরও ফেরোমোন আছে। এই গন্ধটা আমাকে টানছে। আমি সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছি।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হিয়া সোজা হয়ে দাঁড়াল। হঠাৎই আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মুখে বিস্ময়ের রেখাগুলো ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। মুখ হচ্ছে মনের আয়না। আমার মুখ দেখে হিয়া কি তা হলে কিছু বুঝতে পারল? পুরুষের চোখের ভাষা মেয়েরা চট করে বুঝতে পারে। একটা মুহূর্ত মাত্র। নিজেকে সামলে, স্মিত হেসে হিয়া বলল, "কী হল, চলুন?"

মন্দিরে ঢোকার সময় আকাশে মেঘ ছিল। এখন কেটে গেছে। পশ্চিমদিকে সূর্য ঢলে পড়েছে। গাছের ফাঁকে লালচে আভা। মোরামের রাস্তার অনেক জায়গায় জল জমে আছে। বাইক স্কিড করতে পারে। পিছনের সিটে বসে হিয়া আমাকে ছুঁয়ে আছে। আমার জীবনের সবথেকে প্রিয় মানুষ। সাবধানে বাইক চালাতে লাগলাম।

মায়ের কাজের দিন হিয়াকে দেখে দিদি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "ওই লম্বা পানা মেয়েটা কে রে?"

দিদির কথায় সামান্য ঝাঁঝ লক্ষ করে আমি বলেছিলাম, "সুব্রতদার হবু শালি। কেন রে?"

"মেয়েটা কি এ বাড়িতে মাঝেমধ্যেই আসে।"

'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' টাইপে বললাম, "প্রায়ই।"

"যে ভাবে সবাইকে অর্ডার করে যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে এ বাড়িটা ওরই।"

আমার পাশেই তখন বসে জোজো বলে উঠেছিল, "একদিন হতেও পারে?"

দিদি ভ্রু কুঁচকে বলেছিল, "তার মানে?"

দিদির চোখ-মুখই বলে দিয়েছিল, হিয়াকে পছন্দ করেনি। তাই ইচ্ছে করেই সেদিন আমি আর জোজো খুব প্রশংসা করেছিলাম হিয়ার। শুনে দিদি মন্তব্য করেছিল, "এ সব মেয়ে ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়।" দিদির কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল মন্তব্য আশা করাই অন্যায়। আজ যদি দিদি দেখত, বাইকে বসিয়ে হিয়াকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি, নির্ঘাত জ্বলে উঠত।

রূপছবি সিনেমার কাছে হঠাৎ হিয়া বলল, "শিবাশিসদা, একটু দাঁড়াবেন। একটা জিনিস কেনার ছিল।"

বললাম, "কী কিনবে?"

উত্তর দিল না হিয়া। আমি বাইকটা দাঁড় করাতেই মুচকি হেসে ও সতীমা স্টোর্সে ঢুকল। সিনেমা হলে ইভনিং শো শুরু হবে। রাস্তার ধারে বেশ ভিড়। হিন্দি সিনেমা চলছে। ব্ল্যাকারদের রমরমা। রূপছবি হলে কোনওদিন আমি ঢুকিনি। বাইরে থেকে হলের চেহারা দেখে ভেতরে ঢোকার ইচ্ছে কখনও হয়নি। এ রকম অস্বাস্থ্যকর হলে বসে মানুষ কী করে সিনেমা দেখে, ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই একেক সময়। এই অঞ্চলে মাত্র তিনটে সিনেমা হল। উপায় কী। বাড়তি দাম দিয়েও লোকে বিনোদনের রাস্তা খোঁজে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হাতে একটা পলিথিনের প্যাকেট ঝুলিয়ে হিয়া দোকান থেকে বেরিয়ে এল। ঠাট্টা করে বললাম, "কী এমন কিনলে, এতক্ষণ সময় নিল?"

হিয়া বলল, "এত কৌতূহল কেন মশাই?"

"কৌতূহল তো তুমিই বাড়িয়ে দিচ্ছ?"

পিছনের সিটে বসে হিয়া কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, "ব্যাচেলরদের জানতে নেই। মেয়েদের জিনিস। প্রতিমাসে দরকার হয়।"

এমন ভাবে হিয়া কথাটা বলল, আমি হেসে ফেললাম। ক্রমেই ও সহজ হচ্ছে আমার কাছে। এটা ভাল লক্ষণ। মিলির সঙ্গে ছোটবেলা থেকে আমার এত ঘনিষ্ঠতা। মিলিও কিন্তু আমাকে এত স্বচ্ছন্দে এই কথাটা বলতে পারত না। হাওড়া-আমতা রোডে উঠে বাইকে স্পিড তুললাম। ইচ্ছে হচ্ছে, হাইওয়ে দিয়ে যতদূর ইচ্ছে, চলে যাই। কিন্তু বাণীশ্রী হলের কাছে পৌঁছতেই হিয়া বলে উঠল, "এই শিবাশিসদা, থামুন। এসে গেছি।"

মা যেদিন মারা যায়, সে দিন একবার এখানে এসেছিলাম। ভেতরে ঢুকিনি। আজ ভেতরে ঢুকে মনটা ভরে গেল। ফ্রান্সে যাওয়ার আগে রোজ আমি বিষ্টু ঘোষের জিমন্যাসিয়ামে ব্যায়াম করতে যেতাম। এখনও সময় পেলে ফ্রি হ্যান্ড করি। আমাদের শরীরটা সুস্থ রাখতে হয়। বিশেষ করে পেট। শরীর সুস্থ না থাকলে গন্ধ চেনা কঠিন হয়ে যায়। এই কারণেই আমি কোনও বদভ্যাস করিনি। সিগারেট খাই না। মদ্য পান করি না। খুব মশলা দেওয়া খাবার খাই না। হিয়ার ক্লাবে এসে মনে হল, ফের ব্যায়ামটা শুরু করলে ভাল হয়।

চমৎকার সাজানো গোছানো রিশেপসন। আর্নল্ড শোয়েৎজারের বিরাট ছবি। আমাদের দেখে রিশেপসনের মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। হিয়া পরিচয় করিয়ে দিল, "এ হচ্ছে দময়ন্তী। মেয়েদের ইন্সট্রাকটর। যোগ ব্যায়ামে আটবার বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন। দাশনগর থেকে আসে।"

একতলাতেই ষোলো স্টেশনের দুটো মাল্টি জিম। একটা মেয়েদের জন্য। অন্যটা পুরুষদের। হিয়া ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাতে লাগল আমাকে। ঝকঝকে সব অ্যাপারেটাস। হিয়া বলল, "দোতলায় সাওনা বাথ, ম্যাসাজ পার্লার, ফিজিওথেরাপি সেন্টার।" পুরুষদের ঘরে কয়েকটা অল্পবয়সী ছেলে ব্যায়াম করছে। হিয়া বলল, "সন্ধে ছ'টার পর মেয়েদের ঘর বন্ধ হয়ে যায়। তখন অনেক ছেলে আসে।"

একতলাতেই একটা ঘরে মিউজিক বাজছে। নীল ট্র্যাকসুট পরা নানা বয়সী দশ-বারোটা মেয়ে ওয়ার্ম আপে ব্যস্ত। সামনে একটা দরজা। মাথার উপর লেখা, "চেঞ্জিং রুম।" হিয়া বলল, "মেয়েরা এসে আগে এই ঘরে ড্রেস বদলে, তারপর ফ্লোরে নামে।

দেখে মনে হল, হিয়ার এলেম আছে। ফ্লোরে দাঁড়িয়েই ও জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগছে শিবাশিসদা?"

বললাম, "দারুণ। তবে একটা জিনিসের অভাব আছে। কাল কাউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। একটা স্প্রে দিয়ে দেব। ঘরে হালকা একটা মিষ্টি গন্ধ ভাসলে ব্যায়াম করার এনার্জি বাড়বে।"

কথাটা শেষ হতেই চেঞ্জিং রুমের দরজাটা খুলে গেল। একটা মেয়ে বেরিয়ে এল। নীল ট্র্যাকশুটে অন্য রকম দেখাচ্ছে। কিন্তু দেখেই চিনতে পারলাম। পলি বিশ্বাস! সুরেশ জালানের গাড়িতে সেদিন যাকে দেখেছিলাম।

BanglaBook.org

॥ দশ ॥

কাল রাতে ফোন করে মিলি বলেছিল, "শিবাদা, একবার আমাদের বাড়িতে আসতে হবে। জরুরি দরকার।"

বলেছিলাম, "কী হয়েছে মিলি?"

"ফোনে বলা সম্ভব না। প্লিজ তুমি এসো।"

ওর গলায় এমন একটা আকুতি ছিল, আমি আর কিছু জানতে চাইনি। নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু হয়েছে। না হলে মিলি এ ভাবে ডাকত না। কাল বিকেলে দিদি ডোমজুড় থেকে শোভাবাজারে গেছে। বোধহয় মিলিদের বাড়িতে গেছিল। একটা কিছু ঘোঁট পাকিয়েছে। আমার মন বলল, হয়তো সেই কারণেই মিলির এই জরুরি তলব।

ফোনে মিলি বলেছিল, "সকাল সকাল বেরিয়ে এসো। দুপুরে এখানে খাওয়া-দাওয়া করবে। আমি কিন্তু অফিস কামাই করব।"

আজ এমনিতেই আমি কলকাতার দিকে যেতাম। দু'টি কারণে। এক, কিছু কেমিকেল ফুরিয়ে গেছে। সেগুলির জন্য মেছুয়া বাজারে মিত্রের দোকানে ফোন করেছিলাম সপ্তাহখানেক আগে। সব সময় পাওয়া যায় না। তাই দরকারি কেমিকেল সিঙ্গাপুর বা হংকং থেকে এলেই ওরা ফোন করে খবর দিয়ে দেয়। কাল বিকেলে ওরা ফোন করে বলেছে, "তাড়াতাড়ি নিয়ে যান। মাল একবার এজরা মার্কেটে ঢুকে গেলে আর নাও পেতে পারেন।"

ডোমজুড়ে আজ থাকতে না চাওয়ার দ্বিতীয় কারণ হল, নিজেকে কারখানার হাঙ্গামার বাইরে রাখা। রমেনরা ঠিক করে রেখেছে, আজ ছোটকাকা যখন ঢোলকিয়াকে নিয়ে কারখানায় যাবে, তখন একটা ঝামেলা পাকাবে। ওদের ঘেরাও করবে। ছোটকাকাও ছোড়নেওয়ালা পার্টি না। নিজের লোকজন অবশ্যই রাখবে। হাতাহাতি-মারামারি বেঁধে যাওয়াও অস্বাভাবিক না। ছোটকাকাকে আমি এখনই জানতে দিতে চাই না; রমেনদের সঙ্গে আমার কোনওরকম যোগাযোগ আছে। প্ল্যান অনুযায়ী, সুস্মিতা বিকেলের দিকে ফোন করে আমাকে জানাবে কী হল। মিলিদের বাড়ির ফোন নাম্বারটা ওকে দিয়ে রেখেছি। মিলি নেমন্তন্ন করায় আমার সুবিধেই হয়েছে।

গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বেশ কিছুদিন বের করা হয়নি। আজ বের করলাম। জোজো এলে রোজ একবার করে ধোয়া-মোছা করে। ইঞ্জিনে স্টার্ট দেয়। আমি না থাকলে কাছাকাছি এ দিক-ওদিক নিয়ে বেরোয়। ওদের সঙ্গে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের কলেজে পড়ে একটা ছেলে প্রীতম। দোরে পাড়ার দিকে থাকে। ইদানীং দেখছি, ওর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে জোজোর। ছেলেটা দু'তিনবার এসেছেও আমাদের বাড়িতে।

আমার গাড়ির রঙ লেমন ইয়েলো। মায়ের খুব পছন্দ ছিল রঙটা। অনেক দিন পর স্টিয়ারিংয়ে হাত দিয়ে, কথাটা মনে হতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। গাড়ি রয়ে গেছে,

BanglaBook.org

মানুষটাই নেই। ক্রিসমাসের দিন মা আর আমি এই গাড়িতেই মিলিদের বাড়ি গেছিলাম। ফেরার সময় মাকড়দা বাজারের সামনে গাড়িটা মা দাঁড় করাতে বলল। মাকড়চণ্ডীর মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করে এল। ফিরে এসে বলল, "হ্যাঁ রে, পঞ্চম দোলের দিন এখানে একবার নিয়ে আসবি?" দোলের পঞ্চম দিনে ওখানে একটা মেলা বসে। মাকড়দায় ও দিন বড় একটা উৎসব। বলেছিলাম, "নিয়ে আসব মা।" দোল এসে গেল। কিন্তু মা নেই।

গাড়ি নিয়ে বেরোনোর আগে রোয়াকে দাঁড়ানো মিনু পিসিকে বললাম, "যদি কেউ ফোন-টোন করে তা হলে বোলো রাতের দিকে ফিরব।" মিনু পিসি ঘাড় নাড়ল। আমাদের বাড়িটা এখন এই মিনু পিসিই আগলাচ্ছে। সারাটা দিন কাজকর্ম সেরে রাতের দিকে নিজের বাড়িতে চলে যায়। ছোট বেলায় আমাকে কোলে-পিঠে মানুষ করেছে। এমন মায়া, কাজটা ছাড়তে পারছে না। আমাকে শুধু বলল, "সাবধানে যেও, ছোটদাবাবু। কলকাতার রাস্তাঘাট ভাল না।" কথাটা মাও বলত।

মাকড়দার বাজারের কাছে আজ থাকতে বলেছিলাম কালুয়াকে। ওকে ভীষণ দরকার। কাল রাতে ও ফোন করেছিল। আবার কিছু টাকা দরকার। বলেছি, "টাকা দেব। তবে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।" ও বলেছে, আমার যে কোনও কাজের জন্য ও জান লড়িয়ে দেবে। মাকড়দা বাজারের কাছে পৌঁছতেই দেখলাম, হাফ হাতা শার্টের ওপর সোয়েটার আর পাজামা পরে ও দাঁড়িয়ে আছে। দেখে কে ভাববে, ওর বিরুদ্ধে দশ বারোটা মার্ডার চার্জ আছে? ও শোভাবাজার অঞ্চলে এক সময় বিভীষিকা ছিল? অনেকদিন পরে কালুয়াকে দেখলাম। একটু রোগা হয়ে গেছে। কিন্তু রাস্তা পেরিয়ে এল ঘাড় সিধে করে। পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে ওকে দিলাম। দু' তিন মিনিট কথা বলেই আমি রওনা দিলাম কলকাতার দিকে।

আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। গত বছর মিলি আমাকে একটা সোয়েটার বানিয়ে দিয়েছিল। ওকে খুশি করার জন্যই সেটা আজ পরে এসেছি। মা মারা যাওয়ার পর কয়েকটা দিন মিলি আমার জন্য যা করেছে, তা আমি ভুলতে পারব না। কয়েকটা দিন তো ও ডোমজুড়েই পড়েছিল। মায়ের সম্পর্কে মিলির প্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল। যেমন মিলি সম্পর্কে মায়েরও। মিলি প্রসঙ্গে কোনও কথা উঠলেই মা বলত, "ওর মতো মেয়ে হয় না। ও আমার ছোট মেয়ে।" মাঝেমধ্যে আমি মাকে রাগাতাম, "দেখো, তোমার সম্পত্তির একটা ভাগ আবার ওকে লিখে দিও না।"

বোম্বে রোড থেকে বাঁ দিকে কোনা এক্সপ্রেস হাইওয়েতে ঢুকতেই দেখি, রাস্তার ধারে একটা টাটা সুমোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে অমিত খৈতান। আমার সঙ্গে সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ত। একেবারে বদলায়নি। ব্যাটা এখানে দাঁড়িয়ে কী করছে। প্রায় আট বছর পর ওকে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে বললাম, "এই অমিত, তুই এখানে?"

ও আমার দিকে তাকিয়ে, চিনতে পেরে বলল, "শিবা তুই?"

গাড়ি থেকে নেমে বললাম, "আমি তো এখন ডোমজুড়ে থাকি। তুই কোথায় এসেছিলি?"

"কাল গেছিলাম বড়গাছিয়ায়। গাড়িটা খারাপ হয়ে গেল। ড্রাইভারটা মেকানিক ডাকতে গেছে। কখন আসবে শালা, কে জানে? তা, তোর খবর কী বল। এই ক'দিন আগেই তোর কথা আলোচনা হচ্ছিল কলেজের অ্যালমনিতে। সৌরভই বলল, তুই নাকি একটা ডিগ্রি নিয়ে এসেছিস ফ্রান্স থেকে? সৌরভ বোধহয় তোদের ওখানে কী একটা উদ্বোধনে গেছিল। সেখানেই শুনেছে।"

বললাম, "ও কিছু না। তুই এখন যাবি কোথায় বল।"

"যাওয়ার কথা তো বাড়ি হয়ে অফিস। এখন আর বাড়ি যাওয়ার টাইম নেই। এগারোটায় একটা মিটিং আছে অফিসে। পৌঁছতে পারব কি না, বুঝতে পারছি না।"

"চল, আমার সঙ্গে চল।"

সুমো-র ভেতর আরও একজন বসে, আমি লক্ষ করিনি। অমিত তাকে বলল, "মুনিমজি, আমি বন্ধুর সঙ্গে অফিসে চলে যাচ্ছি। গাড়ি নিয়ে সিধা আপনি চলে আসবেন অফিসে।"

বলেই অমিত এসে বসল আমার গাড়িতে। এখনও একই রকম আছে। কলেজে ওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। তখন ওরা থাকত বি কে পাল অ্যাভেনিউতে। আমাদের বাড়ির খুব সামনে। কলেজে প্রায়ই ডুব মারত অমিত। প্রায়ই আমার কাছে আসত নোটস নিতে। তখন গালাগাল দিলে বলত, "পাশ করি অথবা ফেল, আমাকে তো সেই গিয়ে বসতে হবে বাবার গদিতে। পার্সেন্টেজ রেখে আমার লাভটা কী বল?"

গাড়ি চালাতে চালাতে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোর অফিসটা কোথায় রে অমিত?"

"চৌরঙ্গি লেনে।"

"তোর বাবা-র গদি ছিল না কালাকার স্ট্রিটে?"

"সেটাও আছে। গদিতে এখন ছোট ভাই বসে। সুমিতকে তো তুই দেখেছিস। কস্ট অ্যাকাউন্টেন্সি পাশ করেছে। এখন পিগ আয়রন কেনা-বেচা করে। স্ক্রাপের কাজও করে। যখন যেমন আর কী।"

ওদের পক্ষেই সম্ভব। কস্ট অ্যাকাউন্টেন্সি পাশ করা একটা ছেলে মুখ বুজে বাবার গদিতে গিয়ে বসেছে। বাঙালি ছেলে হলে নাক কোঁচকাত। যেমন, একটা সময় আমি ভাবিইনি নিজে কিছু করব। অমিত অবশ্য বলত, "শিবা, ফ্যামিলি বিজনেসে ঢোকার কথা ভাব। যা দিনকাল আসছে, চাকরি করে কিছু হবে না।" তখন আমার চোখে নানা স্বপ্ন। অমিতের কথায় গুরুত্ব দেওয়ার সময় কোথায়? আজ ওকে দেখে মনে হল, তখন কথাগুলো শুনলেই ভাল করতাম। আটটা বছর বোধহয় শুধু শুধু নষ্ট করলাম।

কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, "তুই বড়গাছিয়ায় কেন গেছিলি?"

অমিত বলল, "ওখানে তো একটা ফ্যাক্টরি করেছি। ছিপি তৈরির। নানা ধরনের ছিপি। ওষুধের বোতলের। সফট ড্রিঙ্কসের বোতলের। ছোট্ট ইউনিট। ষাট-পঁয়ষট্টি জন লোক কাজ করে। কিনিয়া আর ঘানা-তেও ছিপি পাঠাই। একদিন তোকে নিয়ে

যাব। আমি তো জানতামই না তুই ডোমজুড়ে আছিস। আমার যতগুলো ফ্যাক্টরি আছে, তার মধ্যে এটাই সব থেকে বেশি লাভ দেয়।"

"কতগুলো ফ্যাক্টরি আছে তোর?"

"আমার মোট পাঁচটা ফ্যাক্টরি। আরেকটা করার জন্য গাভমেন্টের কাছ থেকে একটা জমি নিয়েছি ইস্টার্ন বাইপাসে। লেদার কমপ্লেক্স করব। এখন চারদিকে দেয়াল তুলছি। আশা করছি, এক বছরের মধ্যে কাজ শুরু করে দেব।"

"ও বাবা, সে তো অনেক টাকার ব্যাপার!"

"প্রায় দেড়শো কোটি তো হবেই। আমি একা নামছি না। আরও তিনজন আছে। আর টাকার কথা বলছিস? এখন ঘরের টাকা ভেঙে কেউ বিজনেস করে নাকি? টাকা দেওয়ার জন্য কয়েকটা অর্গানাইজেশন বসে আছে। যাক, আমার কথা ছাড়। তোর কথা বল। মাসিমা কেমন আছে রে?"

"মা নেই।"

"সে কী রে? মাসিমার দেহান্ত হয়ে গেছে? কী এমন বয়েস হয়েছিল? স্ট্রোক নাকি?"

আমি ঘাড় নাড়লাম। শোভাবাজারে আমাদের বাড়িতে এলে অমিত মায়ের হাতে ভাপা ইলিশ খেতে খুব ভালবাসত। ওদের বাড়িতে মাছ খাওয়ার চল ছিল না। কিন্তু বাঙালি সাজার জন্য অমিত জোর করে মাছ খেত। ও বলত, "আরে ব্যাটা, আমি কলকাতা শহরে জন্মেছি। আমি তো জন্মস্থান সূত্রে বাঙালিই। আমার চেয়ে বড় বাঙালি কে আছে? হ্যাঁ বলতে পারিস, আমার মা-বাবা মারোয়াড়ি।" কলেজে তখন বাঙালি আর অবাঙালি ছাত্রদের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ হত। কোনও কোনও সময় সেই ম্যাচ প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে দাঁড়াত। তা সত্ত্বেও অমিত সব সময় আমাদের দলের হয়ে খেলত। এই কারণে অবাঙালি ছাত্রদের অনেকে ওকে 'মছলি কা কাঙালি' বলে খ্যাপাত।

বিজয়া দশমীর দিন প্রতিবার অমিত মা-কে প্রণাম করতে আসত। আমাদের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত। কার্তিক পুজোর দিন এসে বলত, "মাসিমা, প্রসাদ দিন।" পরে জেনেছিলাম, তারাসুন্দরী পার্কের কাছে মল্লিক বাড়ির একটা মেয়ের সঙ্গে ও প্রেম করত। কলেজে পড়ার সময়ই অমিত প্রাণপণ চেষ্টা করত, আমাদের সঙ্গে যথা সম্ভব বাংলা বলার। আজও দেখলাম, ওর সেই অভ্যাসটা আছে। এতক্ষণ পর মাত্র একটাই হিন্দি শব্দ বলে ফেলল, দেহান্ত।

আমি চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছি দেখে হঠাৎ অমিত জিজ্ঞেস করল, "কী রে বললি না, কী করছিস?"

"আমাদের সেই ফ্যাক্টরিটা অ্যাদ্দিন বন্ধ ছিল। আমি খুলছি।"

অমিত হেসে বলল, "আমাদের বাঙালিদের মধ্যে একটা কথা আছে না, সেই তো মল খসালি, তবে কেন নথ ঘোরালি—তোর অবস্থা দেখছি সেই রকম। বিজনেসে নামবি তো, অ্যাদ্দিন কী করছিলি?"

"ফ্যাক্টরিটা নিয়ে প্রবলেম ছিল রে। সেটা প্রায় সলভ্ করে এনেছি।"

"আমার এক রিলেটিভ আছে। পারফিউম বিজনেস করছে। এই ক'দিন আগে বড় একটা কন্ট্রাক্ট পেল একটা ফরাসি কোম্পানি থেকে। ওর মুখেই শুনি, পারফিউম বিজনেসে নাকি তিনশো পার্সেন্ট লাভ?"

"ঠিকই শুনেছিস।"

"তুই যদি চাস, তোর সঙ্গে আমার ওই রিলেটিভের আলাপ করিয়ে দিতে পারি।"

"দরকার হলে বলব।"

কথা বলতে বলতেই পৌঁছে গেলাম চৌরঙ্গি লেনে। অমিত গাড়ি থেকে নেমে বলল, "আয় না। দু'মিনিট বসে যা।"

বললাম, "না রে। আমাকে একবার মেছুয়াবাজারে যেতে হবে। অন্য একদিন ঘুরে যাব।"

"ঠিক আছে, তোর সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল রে শিবা। যোগাযোগ রাখিস। পারলে একদিন টুক করে তোর বাড়িতে ঢুকে পড়ব। মাসে দু'তিন বার তো বড়গাছিয়ায় যাই।"

"আসিস। তুই এলে খুশি হব।"

...মেছুয়াবাজারে যখন পৌঁছলাম, বেলা তখন বারোটা। এত সময় লাগার কথা নয়। এসপ্লানেডে এত জ্যাম, আটকে গেছিলাম। সি ই এস সি বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে। প্রতিবাদ-ধর্নায় বসেছে কিছু লোক। মাইকে বক্তৃতা হচ্ছে। ভদ্রলোক ঠিকই বলছিলেন, মনোপলি বিজনেসের সুযোগ দিলে সাধারণ লোকের দুর্ভোগ হবেই। মঞ্চের সামনে মাত্র গোটা দশেক লোক। আর কারও হুঁশ নেই। যে যার কাজ করছে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মেট্রো সিনেমায় লাইন দিচ্ছে। ফুটপাত জুড়ে ফেরি করছে। পাতাল রেল ধরার জন্য দৌড়চ্ছে। অথচ শুনেছি, এই শহরেই একটা সময় ট্রামভাড়া মাত্র এক পয়সা বেড়েছিল বলে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গেছিল।

আমাকে দেখা মাত্রই মিত্রের দোকানের ছেলেটা বলল, "আপনি এত দেরি করলেন কেন শিবাশিসদা? বড়বাবু এতক্ষণ আপনার জন্য বসে থেকে থেকে এই মাত্তর বেরোল। একটু বসুন, দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরবে।"

কাউন্টারের পাশে রাখা একটা টুলের উপর বসলাম। দোকানে বেশ খদ্দের। পারফিউমের কেমিকেল অনেক কাজে লাগে। পুজোর ধূপ থেকে বাথরুম ক্লিনার পর্যন্ত পাঁচশো ধরনের জিনিস তৈরিতে। ছোট ছোট কয়েক হাজার ফ্যাক্টরি বেঁচে আছে এই কেমিকেলের ওপর। কেমিকেলের নাম শুনেই বুঝতে পারছি, কে কী জন্য কিনছেন। হঠাৎ দেখলাম, আমারই বয়সী এক সুন্দরী মহিলা দোকানে ঢুকে কয়েকটা দামি কেমিকেলের অর্ডার দিলেন। দেখে একটু অবাকই লাগল। জানতাম না, আমাদের এখানে মেয়েরাও আজকাল পারফিউম বিজনেসে নেমেছে।

এ দিকের কাউন্টারে বসে আছেন সুবোধবাবু। দোকানের অনেক দিনের কর্মী। আমাকে চেনেন। ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে আমাকে উনি বললেন, "এই মেয়েটিকে চেনেন শিবাশিসবাবু? আজকাল প্রায়ই আমাদের দোকানে আসছেন। ইনি গন্ধ দিয়ে রোগ সারাচ্ছেন।"

ওহ্, ভদ্রমহিলা তা হলে অ্যারোমাথেরাপিস্ট। শুনেছি, কিছু লোক আছেন যাঁরা এই বিদ্যাটা শিখেছেন। গন্ধের একটা প্রভাব মানুষের দেহ আর মনে স্বাভাবিক ভাবেই পড়ে। কিন্তু তা দিয়ে মানুষের রোগ সারানো যায় বলে আমার মনে হয় না। সিন্থেটিক গন্ধে উল্টো ফল হতে পারে।

সুবোধবাবু বললেন, "উল্টোডাঙার মোড়ে ইনি অ্যারোমাথেরাপির একটা সেন্টার খুলেছেন। ভিজিট কত জানেন? পার সিটিং তিনশো টাকা। রোগ সারানোর জন্য মিনিমাম পাঁচটা সিটিং নিতে হবে। কত লোক কতভাবে রোজগার করছে। আর ফ্রান্স থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেও আপনি কিছু করতে পারলেন না।"

বললাম, "কপাল। তা, ইনি থেরাপি-টা কীভাবে করেন তা জানেন?"

"বিলক্ষণ জানি। ফুটন্ত জলে ইনি গন্ধ মিশিয়ে দেন। রোগ সারানোর জন্য বসে বসে আপনাকে জলের ভাপ নিতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ইনি বিদ্যেটা শিখে এসেছেন।"

হয়তো কথাবার্তা আরও এগোত। এই সময় বড়বাবু এসে পড়লেন। আমাকে বেশ খাতির করেই ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আরে মশাই, আপনি নাকি নতুন একটা পারফিউম বের করে হইচই ফেলে দিয়েছেন?"

কথাটা উনি এমন জোরে বললেন, দোকানের সব খদ্দের ঘুরে আমার দিকে তাকাল। আমার অস্বস্তি হচ্ছে। ওঁর উচ্ছ্বাস চাপা দেওয়ার জন্যই ঠাণ্ডা গলায় বললাম, "তেমন কিছু নয়।"

"আপনি চাপবার চেষ্টা করলে কী হবে মশাই, আমরা সব জানি।"

অ্যারোমাথেরাপিস্ট ভদ্রমহিলা কৌতূহলী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। চোখাচোখি হতেই উনি মুখটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। দেখে মনে মনে হাসলাম। লোক ঠকিয়ে কেউ যদি পয়সা রোজগার করে, আমার তাতে কী আসে-যায়? বড়বাবু উৎসুক মুখে আমার দিকে তাকিয়ে। বললাম, "কী শুনেছেন, আমার পারফিউম নিয়ে?"

"সে দিন আমাদের সিন্ডিকেটের একটা মিটিং ছিল সুরেশ জালানের বাড়িতে। ওখানেই শুনলাম আপনার কথা। আপনি নাকি, ফ্রান্সে কোন এক কম্পিটিশনে পাঠিয়েছেন পারফিউমটা? জালান কথাটা শুনেছে জিবোদান রুরের এক কর্তার কাছে। আচ্ছা, ওর সঙ্গে কি আপনার কোনও ঝামেলা হয়েছে?"

"না তো?"

"কেমন যেন রাগ রাগ ভাব দেখলাম। লোকটা তো সুবিধের নয়। সাবধানে থাকবেন। যাক গে মশাই, প্রাইজ-ট্রাইজ পেলে একটু মনে রাখবেন। আপনারা গুণী মানুষ। আপনাদের সার্টিফিকেটের অনেক দাম।"

বড়বাবু আরও কী সব বলে যাচ্ছেন। আমার কানে সব ঢুকছেও না। ভেবে খারাপ লাগল, মঁসিয়ে বেনোনিল কথাটা চেপে রাখতে পারলেন না? জালানকে বলে দিলেন! প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য বললাম, "আমার কেমিকেলগুলো কি সব গুছিয়ে রেখেছেন?"

"রাখব না মানে? আপনাদের মতো লোক আমার দোকানে আসে, এটাই সৌভাগ্য।"

টাকা-পয়সা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। একটাই লাভ হল আজ। দু'টো রেয়ার কেমিকেল পাওয়া গেল। এ সব কেমিকেল চট করে এরা বের করে না। বড়বাবু এমনই উচ্ছ্বসিত, বলার আগেই ওই কেমিকেল দু'টো গছিয়ে দিলেন। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতে যাব, এমন সময় কে একজন ডাকলেন পিছন থেকে, "মিঃ চৌধুরী, একটু দাঁড়াবেন? দু'একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, সেই ভদ্রমহিলা। গন্ধ দিয়ে যিনি রোগ সারান।

॥ এগারো ॥

মিলিদের বাড়িতে সুস্মিতার ফোনটা এল বেলা চারটের সময়। গলা শুনেই বুঝলাম মারাত্মক কিছু হয়েছে। তবুও স্বাভাবিক গলায় বললাম, "বলো সুস্মিতা, ওদিকের খবর কী?"

সুস্মিতা উত্তেজিত, "আপনি শিগগির চলে আসুন শিবাশিসদা। রমেনদাদের কয়েকজনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।"

"কেন?"

"কারখানার গেটে রমেনদারা যখন পিকেটিং করছিল, তখন আপনার কাকার ভাড়া করা গুণ্ডারা বোমাবাজি করে। সলিল আর রতন নামে দু'টো ছেলে মারাত্মক ইনজিওরড হয়েছে। উফ্ সে কী রক্ত, চিন্তা করতে পারবেন না।"

"ছোটকাকা কি সুজিত ঢোলকিয়াকে নিয়ে কারখানায় এসেছিল?"

"কারখানা পর্যন্ত এসেছিল। কিন্তু গাড়ি থেকে নামেনি। গেটের সামনে লোকজন দেখে সোজা পার্বতীপুর চলে যায়। তার ঘণ্টাখানেক পরই মোটর সাইকেলে এসে চার-পাঁচটা ছেলে রমেনদের বলে গেটের সামনে থেকে সরে যাও। এ নিয়ে তর্কাতর্কি, হাতাহাতি। তারপরই বোমাবাজি। বোমার আওয়াজ শুনে পঞ্চায়েত ভবন থেকে বোধহয় থানায় ফোন করেছিল। পুলিশ আসার আগেই ছেলেগুলো মোটর সাইকেলে করে পালিয়ে যায়।"

"তুমি কি তখন স্পটে ছিলে?"

"ছিলাম। পুলিশ এসে রমেনদাদের সাত-আটজনকে তুলে নিয়ে গেছে। আপনার কাকা বোধহয় এফ আই আর করেছিলেন।"

"ভাড়াটে গুণ্ডাগুলো কারা জানো?"

"রমেনদারা চেনে না। আপনি কি এখনই আসবেন?"

"অবশ্যই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসছি। যে ছেলে দু'টো ইনজিওরড হয়েছে, ওরা কোথায়?"

"স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। কারখানার কাছে বলে আমরাই ওখানে নিয়ে গেছি। সলিল বলে ছেলেটার অবস্থা খুব খারাপ। বোধহয় বাঁচবে না।"

"কোথাকার ছেলে?"

"জগদীশপুরের। ওর বাবা আপনাদের কারখানার এমপ্লয়ি ছিলেন।"

"তুমি কি ফের ডোমজুড় থানায় যাবে?"

"যাব। কেন, রমেনদাকে কি কিছু বলতে হবে?"

"বোলো, ভয়ের কিছু নেই। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি, আসছি। পারলে তুমিও ওখানে থেকো। আর শোনো, আমি যাওয়ার পর তোমার রিপোর্ট পাঠিও। কেমন?"

"ঠিক আছে।"

লাইনটা ছেড়ে দেওয়ার পরই মিলি উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "কী হয়েছে শিবাদা? কে ইনজিওরড হল?"

সংক্ষেপে পুরো ঘটনাটা জানিয়ে বললাম, "আর দেরি করা যাবে না মিলি। আমাকে এখুনি বাড়ি যেতে হবে।"

মিলি বলল, "তার মানে? তুমি এখন ওই গণ্ডগোলের মাঝে যাবে?"

বললাম, "আমি না গেলে পুলিশ রমেনদের ছাড়বে না।"

মিলি দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "কখখনও না। আমি তোমাকে যেতে দেব না। কারখানায় বোমাবাজি হয়েছে। তোমার কী? ছোটকাকার ঝামেলায় তুমি কেন যাবে?"

মিলির গলায় জেদের সুর। কী করে বোঝাই, কারখানা নিয়ে এই যে রমেনরা আন্দোলনে নেমেছে, তা আমারই কথাতে। ওকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বললাম, "মিলি, রমেন আমার ভাইয়ের মতো। তুমি তো নিজের চোখে দেখেছ, মা মারা যাওয়ার পর ওরা আমার জন্য কী করেছে। আজ যদি ওর পাশে গিয়ে না দাঁড়াই, তা হলে কী মনে করবে বলো তো?"

কথাটা শুনে মিলি দমে গেল। তারপর বলল, "ঠিক আছে। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল মিলি। আমরা দু'জন বেরিয়ে এলাম। কারখানার গেটে যে একটা সংঘর্ষ হবে, তা আমি আগেই জানতাম। কিন্তু কেউ মারাত্মক চোট পেয়ে মারা যাবে, ভাবতেও পারছি না। সেকেন্ড হাওড়া ব্রিজের দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে আমি মনে মনে যোগ-বিয়োগ করতে লাগলাম। পুরো ঘটনাটা ঠিক কী ঘটেছিল, তা রমেনের মুখ থেকে না শোনা পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারছি না। তবে আমার মন বলতে লাগল, যা ঘটেছে, তা আমার ভালর জন্যই।

সলিল বলে ছেলেটা যদি সত্যিই মারা যায়, তা হলে ডোমজুড়-মাকড়দায় বড় ধরনের হইচই হবে। সব দোষ গিয়ে পড়বে ছোটকাকার উপর। কারখানার মালিক গুণ্ডা লাগিয়ে আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা করেছে, এটা বড় অপরাধ। ডোমজুড়ে রাস্তা-ঘাটে বেরোনো কঠিন হয়ে যাবে ছোটকাকার। এই দুর্ঘটনার পর সুজিত ঢোলকিয়াও কি আর সাহস পাবে কারখানা কেনার? কাল খবরের কাগজে হাঙ্গামার খবর ছাপা হলে প্রশাসনও ছোটকাকাকে মদত দেওয়ার আগে তিনবার ভাববে।

সুস্মিতা বলল বটে, পুলিশ রমেনদের অ্যারেস্ট করেছে। আমার কিন্তু তা মনে হয়

না। সম্ভবত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে গেছে। রমেন খুবই পরিচিত ছেলে। নানা কারণে প্রায়ই ডোমজুড় থানায় যায়। থানার সেপাই থেকে ওসি পর্যন্ত সবাই ওকে চেনে। ওকে গ্রেফতার করলে প্রতিক্রিয়া খারাপ হতে পারে। থানার সামনে বিক্ষোভ হয়ে যাবে। সব থেকে বড় কথা, যে কারণে রমেনরা আন্দোলনে নেমেছে, অর্থাৎ কিনা পরিবেশ দূষণ, তার পিছনে জন সমর্থন আছে।

আজ যখন মিলিদের বাড়ি পৌঁছই, বেলা তখন একটা। নরেন দেব পার্কের গায়ে গাড়িটা রেখে মিলিদের বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই দেখি, মিলি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। আমাকে বলল, "উফ শিবাদা, তুমি তো আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে। ডোমজুড়ে ফোন করেছিলাম। মিত্তিরকাকা বললেন, তুমি নাকি সকাল সকাল বেরিয়ে এসেছ?"

"জ্যামে ফেঁসে গেছিলাম মিলি।"

"তাই বলো।"

প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে মিলিদের বাড়িতে ঢুকলাম। প্রায় আশি বছর আগেকার বাড়ি। দেখে বোঝার উপায় নেই। এমন ঝকঝকে, তকতকে। মিলির বাবা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। একতলায় চেম্বার। এখন অবশ্য কোর্টে যান না। নতুন একটা ঝোঁক হয়েছে মেসোমশাইয়ের। জ্যোতিষচর্চা। হাতিবাগানের টোল থেকে আজকাল অনেকেই আসেন সন্ধের দিকে। চেম্বারে বসে সবাই মিলে জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন। ক্রিসমাসের দিন মাকে নিয়ে মিলিদের বাড়িতে গেছিলাম। কথায় কথায় সেদিন মেসোমশাই বলেছিলেন, "শিবাশিস, সাবধানে থেকো বাবা। তোমার প্রিয়জন বিয়োগের সম্ভাবনা আছে।"

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করি না বলে তখন মেসোমশাইয়ের কথায় গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীটা সত্যি হয়ে দাঁড়াল। আজ মিলিদের বাড়িতে যাওয়ার আগেই ঠিক করে নিয়েছিলাম, মেসোমশাইয়ের সঙ্গে বসব। জানার চেষ্টা করব, এতদিন ধরে পারফিউম বিজনেসে নামার উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও কেন ফল পাচ্ছি না?

মিলি আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল। তারপর বলেছিল, "আজ কিন্তু তোমাকে চট করে ছাড়ছি না। তোমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে।"

সত্যি বলতে কী, মিলি না বললেও আমাকে আজ থাকতে হত। অন্তত রমেনদের ফোন পাওয়া পর্যন্ত। তবুও বলেছিলাম, "বিকেলের দিকে একটা কাজ আছে। সেটা করেই দৌড়তে হবে ডোমজুড়ে। বাড়ির আর সবাই কোথায় মিলি? মাসিমারা কেউ নেই?"

"আছে ডাকব? আমার সঙ্গে অবশ্য মা কথা বন্ধ করে দিয়েছে প্রায় মাস দু'য়েক।"

"কেন?"

"সে অনেক কথা। পরে শুনো। বাবাকে আগে ডেকে দিচ্ছি। তোমার কথা কয়েকদিন ধরে বলছে। তুমি একটু বোসো।"

আমাকে বসিয়ে রেখে মিলি উপরে উঠে গেছিল। মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে নিয়েছিলাম, প্রচণ্ড অশান্তির মধ্যে রয়েছে মিলি। সম্ভবত, বিয়েতে অমত করাটাই

অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝে একদিন অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অমতের কারণটা কী? মিলি সাফ বলে দিয়েছিল, ছেলেটা একটু উদ্ধত টাইপের। তাই পছন্দ নয়। এরপর আর কোনও পীড়াপীড়ি করা চলে না। তাই চুপ করে গেছিলাম। মিলি স্বাবলম্বী এবং যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। ওর ওপর জোর খাটানোও মাসিমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মেসোমশাই নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, শীগগির ওর বিদেশ যাত্রা আছে। সেটা শোনার পর ও ফ্রান্সে চাকরির চেষ্টা করে যাচ্ছে।

"শিবাশিস, কেমন আছ বাবা?"

প্রশ্নটা শুনে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি, মেসোমশাই। সোফা থেকে উঠে প্রণাম করে বললাম, "ভাল।"

"সাবধানে থেকো বাবা।" বলে উল্টো দিকের সোফায় বসলেন মেসোমশাই। তারপর বললেন, "কালাশৌচের একটা বছর সাবধানে থাকতে হয়। দিন কয়েক ধরে তোমার কথা মিলিকে আমি বলছিলাম খুব।"

"কেন মেসোমশাই?"

"তোমার মা মারা যাওয়ার পর তোমার কোষ্ঠীটা হঠাৎই একদিন হাতের সামনে পেয়ে গেলাম। তা, বিচার করে দেখলাম, তোমার খুব ভাল সময় আসছে বাবা। তুমি কি বিজনেস ভেঞ্চারে নামছ?"

"হ্যাঁ মেসোমশাই।"

"নেমো পড়ো। সাতাশে এপ্রিলের পর থেকে দেখবে হাতের কাছে অনেক বড় বড় সুযোগ এসে যাচ্ছে। বিজনেসে তুমি খুব সাকসেসফুল হবে। কেমিকেল নিয়ে কাজ করতে হয়, এমন কোনও বিজনেস কোরো। পারলে এর মধ্যে একটা সত্তর সেন্টের ডায়মন্ড পরে নিও। কাজে লাগবে।"

"আমি পারফিউম বিজনেসে নামছি মেসোমশাই। কাজটা মূলত কেমিকেল নিয়েই।"

"দেখো, কপালের লিখন খণ্ডাবে কে? এই বিজনেসে তোমাকে সাহায্য করবে একজন বিধর্মী। আরও বলে দিচ্ছি, তার গায়ের রঙ হবে সাদা। তোমার শত্রুও হবে প্রচুর। কিন্তু তারা তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। তোমার বিজনেসের সঙ্গে বিদেশের একটা সম্পর্ক থাকবে বাবা। তুমি এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট করতে পারো।"

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। যা বলছেন, তা হওয়া সম্ভব। বিধর্মী মানে, মঁসিয়ে বেনোনিল। কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম, "কোষ্ঠী বিচার করে আর কিছু চোখে পড়ল মেসোমশাই?"

"হ্যাঁ। সব আমি লিখে রেখেছি। আজ যাওয়ার সময় নিয়ে যেও। তোমার সঙ্গে যার বিয়ে হবে, সেই মেয়েকে লোকে একডাকে চিনবে। সে হবে দীর্ঘাঙ্গী, অসাধারণ সুন্দরী এবং প্রতিভাময়ী।"

মেসোমশাইয়ের কথা শুনতে শুনতেই হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়েছিলাম। দেখি, মিলি দাঁড়িয়ে। কথাগুলো ওর কানেও গেছিল। মনে হল, ওর মুখ থেকে কে যেন রক্ত শুষে নিয়েছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে দুপুরের ঘটনাগুলো ভাবছি। এত আগ্রহ নিয়ে মিলি ওদের বাড়িতে আমাকে ডাকল, অথচ জরুরি কোনও কথাই বলল না। খাওয়া-দাওয়ার পর যা কথা হল, সবই সুব্রতদাকে নিয়ে। বাড়ির সঙ্গেও আজকাল খুব একটা যোগাযোগ নেই সুব্রতদার। কেয়াদির ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিল, তা বাড়িতেও জানায়নি। মিলি বলল, "লজ্জায় আমি আর কেয়াদিদের বাড়িতে ফোন করি না। দাদাকে তো চিনি, যাকে নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে, তাকে ছাড়তে বেশিদিন সময় নেয় না।"

কোনা এক্সপ্রেস হাইওয়ের ক্রসিংয়ে পৌঁছে দেখলাম, বোম্বে রোডে জ্যামজট। নিশ্চয়ই কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। অথবা উল্টে গেছে অয়েল ট্যাঙ্কার। বোম্বে রোডে এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা রাস্তা। অথচ কোথাও একবার আটকে গেলে আর বেরোবার উপায় নেই। বাড়ি ফিরতে ক'ঘণ্টা লাগবে কে জানে? শীতের বিকেল। তাড়াতাড়ি সূর্য ডুবে যাবে। সুস্মিতারা নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করছে থানায়। সন্ধের মধ্যে পৌঁছতে না পারলে ওরা আমাকে ভুল বুঝতে পারে।

মিলি এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। তাকিয়ে দেখি, বাঁ পাশে দাঁড়ানো একটা মারুতির দিকে উঁকি মেরে কী যেন দেখছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ও হেসে ফেলল। জিজ্ঞেস করলাম, "হাসছ কেন?"

"উঁকি মেরে দেখো। তা হলেই বুঝতে পারবে, গাড়িতে কী চলছে।"

কৌতূহলী হয়ে বাঁদিকে সরে এলাম। আমার কাঁধ মিলির বুক ছুঁয়ে গেল। পাশের গাড়ি থেকে মিউজিকের আওয়াজ ভেসে আসছে। জানলার কাচ অর্ধেক তোলা। ফাঁক দিয়ে দেখলাম, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটা ছেলে বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছে। আর ডান হাতের আঙুল দিয়ে সঙ্গিনীর ঠোঁট স্পর্শ করে যাচ্ছে। মেয়েটা আঙুল সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু ছেলেটা নাছোড়বান্দা। দৃশ্যটা দেখে সরে এলাম। তারপর বললাম, "নিউলি ম্যারেড?"

মিলি বলল, "কী করে বুঝলে?"

"দেখো, গাড়ির পিছনে লেখা আছে, জাস্ট ম্যারেড।"

"বাপ রে। এর মধ্যেই তুমি দেখে ফেললে?"

"এদিকে কাছাকাছি কোথাও একটা রিসর্ট আছে। বড়লোকদের রিসর্ট। হাজার পঞ্চাশেক টাকা দিয়ে মেম্বার হতে হয়। বোধহয় সেখানেই এরা যাচ্ছে।"

বাঁদিকের মারুতিটা এই সময় হুশ করে এগিয়ে গেল। পিছনে সরকারী বাসের অধৈর্য হর্ন শুনে, সামনে তাকিয়ে দেখি জ্যামজট খুলে গেছে। ডানদিকে টার্ন নিয়ে বোম্বে রোডে পড়লাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে ডোমজুড়ে পৌঁছতে হবে। দুটো জিনিস জানতে হবে। যে ছেলেগুলো বোমাবাজি করে গেল, তাদের কেউ চেনে কি না? আর, ছোটকাকা ঠিক এই মুহূর্তে কোথায় আছে। এবং কী ভাবছে।

আধঘণ্টার মধ্যেই মাকড়দার বাজারে পৌঁছে গেলাম। পার্বতীপুর যেতে হলে গন্ধপুরের পাশ দিয়েই যেতে হয়। ফ্যাক্টরিটাও চোখে পড়ে। দেখলাম, লোহার বড় গেটটার পাশে তেরপলের সামিয়ানা খাটিয়ে কয়েকটা লোক বসে আছে। গেটে নানা

ধরনের [illegible] কারখানা চালু করতে হবে’, ‘বিক্রি করা চলবে না’, ‘পরিবেশ দূষণ বন্ধ করো’ — গোছের লেখা। এক নজরেই কয়েকটা পোস্টার পড়ে ফেললাম। ঘণ্টা কয়েক আগে গেটের কাছে যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে। তার চিহ্নমাত্র চোখে পড়ল না। একটু এগিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে অবশ্য দেখলাম, পুলিশের একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে।

বাঁদিকে ডোমজুড় থানা। না, সেখানেও কোনও লোকজন নেই। কাউকে দেখতে না পেয়ে গাড়ি থেকে আর নামলাম না। অন্যদিন বাস স্ট্যান্ডের কাছে মানুষজন গিজগিজ করে। দোকানপাটের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আজ সব হুড নামানো। গণ্ডগোলের আশঙ্কায় বোধহয় হাওড়া-আমতা রোড ফাঁকা। অন্য দিন থানা থেকে পার্বতীপুরে আসতে লাগে মিনিট পনেরো। আজ দশ মিনিটের মধ্যেই বাড়িতে পৌঁছে গেলাম।

মিত্তিরকাকা বোধহয় আমার অপেক্ষাতেই ড্রয়িংরুমে বসে ছিলেন। গাড়ির শব্দে বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, “তোমার দেরি দেখে এই মাত্র কোচাইকে ডোমজুড়ে পাঠালাম বাবা। এদিককার সব খবর শুনেছ?”

“খানিকটা। সুস্মিতা ফোন করেছিল।”

“ছেলেটা তো মারা গেছে। লোকজন প্রচণ্ড খেপে আছে তোমার ছোটকাকার ওপর। বিকেলের দিকে রমাপ্রসাদবাবুকে ডেকে পাঠালাম। উনি এসে ঠাণ্ডা করলেন রমেনদের।”

“ছোটকাকার কী অবস্থা?”

“শুনলাম তো বাড়িতেই আছেন। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন। বিকেল থেকে এ নিয়ে বারতিনেক ফোন করেছেন তোমার ছোটকাকিমা। আমি বলে দিয়েছি, শোভাবাজার থেকে তুমি আজ ফিরবে না।”

“ছোটকাকা বোমাবাজিটা করাতে গেল কেন মিত্তিরকাকা?”

“চিরদিন গুণ্ডাদের সাহায্য নিয়েছে। রতন হাঁসদা বলে একজনকে উনি আগে পুষতেন এই সব খারাপ কাজগুলো করানোর জন্য। পাপ কখনও বাপকেও ছাড়ে না বাবা। রমেন নাকি কোচাইকে বলেছে, কাল বিকেলে ছেলেটার ডেড বডি নিয়ে মিছিল করবে। তোমায় বলে দিচ্ছি, এই অশান্তি চলবে। থামবে না।”

“যে ছেলেগুলো বোমাবাজি করে গেছে রমেনরা তাদের চিনতে পারল না?”

“চিনবে কী করে। মুখে রুমাল বেঁধে ছেলেগুলো মোটর সাইকেল করে এসে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই কাজ সেরে চলে গেছে। পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল। রমেনরা কারও নাম বলতে পারেনি। আমার মনে হয় এই অঞ্চলের ছেলে না।”

“একটা নিরীহ ছেলের প্রাণ চলে গেল, অথচ কারও শাস্তি হবে না মিত্তিরকাকা?”

“এ দেশে তো এটাই নিয়ম, বাবা।” বলে পা বাড়ালেন উনি। তারপর কী ভেবে বললেন, “কোচাই তোমার কাছে আসতে পারে। ওর কাছ থেকে লেটেস্ট খবর তুমি পেয়ে যাবে।”

মিত্তিরকাকা চলে গেলেন। রোয়াকে দাঁড়িয়ে এবার আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যা জানার ছিল, মিত্তিরকাকা বলে গেলেন। কোচাই না এলেও কিছু

আসবে-যাবে না। একটা পা আমি ঠিকভাবে ফেলেছি। দেখি, বাকিগুলো ঠিক পড়ে কি না। শোভারাজারের বাড়ি থেকে বেরোনোর পর এই প্রথম আমি হালকা বোধ করলাম। বাগান থেকে সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছে। বুক ভরে সেটা নিলাম।

ভেতরে ঢুকতেই দেখি, মিনু পিসির সঙ্গে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে গল্প করছে মিলি। ঘোলের সরবত তৈরি হচ্ছে। এটা মিনু পিসির নিয়ম। বাইরে থেকে এলে সরবত করে দেওয়া। আমের দিনে আম। অথবা লেবু। অন্য সময় ঠাণ্ডা দইয়ের সরবত। মিলির হাতে ট্রে তুলে দিল মিনু পিসি। তা দেখে বললাম, "উপরে উঠে এসো। আজ আমার ফর্মুলায়, মিলি তোমাকে এক আশ্চর্য সরবত খাওয়াব।" মনটা এত খুশি যে, মিলিকেও আমি আজ গন্ধের জগতের একটা অপূর্ব স্বাদ দেব।

সরবতের সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম কেওড়া আর গোলাপ জল। তারপর বললাম, "নাও, চুমুক দিয়ে দেখো।" চুমুক দিয়ে মিলি 'আহ্' করে উঠল। দুজনে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে গল্প শুরু করলাম জ্যোৎস্নার আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে নীচের লন। আমাদের বিরক্ত করার কেউ নেই। পুরো পার্বতীপুর গ্রাম এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। মিলি বাড়ির কথা বলছে। আমার কথা জানতে চাইছে। একেকটা সময় আসে, যখন কথা বলতে ভাল লাগে। কথা শেষ হতে চায় না। এই প্রথম আমরা সেই সময়টা পেলাম।

রাতে খাওয়ার পর টিভি-তে যখন কারগিলের খবর শুনছি, তখনই ফোনটা এল। গলা চিনতে পেরে বললাম, "সব ঠিক আছে তো রে?"

"হ্যাঁ শিবা।"

"তোরা এখন কোথায়?"

"ঠিক জায়গাতে আছি।"

"ছেলেটা মরল কেন?"

"উপায় ছিল না। এত সাহস, চেজ করতে এসেছিল।"

"বাকি কাজটা কখন করবি?"

"এই বেরোচ্ছি।"

"দেখিস। সাবধান। কাজটা করে দফরপুর হয়ে চলে যাস।"

"চিন্তা করো না। কালুয়ার কাছে এ সব জলভাত। বাকি টাকাটা কখন দেবে?"

"কাল বিকালে নিয়ে যাস।"

ফোনটা রেখে, টিভি বন্ধ করে আমি শুতে চলে গেলাম। নিশ্চিন্তে।

॥ বারো ॥

সকালে কয়েকটা কাগজ তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কোথাও গন্ধপুরের কারখানায় বোমাবাজির খবরটা পেলাম না। খবরটা কি তা হলে সুস্মিতা পাঠায়নি? তা কী করে হবে? আমাকে বলেছিল, পাঠাবে। তা হলে কেন বেরোল না? ভাবলাম, ফোন করে সুস্মিতাকে একবার জিজ্ঞেস করি। নম্বরটা খোঁজার ফাঁকেই ফোন বেজে উঠল। ও

প্রান্ত থেকে রমেন জিজ্ঞেস করল, "কাল কোথায় ছিলেন, শিবাশিসদা? রাত আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আপনার জন্য। আপনি এলেন না।"

জানতাম, রমেন ফোন করবে। উত্তরটা তাই মনে মনে সাজিয়ে রেখেছিলাম। বললাম, "থানায় গেছিলাম। তোমাদের কাউকে না পেয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। তারপর মিত্তিরকাকা আর বেরোতে দিলেন না।"

"সলিলের ডেড বডি নিয়ে আজ মিছিল করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পুলিশ তা চাইছে না। মজার ব্যাপার কী জানেন, সুজিত ঢোলকিয়া আজ সকালে আমার বাড়িতে লখা বলে এক মাস্তানকে পাঠিয়েছিল। না, ভয় দেখানোর জন্য নয়। আমাদের লাইব্রেরিতে এক লাখ টাকার বই দিতে চায়। এর বদলে আমাদের শুধু আন্দোলন তুলে নিতে হবে। ব্যস।"

"তুমি কী বললে?"

"ছেলেটাকে বের করে দিলাম।"

"ছোটকাকার খবর কিছু শুনেছ?"

"না। কী খবর?"

"কাল রাতে ছোটকাকার এ বাড়িতে বোমাবাজি হয়েছে। শব্দ শুনে আমি ভেবেছিলাম রেল লাইনের দিকে বোধহয় কোথাও ডাকাতি-ফাকাতি হচ্ছে। আজ সকালে মিলন সংঘের ছেলেরা এসে সব বলে গেল।"

"কারা এ কাজ করতে পারে শিবাশিসদা?" রমেনের গলা শুকিয়ে গেছে, "দোষটা আবার আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে না তো?"

"কী জানি? আমাদের এখানে তো রটেছে অন্য রকম। কারখানায় যে ছেলেগুলোকে ছোটকাকা মাস্তানি করতে পাঠিয়েছিল, তারাই নাকি টাকা-পয়সা না পেয়ে ঝাল ঝেড়ে গেছে। আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। শুনলাম, ছোটকাকা কাল রাত থেকেই প্রচণ্ড অসুস্থ। এমনিতেই প্রসট্রেটের প্রবলেম ছিল। সেটা নাকি এখন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে।"

রমেন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "কাম হোয়াট মে, আমরা কিন্তু কারখানার গেটে ধর্না চালিয়ে যাব।"

"আজ সন্ধেবেলার দিকে একবার আসবে রমেন?"

"নিশ্চয়ই যাব।"

"ছাড়ছি তা হলে?"

"ও কে।"

রমেনের ফোনটা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এল সুপ্রতিমবাবুর ফোন। গণ্ডগোলের খবর উনি সবই শুনেছেন। আমাকে সাবধান করে দিলেন, কোনও ঝামেলার মধ্যে যেন জড়িয়ে না পড়ি। সারাটা সকাল কেটে গেল আমার ফোন ধরতে। এর মধ্যে একটা ফোন আবার সেই অ্যারোমাথেরাপিস্ট শম্পা চ্যাটার্জির। মিত্রের দোকান থেকে সেদিন বেরোনোর পর যিনি আমাকে ধরেছিলেন। উল্টোডাঙায় ওর অ্যারোমা কিউর সেন্টারে আমাকে একবার নিয়ে যেতে চান। ভদ্রমহিলা এমন পীড়াপীড়ি শুরু করলেন

যে আমি একটু কড়া গলাতেই বললাম, "আমি একটু ব্যস্ত আছি। আপনি পরে ফোন করুন।"

সকালের জলখাবার নিয়ে এসে মিলি বলল, "কাকে ধমকালে শিবাশিসদা? তুমি তো কখনও মেজাজ খারাপ করো না।"

সকালে এর মধ্যেই মিলি স্নান সেরে নিয়েছে। বেশ সুন্দর লাগছে ওকে। উল্টো দিকের সোফায় ও বসল। পরনে নীল রঙের সিন্থেটিক শাড়ি। ম্যাচ করা ব্লাউজ। এই সাত সকালে ও আমাকে ব্রেকফাস্ট করাচ্ছে, এই দৃশ্যটা দেখলে মা খুব খুশি হত। চট করে কথাটা মনে হয়েই মিলিয়ে গেল। ওকে বললাম, "আর বোলো না। শম্পা চ্যাটার্জি নামে এক মহিলা। গন্ধ দিয়ে রোগ সারান। ওর ওখানে গিয়ে আমাকে অ্যাডভাইস দিতে হবে।"

"তোমার সারাদিনের প্রোগ্রামটা কী বলো তো?"

"তেমন কিছু নেই। কেন?"

"তোমার সঙ্গে একবার আজ ভুলেশ্বরের মন্দিরে যাব। তুমি চট করে স্নান সেরে নাও। আমি শুভ্রাদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।"

...রোজ চান করতে ঢোকার আগে সারা শরীর ম্যাসাজ করার অভ্যেস আমার অনেকদিনের। গত দু'তিন দিন এত ব্যস্ত ছিলাম, করা হয়নি। মা মারা যাওয়ার পর থেকে রোজকার রুটিনগুলো ব্যাহত হচ্ছে। গত সাতদিন আমি ল্যাবরেটরিতে পর্যন্ত ঢুকিনি। আমার মতো মানুষ কেমিকেল নিয়ে নাড়াচড়া করেনি, ভাবা যায়। আসলে কারখানার কথা মাথায় ঢোকার পর থেকেই মনটা অন্য দিকে চলে গেছে। যে করেই হোক, কারখানাটা আমার চাই।

রমাপ্রসাদবাবু সেদিন একটা ভাল কথা বলেছিলেন। অভিজ্ঞ মানুষ। কথাটা তাই আমার কোষে কোষে ঢুকে গেছে। গন্ধপুরের কারখানা নিয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ উনি বললেন, "আসল হল মন। মনটাকে ঠিক করো বাবা। ইংরাজিতে মাইন্ড কথাটার মানে বিরাট। এম আই এন ডি। এম মানে মোটিভ। কী করতে চাও, সেটা ঠিক করো বাবা। আই অর্থাৎ ইনিশিয়েটিভ। আরও পরিষ্কার করে বললে উদ্যোগ বা উদ্যম। যা তুমি করতে চাও, তার জন্য উদ্যম নিয়ে নেমে পড়ো। এরপর হল এন। মানে নিড। অর্থাৎ প্রয়োজন। যে কারণে উদ্যমটা নিচ্ছ, তার প্রয়োজন আছে কি না। শেষ অক্ষরটা ডি। অর্থাৎ ডেডিকেশন। আন্তরিকভাবে লক্ষ্যে স্থির থাকতে পারলে তোমার উদ্দেশ্য সফল হতে বাধ্য।"

রমাপ্রসাদবাবুর কথাগুলোই আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্যে আমাকে সফল হতেই হবে। মিলির বাবা কাল বললেন, ব্যবসায় নামলে সফল হব। জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমার প্রবল বিশ্বাস নেই। আবার অবিশ্বাসও করি না। মেসোমশাই জানলেন কী করে আমি ব্যবসায় নামার উদ্যোগ নিচ্ছি। তা হলে কি, সবই পূর্বলিখন। যা ঘটবে, তা নির্দিষ্ট করা থাকে? হয়তো তাই।

স্নান করতে করতে এ সব কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ দরজায় নক করার শব্দ। কোচাইয়ের গলা শুনতে পেলাম, "শিবাদা, ও বাড়ির দিদার ফোন। বলছে, খুব জরুরি

দরকার।"

বাথরুমের দরজা খুলে হাত বানিয়ে কর্ডলেস ফোনটা নিতেই বুঝলাম, ছোটকাকিমা। "শিবা, তুই একবার এ বাড়িতে আসবি বাবা?"

কাকিমার গলা ভাঙা ভাঙা। শুনে খুব খারাপ লাগল। বললাম, "কী হয়েছে, ছোটকাকিমা?"

"আমার তো সর্বনাশ হতে যাচ্ছে রে। কাল রাত থেকে ছোটকাকার খুব বাড়াবাড়ি। বোধহয় বাঁচবেন না। তোর সঙ্গে উনি একবার কথা বলতে চাইছেন।"

"আমি এখুনি আসছি ছোটকাকিমা।"

"আয়। বেশি দেরি করিস না।"

সুইচ অফ করে তাড়াতাড়ি গা হাত-পা মুছে বেরিয়ে এলাম বাথরুম থেকে। কাল রাতে মিত্তিরকাকা ও বাড়িতে যেতে মানা করেছিলেন। কিন্তু না গিয়ে এখন উপায় নেই। ছোটকাকা যদি কোনও চালাকির চেষ্টা করে, তো কেটে আসা যাবে। ঘরে এসে দেখি, মিলি দাঁড়িয়ে গল্প করছে কোচাইয়ের সঙ্গে। আমাকে দেখে বলল, "পাজামা-পাঞ্জাবি বের করে দিয়েছি। পরে নাও।"

কোচাই বলল, "শিবাদা, ছোটদাদুকে বোধহয় নার্সিং হোমে নিয়ে যাবে। আসার সময় দেখলাম, মিলন সংঘের দেবুদা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে পাঠিয়েছে।"

কোচাইয়ের কথা শুনে এ বার বিশ্বাস হল, ছোটকাকিমা আমাকে মিথ্যে বলেনি। প্রসটেটের প্রবলেমের কথা ছোটকাকা এ বাড়িতে সেদিন বলেছিল। টেনশনে সেটা বোধহয় বেড়েছে। তাড়াতাড়ি পাজামা-পাঞ্জাবি গলিয়ে নিয়ে মিলিকে বললাম, "ও বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসি।"

মিলি বলল, "কখখনও তুমি যাবে না। আর তুমি যদি যাও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

আমার কোনও আপত্তি নেই। বললাম, "চলো তা হলে।"

তিনজনে মিলে নীচে নেমে এলাম। ছোটকাকার বাড়ি তিন মিনিটের পথ। হেঁটেই যাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও, গ্যারাজ থেকে বাইকটা বের করে আনলাম। ছোটকাকার সঙ্গে কথা বলে এ দিকে আর আসব না। মিলিকে নিয়ে সোজা চলে যাব ভুলেশ্বরের মন্দিরে। অনাত্মীয় কোনও মেয়েকে নিয়ে ছোটকাকার বাড়িতে যাব, এটা একমাস আগেও চিন্তা করতে পারতাম না। কিন্তু ছোটকাকাকে আমি চটাতে চাই। দেখাতে চাই, ওঁর পছন্দ-অপছন্দ আমি পরোয়া করি না।

ছোটকাকার বাড়িটা আমাদের চেয়ে অনেক বড়। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ঢোকার মুখেই দেখলাম, দেয়ালে বারুদের ছাপ। কাল রাতে বোমাবাজির নমুনা। কিছু অংশ ভেঙে গেছে। কালুয়ারা কাজটা খুব মনোযোগ দিয়ে করে গেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিলেন হাজরা নার্সিং হোমের ডাক্তার কাকা। মুখোমুখি হতেই বললেন, "ভালই হয়েছে তুমি এসে গেছ শিবা। তোমার কাকাকে এখুনি কলকাতায় নিয়ে যাওয়া দরকার। আমি সব লিখে দিয়েছি। দেরি কোরো না।"

"কী হয়েছে ছোটকাকার?"

"কাল দুপুর থেকে ইউরিন বন্ধ হয়ে গেছে। এখুনি ক্যাথিটার দিয়ে বের করে দিলাম। অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না। ইউরিনের সঙ্গে প্রচুর ব্লাড বেরিয়ে এল। আজই কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভাল একজন ইউরোলজিস্টের সঙ্গে তুমি কনসাল্ট করো।"

চিন্তিত মুখে ডাক্তারকাকা বেরিয়ে গেলেন। প্রায় বারো বছর বাদে আমি ছোটকাকার বাড়িতে পা দিলাম। শেষবার এসেছিলাম, ছোটকাকার পঁচিশতম বিবাহবার্ষিকীতে। ধুমধাম করে লোক খাইয়েছিলেন। মনে আছে, সেদিন কী একটা ব্যাপারে বাবার সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়েছিল ছোটকাকার। বাবা আর মা না খেয়ে বেরিয়ে গেছিল। বাবা বাড়ি ফিরে গুম হয়ে বসেছিল অনেকক্ষণ। মা খুব কান্নাকাটি করে। ঝগড়াটা কী কারণে হয়েছিল, তখন আমি বুঝিনি।

মিলিকে নিয়ে দোতলায় ছোটকাকার ঘরে পা দিতেই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছে ছোটকাকা। অমন একটা দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী লোক কী অসহায় অবস্থায়! কাছে যেতেই কাকা বেশ কষ্ট করে বলল, "সব নিশ্চয়ই শুনেছিস। আমার দিন বোধহয় শেষ হয়ে এল।"

এমন কাঁপা কাঁপা গলায় কথাগুলো ছোটকাকা বলল, শুনে বুকটা আমার মুচড়ে উঠল। ছোটকাকা তো জানে না, বোমাবাজির পিছনে কে? জানলে আমাকে আজ ডাকত না।

"জীবনে অনেক পাপ করেছি রে শিবা। তাই বোধহয় ভগবান আমাকে এমন শাস্তি দিলেন। আমার কী হয়েছে, ওরা আমাকে না বললেও, আমি জানি। ইটস নাউ ম্যাটার অফ টাইম।"

কাকা আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরেছে। আমি বিছানায় বসে বললাম, "চিন্তা কোরো না। তুমি ভাল হয়ে যাবে।"

"না রে, আমি ভাল হতে চাই না। শোন, তোকে যেজন্য আমি ডেকেছি। কারখানাটা তুই নিয়ে নে। সুজিত ঢোলকিয়ার কাছ থেকে আমি যে টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছিলাম, সেটা ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। কারখানাটাকে তুই বাঁচিয়ে রাখিস শিবা।"

"কিন্তু কারখানা কী অবস্থায় আছে, আমি তো কিছুই জানি না ছোটকা।"

"হাইকোর্টের চার নম্বর বার লাইব্রেরিতে একজন অ্যাডভোকেট আছেন। নাম জয়ন্তনারায়ণ চ্যাটার্জি। ওর সঙ্গে গিয়ে কথা বল। সব জানে। তোকে সব জলের মতো বুঝিয়ে দেবে। লায়াবিলিটিজ এমন কিছু নেই। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিলে ফের তুই দাঁড় করাতে পারবি। জয়ন্তনারায়ণকে বলবি, কাগজপত্র রেডি করে যেন দু'দিনের মধ্যেই আমার কাছে নিয়ে আসে। সব লিখে দিয়ে আমি বোম্বাইয়ের টাটা হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হব। জানি না, আর ফিরে আসব কি না।"

"তোমার এজেন্সিটার কী অবস্থা ছোটকা?"

"গুটিয়ে এনেছিলাম। আমার ছেলেপিলে নেই। কে দেখবে, বল? তুই যদি চালাতে পারিস, চালাস। আমি যাদের এজেন্ট, হল্যান্ডের সেই কোম্পানিটা খুব বড়। ডালহৌসিতে স্টিফেন হাউসে আমার একটা অফিস আছে। ওখানে সুবোধ বলে

boiRboi.net

একটা ছেলে এখন এজেন্সিটা চালায়। কাগজপত্র রেডি করে আনিস। অফিস ঘরটা তোকে আমি লিখে দেব। সুবোধ ছেলেটা ভাল না। প্রথমেই ওকে তাড়াস। লোভ, বেশি লোভ করতে গিয়ে আমার এই অবস্থা। তোকে সব ফিরিয়ে দিয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করব।"

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ছোটকাকার। চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে আসছে। বললাম, "তুমি ভাল হয়ে যাবে। চিন্তা কোরো না।"

"না রে। আমি ভাল হব না। একটা অনুরোধ রাখবি শিবা? আমার কিছু হলে, তোর কাকিমাকে দেখিস। কাকিমার ভাইগুলো কেউ ভাল না। সব লুটে পুটে নেবে।"

তলপেটে বোধহয় বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে ছোটকাকার। মাঝে মাঝে দাঁত চেপে সেই যন্ত্রণা সহ্য করছে। কী ভেবে এই বাড়িতে ঢুকেছিলাম, আর এসে কী দেখছি। কাল দুপুরে ঢোলকিয়াকে সঙ্গে নিয়ে কাকা যখন কারখানায় আসে, তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিল আজ নার্সিং হোমে যেতে হবে? আমিও কি ভাবতে পেরেছিলাম, কাকার বিরুদ্ধে জমানো এতদিনের রাগ মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে বদলে যাবে করুণায়? আমার সামনে ভেঙে দুমড়ে যাওয়া একটা মানুষ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে এখন সারা জীবনের পাপ-পুণ্যের হিসেব করছে। এই মানুষটাকে ক্ষমা না করাটাই অন্যায়।

ছোটকাকা হঠাৎ চোখটা বন্ধ করল। বোধহয় কথা বলার ক্ষমতা নেই। বিছানা ছেড়ে উঠে এলাম। মিলির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ফিসফিস করে ও বলল, "শিবাদা, তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও। এই কর্তব্যটা তোমার করা উচিত।"

উচিত শব্দটা আমার ইচ্ছেটাকে উসকে দিল। ছোটকাকিমার খোঁজে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলাম। মিলির বয়সী একটা মেয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। চিনতে পারলাম না। আর কাউকে না দেখতে পেয়ে ওই মেয়েটাকেই জিজ্ঞেস করলাম, "ছোটকাকিমা কোথায়?"

"বড় পিসি ডাইনিং হলে।"

মেয়েটা তা হলে ছোটকাকিমার ভাইঝি। পা চালিয়ে ডাইনিং হলে ঢুকতেই অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। দুতিনজন মিলে ছোটকাকিমাকে বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন। থালায় মাছের মুড়ো। আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে ছোটকাকিমা। আর আপন মনেই খেয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই শুকনো গলায় বলে উঠল, "আয় শিবা, বোস।"

"কাকাকে তো এখুনি কলকাতায় নিয়ে যাওয়া দরকার ছোট কাকিমা।"

"এই রোগীকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কী হবে বল তো শিবা। আমার ভাইরা বলছে, এক গাদা টাকা খরচা করে লাভ নেই।"

"বাড়িতে থাকলে কাকা আরও কষ্ট পাবে।"

"পাক। সারাটা জীবন আমাকে কষ্ট দিয়ে গেল। কষ্ট পাওয়া কাকে বলে তোর ছোটকাকা একটু বুঝুক।"

কথাটা শুনেই চমকে উঠলাম। এ কী বলছে ছোটকাকিমা! মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি? মিলি এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। ছোটকাকিমার কথাগুলো ওর

কানেও গেছে। ও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। বললাম, "অ্যাদ্দিন ধরে প্রসটেটের প্রবলেম, অপারেশন করিয়ে নাওনি কেন তোমরা? তা হলে এখন এই অবস্থায় পড়তে না।"

"ডাক্তার বলেছিল। অপারেশন করতে পারেন। তা হলে কিন্তু আরও ছড়িয়ে পড়বে। সেই ভয়েই উনি আর করালেন না। এ সব পাপের সাজা। বুঝলি।"

"পুরনো কথা ছাড়ো ছোটকাকিমা। আমি গাড়ি নিয়ে আসছি। তুমিও রেডি হয়ে নাও।"

"দরকার নেই। দেবু অ্যাম্বুলেন্স আনতে যাচ্ছিল। আমি বারণ করে দিলাম। যা হওয়ার এখানেই হোক। এই মেয়েটা কে রে শিবা। তোর বন্ধু? বাঃ বেশ মিষ্টি তো মেয়েটা। আমার এমন কপাল। ভগবান, একটা সন্তানও দিল না। দিলে এই রকমই একটা মিষ্টি বউ আনতুম রে ঘরে।"

এসব শুনে মিলি ফিসফিস করে বলল, "শিবাদা, চলো।"

ছোটকাকার উপর কাকিমা কী শোধ তুলছে, কে জানে? হয়তো ভাই আর ভাইয়ের বউরা এসে নানা কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। পরক্ষণেই মনে হল, কুমন্ত্রণার কথাই বা ভাবছি কেন? এই যে মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীকে উপরে শুইয়ে রেখে, নীচে বসে মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত খাচ্ছে—এটা কি মানসিক সুস্থতার লক্ষণ? মোটেই না। ছোটকাকার জন্য দরদ দেখানো বোধহয় আমারই উচিত হচ্ছে না। তাই বললাম, "আমি বাড়িতে আছি কাকিমা। দরকার হলে ডেকো।" কথাটা বলে আমি আর দাঁড়ালাম না।

ভুলেশ্বরের মন্দিরে আর যাওয়া হল না। সন্ধে পর্যন্ত ছোটকাকার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখটা আমার মনের মধ্যে ভাসতে থাকল। ছোটকাকার কী হয়েছে, কাকিমা ইঙ্গিতে তা আমাকে বলেই দিল। ক্যান্সার। এর পরের লক্ষণগুলো আমি জানি। হঠাৎ একদিন দুটো পা অসাড় হয়ে যাবে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। দিন দিন পুরো দেহটা ছোট্ট হয়ে যাবে। তারপর একদিন নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যাবে। কাকার বাড়ি থেকে ফেরার পর সারাটা দুপুর আমি ছটফট করতে লাগলাম। মিত্তির কাকা কথা বলতে এলেন, ভাল লাগল না। রমেন আর সুস্মিতা খানিকক্ষণ গল্প করার পরই বুঝে গেল, আমার মন অন্যদিকে। "অন্য একদিন আসব" বলে ওরাও উঠে গেল। আমাকে গুম হয়ে থাকতে দেখে সন্ধ্যার সময় মিলি বলল, "শুভ্রাদের বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসি শিবাদা। বিকেলে ছাদে উঠেছিলাম। শুভ্রা যেতে বলল।"

মন ভাল থাকলে আমি ল্যাবরেটরিতে ঢুকি। মন খারাপ থাকলে আরও বেশি সময় কাটাই। সন্ধের পর ল্যাবরেটরি গিয়ে ঢুকলাম। মিত্রের দোকান থেকে আনা প্যাকেট খুলে আমি সাজিয়ে রাখতে শুরু করলাম। আমার পারফিউমের স্যাম্পেল ফুরিয়ে গেছে। কিছু তৈরি করে রাখা দরকার। সেটা তৈরি করতে গিয়ে আমি ধীরে ধীরে ছোটকাকার কথা ভুলে গেলাম। মিত্র ন্যাচারাল মাসকোন দিয়েছে। আমার পারফিউমের মূল উপাদানই মাস্ক। ছোট ছোট পাঁচটা স্যাম্পেল তৈরি করার পর শিশিতে এ থেকে ই পর্যন্ত লিখে চিহ্ন দিয়ে রাখলাম।

"কী করছ শিবাদা?"

মন দিয়ে লেবেল লাগাচ্ছি। মিলি কখন ঘরে ঢুকেছে, লক্ষই করিনি। ঘাড় ঘুরিয়ে বললাম, "আমার যা কাজ।"

"বাড়িতে ঢোকার পর থেকেই চমৎকার একটা গন্ধ পাচ্ছি। পারফিউম তৈরি করছ বুঝি?" কথা বলতে বলতেই মিলি আমার পাশে এসে দাঁড়াল। শিশিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "এগুলো কী শিবাদা?"

"শিশির গায়ে লেখা আছে। দেখছ না?"

"অ্যাম্বার গ্রিজ-টা কি গো?"

"তিমি মাছের বমি। খুব দামি জিনিস।"

"পারফিউমে লাগে নাকি?"

"হ্যাঁ।" একটা করে শিশি তুলছে মিলি। আর কেমিকেলের নামগুলো পড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার পারফিউমের একটা স্যাম্পেল তুলে বলল, "এতে এ লেখা আছে কেন, শিবাদা?"

"এই পারফিউমটা এখুনি বানালাম।"

"গায়ে দিয়ে দেখব?"

সঙ্গে সঙ্গে প্রমাদ গুনলাম। বারণ করার আগেই শিশির মুখটা খুলে ফেলেছে মিলি। আঙুলের ডগায় খানিকটা পারফিউম লাগিয়ে ও বলল, "কোথায় লাগাব?"

"কানের পিছনে। রিস্টের কাছে।"

"বাহ, চমৎকার গন্ধটা তো।" বলতে বলতে কানের পিছনে, কব্জির কাছে, বুকের ভাঁজে মিলি পারফিউম ঘষে নিল। তারপর বলল, "দাদা এবার আমাকে একটা সামসারা-র বোতল এনে দিয়েছে। তার চেয়েও এই গন্ধটা অনেক ফ্রেশ শিবাদা।"

ওর কাণ্ড দেখে আমি দ্বিধায় পড়ে গেছি। উৎসাহ দেওয়াটা বোধহয় ঠিক হল না। আমার পারফিউমের প্রভাব আমি জানি। মিলি যতক্ষণ থাকবে, কাজ করা যাবে না। তাই বললাম, "তুমি ডিনার করবে না?"

"একদম না। শুভা প্রচুর খাইয়ে দিয়েছে। পেট একেবারে জ্যাম। বিছানায় পড়লে, ঘুমিয়ে পড়ব। আমি যাই। তুমি কাজ করো।"

ঘণ্টাখানেক পর খাওয়া দাওয়া সেরে আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। রাত প্রায় এগারোটা হবে। কাল এই সময়টায় ছোটকাকার বাড়িতে বোমাবাজি করে গেছে কালুয়া। লোকটাকে প্রায় মেরে দিয়ে গেছে। আজ গোল চাঁদ উঠে এসেছে মাঝ আকাশে। বিকেলের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল ঝিঁঝি পোকা আর ব্যাঙের ডাকে কানে তালা লেগে গেল। কাল বারান্দার এই জায়গাতে দাঁড়িয়েই মিলি আর আমি অনেকক্ষণ ধরে গল্প করেছিলাম। আজ বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে মিলি। পাশের ঘরে আলো নেভানো।

হঠাৎই পিঠে একটা স্পর্শ অনুভব করলাম। চমকে উঠে দেখি, মিলি। বললাম, "তুমি? ঘুমোওনি।"

মিলি আমার পিঠে গাল ঠেকিয়ে দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ঘুম আসছে না।"

হাত দু'টো ছাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেই মিলি আরও জোরে আমাকে আঁকড়ে ধরল। তারপর ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, "ছাড়িয়ে দিও না। আমার ভাল লাগছে।"

মিলির বাঁ হাতের কবজি থেকে মৃগনাভির গন্ধ পাচ্ছি। ওর নরম বুকের স্পর্শে হঠাৎ আমার শরীরে শিরশিরানি শুরু হল। মিলি আমার পিঠে মুখ ঘষছে। আমার সেই হরিণীদের কথা মনে হল, মৃগনাভির টানে যারা হরিণের কাছে দৌড়ে আসে। কথাটা মনে হওয়া মাত্রই সারা শরীরে একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। মিলির মতো রক্ষণশীল একটা মেয়ে সব লজ্জা বিসর্জন দিয়ে গভীর রাতে আমার কাছে ছুটে এল কেন?

অনিন্দ্য বলেছিল। আমার কিছু পরিচিত লোকও। আজ নিজেই কিন্তু চোখের সামনে আমার সাধনার ফল দেখতে পাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালাম। দু'হাতে মিলির মুখটা তুলে ধরলাম। জ্যোৎস্নার মতো, আনন্দের কণাগুলো আমার স্নায়ু থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে। পাঁজাকোলা করে তুলে মিলিকে আমি আমার বিছানায় নিয়ে গেলাম।

॥ তেরো ॥

কারখানার গেটে আমাকে দেখামাত্রই হইহই করে উঠল রমেনরা। লোহার বড় গেটটা আজ হাট করে খোলা। ভেতরে-বাইরে জনা কুড়ি লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে। বোধহয় কারখানার পুরনো কর্মী, রমেনদের মুখে খবর পেয়ে গেছেন। ছোটকাকা দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। কারখানা হাতে নিয়ে আমি নতুনভাবে চালু করছি। ছোটকাকা সব কাগজপত্রে সই করার জন্য কাল অবধি পার্বতীপুরে ছিল। সম্ভবত এতক্ষণে কলকাতার বাড়িতে রওনা হয়ে গেছে।

মনে মনে ঠিক করেছিলাম, যতদিন না বেঙ্গল পারফিউম কোম্পানি আমার দখলে পাচ্ছি, ঢুকব না। শেষ বার কবে এসেছি, ঠিক মনে নেই। বাবার ইচ্ছে ছিল না আমি ব্যবসায় ঢুকি। চেয়েছিল, আমি ডাক্তার হই। তাই কলকাতার বাড়িতে রেখে আমাকে পড়াশুনো করিয়েছে। মাঝেমধ্যে ডোমজুড়ে এলেও, সচরাচর ফ্যাক্টরিতে আসার সুযোগ আমার কখনও হয়নি। বছরে একটা দিনই আসতাম। বিশ্বকর্মা পুজোয়। সেদিন খুব ধুমধাম হত। আবছা আবছা মনে আছে, সেদিনগুলোর কথা। লনে বিরাট প্যান্ডেল বাঁধা হত। পুরো পরিবার নিয়ে কর্মীরা সেদিন হাজির হতেন। সারাদিন অন্য মানুষ মনে হত ছোটকাকাকে। নিজে দাঁড়িয়ে সবাইকে আপ্যায়ন করত। পুজোর বোনাস সেদিনই দিয়ে দেওয়া হত।

দীর্ঘদিন পরে কারখানার ভেতরে ঢুকে আমার খারাপই লাগল। সব একই রকম আছে। কিন্তু ধূলিমলিন অবস্থায়। ঠাকুর্দা যখন এই ফ্যাক্টরিটা তৈরি করেন, তখন ভেবে-চিন্তেই করেছিলেন। গেট থেকে ইট বাঁধানো রাস্তা সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে। ডান দিকে পরপর দু'টো বড় দোতলা বাড়ি। একেবারে শেষে গুদাম। বাঁ দিকে লন। তারপর বিরাট বাগান। আগে সেখানে গোলাপ চাষ হত। বাগানের শেষ প্রান্তে

ছোট্ট একটা গেস্ট হাউস। দূর থেকে যে সব এজেন্ট আসতেন, তাঁদের রাত্রিবাসের জন্য।

রমেন আমাকে বলল, "ভেতরটার কী অবস্থা দেখেছেন শিবাশিসদা। কোথাও জানলা খুলে নিয়ে গেছে। কোথাও ইলেকট্রিকের তার নেই। কোথাও সাপ-খোপের বাসা। পুরনো চেহারা ফিরিয়ে আনতেই আপনার মাস তিনেক লেগে যাবে।"

বললাম, "তার বেশি লাগবে। আজ নিজের চোখে দেখে যাই। সামনের সপ্তাহেই রিনোভেশনের কাজ শুরু করে দেব।"

কথাটা বললাম বটে, কিন্তু কীভাবে শুরু করব নিজেই জানি না। বাড়িগুলোর মেরামতের জন্যই লাখ পাঁচেক টাকার দরকার। তা ছাড়া দু'টো বাড়ি আর গুদামের জন্য এয়ার কন্ডিশনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য বাড়তি কত টাকা লাগবে, আন্দাজ নেই। সুপ্রতিমবাবুর কাছে পরামর্শ নেওয়ার জন্য কাল গেছিলাম। উনি বললেন, "তুমি বি আই এফ আর-এ যেও না। গেলে হয়তো ওরা টাকার ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু সরকারী লোক বসিয়ে দিয়ে নানা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে। তুমি নিজে কোনও ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলো, বাবা।"

বলেছিলাম, "আমার তো কোনও ব্যাঙ্কে তেমন জানাশুনো নেই মেসোমশাই।"

সুপ্রতিমবাবু কী ভেবে বললেন, "কলকাতায় এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তুমি তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলতে পারো।"

"কোথায় সেটা?"

"চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউতে। ভদ্রলোকের নাম স্বপন মুখার্জি। কোনও বাঙালি ছেলে ব্যবসা করতে চাইলে উনি আউট অফ দ্য ওয়ে-তে গিয়ে সাহায্য করেন। ভদ্রলোক খুব মিশুকে। দেখোই না একবার ওর কাছে গিয়ে।"

ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ফোন নম্বর নিয়ে রেখেছি। আজ পারব না। কাল গিয়ে একবার কথা বলে আসতে হবে। হাজার কাজ বাকি। ইলেকট্রিকের লাইন কাটা। ফের নতুন করে লাইন আনতে হবে। ছোটকাকা কত টাকা বাকি রেখে গেছে, জানি না। লাইন পেতে কতদিন লাগবে, সে সম্পর্কেও আমার কোনও ধারণা নেই। মিত্তির কাকাকে কাজে লাগিয়ে দিতে হবে। টেলিফোনের ব্যবস্থাও করতে হবে। কারখানাটা যখন বন্ধ হয়, তখন ডোমজুড়ে এত টেলিফোন ছিল না। এখন অনেক বাড়িতেই টেলিফোন। কলকাতা থেকে সরাসরি লাইন পাওয়া যায়। মিত্তিরকাকা কাল বললেন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ওঁর জানাশুনো আছে। এক মাসের মধ্যে লাইন পাওয়া যাবে। কম করে চারটে টেলিফোন আমার দরকার কারখানায়।

মেন বিল্ডিং, মানে মাঝের বাড়িটায় এতদিন তালা লাগানো ছিল। রমেন তালা খুলে আমাকে ডাকল, "শিবাশিসদা, ভেতরে আসুন।"

ভেতর ঢুকতেই কটু একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল। এই বাড়িতে ল্যাবরেটরি। ছোটবেলায় যখন আসতাম, তখন দেখতাম সাদা অ্যাপ্রন পরা কয়েকজন লোক গোমড়া মুখে কাজ করে যাচ্ছেন। ওই ঘরে ঢোকার পারমিশন তখন আমাদের ছিল না। আমরা বাঁ দিকে অফিস ঘরে বসতাম। রমেন সব ঘরের তালা খুলে দিচ্ছে।

কৌতূহলবশত, আমি প্রথম গিয়ে ঢুকলাম ওই ল্যাবরেটরিতেই।

লম্বা বিরাট একটা ঘর। একদিকে চেয়ার-টেবল। তাতে কিছু কাগজপত্র রাখা। অন্য দিকে, লম্বা টেবলে নানা ধরনের বোতল, শিশি আর ড্রাম। অনেক বোতলে এখনও কেমিকেল রয়ে গেছে। তার মানে, এই ঘরেই তখন পারফিউম তৈরি হত। ফিলিং, সিলিং, মিক্সিং, প্যাকেজিংয়ের জন্য আলাদা ইউনিট ছিল না। না থাকারই কথা। তখন কতই বা প্রোডাকশন হত? আমাকে অবশ্য আলাদা ইউনিট করতে হবে। আমার টার্গেট বছরে এক লাখ বোতল।

ল্যাবরেটরিতে দাঁড়িয়ে চিন্তা করার সময়ই এসে গেলেন রমাপ্রসাদবাবু। ওঁর সঙ্গে আরও দুই ভদ্রলোক। একজন বেশ বয়স্ক। অন্যজন গোলগাল, টাকমাথা, মাঝবয়সী। চোখাচোখি হতে রমাপ্রসাদবাবু বললেন, "কী হাল হয়েছে ল্যাব-টার। দেখে খারাপ লাগছে। তোমার ঠাকুর্দার আমলে জুতো পরে কেউ এখানে ঢুকতে পারত না। হল্যান্ড থেকে একবার দু'জন সাহেব ফ্যাক্টরি ভিজিট করতে এলেন। সাহেবরা তো আর খালি পায়ে ঢুকবেন না। তাই আগেভাগেই তোমার ঠাকুর্দা ওদের জন্য শুঁড়ওয়ালা চামড়ার চটি কিনে আনলেন। চটি দেখে তো খুব খুশি সাহেবরা। এমন পছন্দ, সেটা প্যাকেট করে ওঁরা দেশে নিয়ে গেলেন।"

ল্যাব থেকে বেরিয়ে আসতেই রমাপ্রসাদবাবু বললেন, "শিবাশিস, তোমার সঙ্গে এই দুই ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিই। জয়রাম চ্যাটার্জি আর মোহন পাল। এঁরা একসময় তোমাদের এজেন্ট ছিলেন। ক্যানিং স্ট্রিটে এখনও এঁদের দোকান আছে। গুজরাতি আর মারোয়াড়িদের মাঝে টিমটিম করে জ্বলছেন। তোমার কাকার সঙ্গে এঁদের সম্পর্কে ভাল ছিল না। তোমার কাকা অনেক টাকা-পয়সা মেরে দিয়েছেন। ফ্যাক্টরিটা তুমি খুলছ শুনেই এঁরা দৌড়ে এসেছেন। যদি তোমার কিছু টাকার দরকার হয়, তা হলে এঁরা দিতে রাজি।"

কথাগুলো শুনে চমকে উঠলাম। অবশ্যই আমার টাকা দরকার। কিন্তু অযাচিতভাবে কেউ তা দেয়, আমার ধারণা ছিল না। নমস্কার জানিয়ে বললাম, "আপনারা থাকেন কোথায়?"

বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, "আমি জয়রাম চ্যাটার্জি। থাকি ভবানীপুরে। আপনার ঠাকুর্দা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। বলতে গেলে রাস্তা থেকে তুলে এনে আমাকে ব্যবসা করে দিয়েছিলেন। আমি সাউথ ইন্ডিয়ায় মাল পাঠাতাম। অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুতে। বেশ ভাল মার্কেট ছিল। সব নষ্ট করে দিলেন আপনার কাকা।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার কী মনে হয়, চেষ্টা করলে এখন সেই মার্কেট পাওয়া যাবে?"

জয়রামবাবু কিছু বলার আগেই টাকমাথা ভদ্রলোক বললেন, "অবশ্যই পাওয়া যাবে। বেঙ্গল পারফিউমের গুডউইল নষ্ট হয়নি। আমি ওড়িশা, ইউ পি আর দিল্লি অঞ্চলে মাল পাঠাতাম। এখনও লোকে এসে আপনাদের প্রোডাক্ট চায়। খুশবু সেন্ট তখন হুহু করে বিক্রি হত। আপনি আর যা-ই প্রোডাকশন করুন, খুশবু করবেন। হিন্দি বেল্টে এখনও চলবে। কিছু ভাববেন না। আমরা আপনার পাশে আছি।"

ভদ্রলোকের নাম রমাপ্রসাদবাবুর মুখে শুনলাম, মোহন পাল। উনি এত আন্তরিকভাবে কথাগুলো বললেন, হঠাৎই মনে হল—আমি একা নই। মা মাঝে মাঝেই বলতেন, "যার কেউ নেই, জানবি তার ঈশ্বর আছেন।" কথাটা তা হলে সত্যি। এখন তো শুরুই করিনি। অথচ লোকমুখে শুনে এই দুই ভদ্রলোক চলে এসেছেন। শুধু আসেননি, আমাকে টাকা-পয়সাও দিতে চাইছেন।

রমেন কেটলি করে চা নিয়ে এসেছে। মাটির ভাঁড়ে সেই চা ঢেলে সবাইকে দিচ্ছে। আমি বিব্রত মুখে বললাম, "মিঃ চ্যাটার্জি, আপনারা এমন একটা দিনে এলেন, বসতে দেওয়ার জায়গা নেই।"

"ডাজ'ন্ট ম্যাটার। আমরা প্রথমে আপনার বাড়িতেই গেছিলাম। আপনার স্ত্রী বললেন, আপনি এখানে এসেছেন।"

কথাটা শুনে হাসি পেয়ে গেল। বাড়িতে তা হলে মিলির সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওকেই আমার স্ত্রী বলে এঁরা ভুল করেছেন। মিলির মুখটা একবার চোখের সামনে ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। বললাম, "আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।"

জয়রামবাবু বললেন, "শুনেছি, আপনি ফ্রান্স থেকে কী একটা ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন পারফিউমের। নিশ্চয়ই নতুন কিছু করবেন। আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে। যা কিছুই করুন, মাস পিপলের কথা ভেবে করবেন। অন্তত, একটা ব্র্যান্ড রাখবেন।"

হেসে বললাম, "আপনার কথা মনে থাকবে।"

জয়রামবাবু আর মোহনবাবু নিজেদের ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আমরা মাঝেমধ্যেই খোঁজখবর নেব। অন্য কোনও প্রয়োজন হলে অবশ্যই জানাবেন।"

দু'জন চলে যাওয়ার পর রমাপ্রসাদবাবু বললেন, "সারা ভারতে তোমাদের মোট ১২৭ জন এজেন্ট ছিলেন। ফিগারটা এখনও আমার মনে আছে।"

"তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে?"

"খাতাপত্তর খুঁজে দেখতে পারো। আমি বলি কী, তুমি একবার স্টিফেন হাউসে যাও। ওই অফিসটা সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে ওটাই মেইন অফিস করো। ওখানে নিশ্চয়ই রেকর্ড পাবে। যদি আমাকে এই দায়িত্ব দাও। আমিও কয়েকটা দিন তোমার জন্য সময় দিতে পারি।"

বললাম, "খুব ভাল হয়। ছোট কাকা ওই অফিসটাও আমাকে দিয়ে গেছেন। ওখানে সুবোধ বলে একজন আছে। তার সঙ্গে ফোনে কথা বলে রাখব।"

চা খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর রমেন বলল, "চলুন শিবাশিসদা, ওপরটায় একবার যাওয়া যাক। বাবার মুখে শুনেছি, ওপরে একটা কনফারেন্স রুম আছে। দু'শো লোক স্বচ্ছন্দে অ্যাকোমোডেট করা যেতে পারে। ভাবতেই পারিনি, এই ফ্যাক্টরির ভেতর এত ফেসিলিটি আছে।"

রমাপ্রসাদবাবু বললেন, " তোমার ঠার্কুদা একটা সময় অল ইন্ডিয়া বডি-র

প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তখন সারা ভারত থেকে পারফিউম ব্যবসায়ীরা এখানে আসতেন। ওপরে মিটিং হত দু'তিনদিন ধরে।"

দোতলায় উঠে সবাই মিলে কনফারেন্স রুমে ঢুকলাম। জানলার কাচ ভাঙা। টেবলটা রয়েছে। চেয়ার নেই। সিলিং ফ্যানও চুরি হয়ে গেছে। খোপে খোপে পায়রার বাসা। হল ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে হল, ঠাকুর্দা সেই সময় যথেষ্ট আধুনিক ছিলেন। কারখানায় সব রকম ব্যবস্থাই রেখেছেন। তবে ওপরের এই হলঘরটা কনফারেন্স রুম হিসাবে ব্যবহার না করে, ল্যাবরেটরিটা ওপরে নিয়ে এলে ভাল হয়। তা হলে গোপনীয়তা থাকবে। মনে মনে ঠিক করে নিলাম, ল্যাব-টা ওপরে তুলে আনব।

ঘণ্টাখানেক ধরে পুরো কারখানাটা ঘুরে মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া গেল, মেরামতির জন্য আমাকে কী কী করতে হবে। অনেক কাজ। গোডাউনের মেঝে ফাটা। গেস্ট হাউসের দেয়াল ভেঙে গেছে। যে কোনও দিন ছাদ ধসে যেতে পারে। বাগানে কাঁটা ঝোপ আর আগাছা। কাল থেকেই লোক লাগিয়ে সাফ করতে হবে। রমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই আমি বাইরের গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কয়েক মিনিট পর একটা মিনিবাস ধরে উনি শলপের দিকে চলে গেলেন।

রমেন লোহার গেটে তালা লাগিয়ে চাবির গোছাটা আমার হাতে দিয়ে বলল, "চলি শিবাশিসদা। আমার কাজ শেষ।"

এমনভাবে কথাটা বলল, আমার বুকটা ধক করে উঠল। বললাম, "তোমার কাজ শেষ মানে? তোমার কাজ তো শুরু হল রমেন। তুমি উদ্যোগ না নিলে এই ফ্যাকটরি খুলত? তোমাকে একটা বড় দায়িত্ব নিতে হবে।"

"তা হয় না শিবাশিসদা। আপনার সঙ্গে সম্পর্কটা তা হলে খারাপ হয়ে যাবে।"

"কিন্তু আমি যে ঠিক করেছি, পুরনো এমপ্লয়িদের ব্লাড রিলেশন আছে, এমন লোকদের নেব।"

"আমার ভাইকে তা হলে একটা কাজ দিন। আমার দ্বারা চাকরি-বাকরি হবে না।"

রমেন মনস্থির করেই রেখেছে। ওর চোখ-মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে। পরে এই প্রসঙ্গটা তোলা যাবে। তাই বললাম, "তুমি কোনদিকে যাবে রমেন?"

"আমি দফরপুরে যাব। সুস্মিতার কোনও খবর নেই দু'তিনদিন। ভাবছি, ওদের বাড়িতে একবার ঘুরে আসব।"

সাইকেলে উঠে রমেন চলে গেল। আমি গেটের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। পৃথিবীতে এমন লোকও তা হলে আছে? বিকেলের দিকে রমেন সেই লাইব্রেরিতে গিয়ে বসবে। আর সকালের দিকে কাজ করবে ডোমজুড় কথায়। এর মাঝে পরিচিত কেউ অসুস্থ হলে সারা রাত নার্সিং হোমে জেগে থাকবে। মারা গেলে শ্মশানে গিয়ে দাহ করে আসবে দলবল নিয়ে। রমেন কোনও রাজনৈতিক দলে নেই। কোথাও গিয়ে দাদাগিরিও করেছে, এমন কথা কখনও শুনিনি। কারও কাছে কোনও কিছু প্রত্যাশাও বোধহয় করে না। এই যে ও সুস্মিতার বাড়ি গেল, যাওয়ার কোনও দরকার ছিল না। যে কোনও এসটিডি বুথ থেকেই ফোন করে ও খোঁজ নিতে পারত। ওদের

পরিবারের আর্থিক অবস্থা কেমন জানি না। মনে হয়, খুব ভাল নয়। মনে মনে ঠিক করলাম, ওর ভাইকে একটা চাকরি দিতে হবে।

আগে লক্ষ করিনি, মারুতিতে উঠে স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, দু'পাশ থেকে দু'টো মোটরবাইক আমাকে ডিসটার্ব করছে। আজাদ হিন্দ কলেজ যাওয়ার রাস্তাটা পেরিয়ে আসার পর ইচ্ছে করেই গাড়ির গতি কমিয়ে দিলাম। ডান দিকের মোটর বাইকে দু'টো ছেলে। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাইকটা দাঁড়িয়ে গেল। বুঝলাম, বদ মতলব আছে। বেলা প্রায় দেড়টা। হাওড়া-আমতা রোডের এই জায়গাটা বেশ ফাঁকা। দু'পাশে জলা জমি। উল্টো দিক থেকে মিনি বাস বা ট্র্যাক হুশ করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। কোনও ঝামেলা হলে, কেউ আমার জন্য দাঁড়াবে না।

বাঁ দিকে একটা ছেলে হেলমেট পরে পাশাপাশি বাইক চালিয়ে যাচ্ছে, সে কিছু বলছে। কাচটা তোলা। তাই বুঝতে পারছি না। এই পরিস্থিতিতে ভয় পেলে চলবে না। গাড়িটা সাইড করে রেখে নামলাম। তারপর রুক্ষ স্বরে ছেলেটাকে বললাম, "কী ব্যাপার ভাই? আমার পথ আটকাচ্ছ কেন?"

হেলমেট খুলে ছেলেটা বলল, "লখা-দা আপনাকে একবার ডেকেছে। আমাদের সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে।"

"কে লখা-দা?"

"আমাদের সঙ্গে গেলেই সেটা বুঝতে পারবেন।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"এই সামনেই। পার্টি আপিসে।"

"যদি না যাই?"

"আপনাকে তুলে নিয়ে যাব।"

অন্য বাইকটাও আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পিছনের সিটে বসা ছেলেটা নেমে এসে বলল, "আপনিই তো এই ফ্যাক্টরিটা খুলছেন, তাই না?"

"হ্যাঁ। তার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কী?"

ছেলেটা বলল, "কেন ঝামেলা করছেন দাদা? লখাদাকে চটিয়ে এই ফ্যাক্টরি আপনি কিন্তু চালু করতে পারবেন না।"

চট করে ব্যাপারটা বুঝে নিলাম। ফালতু মাস্তানি। চাপ দিয়ে কিছু টাকাপয়সা আদায় করে নিতে চায়। বোধহয় আমার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়নি। ভেবেছে, আমি বাইরের লোক। তাই ভয় দেখাচ্ছে। এই লখা লোকটাকে একবার নিজের চোখে দেখা দরকার। একটু আগে ছেলেটা বলল, পার্টি আপিসে যেতে হবে। গিয়ে দেখে আসা যাক, কোন পার্টি। গলার স্বর বদলে বললাম, "চলো, কোথায় যেতে হবে।"

ফের গাড়িতে গিয়ে বসলাম। পিছনের সিটে হেলমেট পরা ছেলেটা এসে বসল। মনে মনে প্রচণ্ড রেগে গেলেও মুখে কিছু বললাম না। এ সব মাস্তানি শুরুতেই থামিয়ে দেওয়া দরকার। নিশ্চয়ই ফ্যাক্টরির আশপাশের অঞ্চলের ছেলে। এদের দাবি না মানলে, রোজ যাতায়াতের পথে বিরক্ত করবে। আমার হাতে এখন প্রচুর কাজ।

মাথা ঠাণ্ডা রাখতে না পারলে ঠিক সময়ে ফ্যাক্টরিটা চালু করতে পারব না। সুপ্রতিমবাবু সেদিন ঠিকই বলেছিলেন, "ব্যবসা করার ইচ্ছে থাকলে বাইরে চলে যাও। গুজরাত্ বা কর্নাটকে যাও। আর অতদূর যদি না যেতে চাও, তা হলে অন্ধ্রপ্রদেশ বা ওড়িশাতেও যেতে পারো। সরকারী সাহায্য তো পাবেই, উটকো কিছু ঝামেলাও তোমাকে ফেস করতে হবে না।"

ফ্যাক্টরির গেট খোলার প্রথম দিনই উটকো ঝামেলার মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। এই ছেলেগুলো কী চেয়ে বসবে কে জানে? মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ছেলেগুলো একটা গলির ভেতর আমাকে ঢোকাল। গাড়ি থেকে নেমে বুঝলাম, কেশবপুরের রাস্তা। একটা পুরনো বাড়িতে একতলায় ছেলেগুলোর পার্টি অফিস। মেঝেতে চাটাই। দু'তিনটে ভাঙা বেঞ্চি। সর্বহারাদের পার্টির অবস্থা তো এখন এতটা খারাপ নয়! মনে মনে অবাক হলাম।

হেলমেট হাতে ছেলেটা আমাকে আপ্যায়ন করে ভেতরে নিয়ে গেল। ঘরের মাঝে দাঁড়াতেই যাকে দেখলাম, আমার ভ্রু কুঁচকে গেল। সেই ছেলেটা, মাস কয়েক আগে মাকড়দা বাজারে তলপেটে আমার লাথি খেয়ে যে ছিটকে পড়েছিল। এর নামই তা হলে লখা। টেবলের উপর পা তুলে ছেলেটা বসেছিল। আমাকে দেখেই ও স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। মনে করার চেষ্টা করছে আমাকে। করুক। কোমরে হাত দিয়ে আমিও ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

॥ চৌদ্দ ॥

সারাটা দিন ফ্যাক্টরিতে খুব ধকল গেছে। বাড়ি ফিরে স্নান করে ড্রয়িংরুমে এসে বসলাম। এই সময়টায় রোজ টিভি-তে একবার খবর শোনার অভ্যেস। কারগিলে অঘোষিত যুদ্ধ চলছে। গত কয়েকটা দিন খুব মন্দা গেছে শেয়ার বাজারে। লক্ষণটা ভাল নয়। এই সময়ে এত বড় একটা ঝুঁকি নিচ্ছি। মনে তাই সামান্য খটকা।

স্টার নিউজের চ্যানেলটা খুলে খবর শুনছি, এমন সময় মিনু পিসি এসে জিজ্ঞাসা করল, "ছোট দাদাবাবু, জল খাবার এনে দেব?"

আজকাল মনে হয়, আমার খিদে পায় না। খিদে পেলেও বুঝতে পারি না। কাজের মধ্যে এমন ডুবে আছি। তবুও ঘাড় নাড়লাম। খুশি হয়ে মিনু পিসি ভেতরে চলে গেল।

ভারতীয় সেনারা টাইগার হিল দখল করে নিয়েছেন। তাঁদের ইন্টারভিউ দেখানো হচ্ছে। কিছুদিন আগেও, মুগ্ধ হয়ে এই সব খবর শুনতাম। এখন আর তেমন টানে না। যুদ্ধে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। এক বা দু'মাস পরে তা থেমে যাবে। তারপর আরেকটা যুদ্ধ শুরু হবে। মন্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সেই ধাক্কাটা দু'দেশ কীভাবে সামলাবে, সেটাই আসল ব্যাপার।

টেবলের উপর একটা ফাইল পড়ে আছে। বিকেলে এই রিপোর্টটা দিয়ে গেছে বিভাস চ্যাটার্জি। মাসখানেক আগে সুপ্রতিমবাবুই একদিন পরামর্শ দিয়েছিলেন, "যে

প্রোডাকটটা তুমি বাজারে আনছ, সেটা কেমন হল, তা জানার জন্য একবার মার্কেট সার্ভে করিয়ে নাও। বড় বড় কোম্পানিগুলো এটা করে।" কথাটা তখন মনে ধরে গেছিল। তাই বিভাস চ্যাটার্জির এজেন্সি দিয়ে বাজার যাচাই করছি। কলকাতার দশটা অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিনা পয়সায় আমার পারফিউম বিলিয়েছে বিভাসের লোকেরা। এক সপ্তাহ পর ফের গিয়ে তাদের মতামত নিয়েছে।

বিভাস প্রথমে বলেছিল, পাঁচশোজনের মধ্যেই সমীক্ষা সীমাবদ্ধ রাখবে। কিন্তু আমি সংখ্যাটা দ্বিগুণ করতে বলেছিলাম। এঁদের মধ্যে বিবাহিত, অবিবাহিত সব ধরনের লোকই যেন থাকেন। বিভাস একটা প্রশ্নমালা তৈরি করে এনেছিল। সরাসরি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি, নতুন পারফিউম যৌন আবেদন বাড়ায় কি না। এই প্রশ্নটাই একটু ঘুরিয়ে করেছে। রিপোর্টটা দেওয়ার সময় বিভাস বলে গেল, "শিবাশিসবাবু, আপনি এইট্টি ফাইভ পার্সেন্ট সাকসেসফুল। এই রিপোর্টে ডিটেল সব বলা আছে। একটু ধৈর্য ধরে পড়ে নেবেন।"

রিপোর্টের মুখবন্ধটা পড়ছি, এমন সময় জোজো এসে বলল, "শিবাম্মা, দেখো কাকে ধরে এনেছি।"

দরজার দিকে তাকাতেই দেখলাম, কেয়াদি। এ কী চেহারা হয়েছে কেয়াদির? পরনে সস্তার তাঁতের শাড়ি। চোখ-মুখে কালি পড়ে গেছে। এলানো চুল। চেনাই যাচ্ছে না কেয়াদিকে। তাড়াতাড়ি সোফা ছেড়ে উঠে বললাম, "আসুন, কেয়াদি। কোত্থেকে?"

উত্তরটা দিল জোজো, "প্রীতমদের বাড়ি থেকে ফিরছিলাম। রাস্তায় কেয়া মাসির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাই ধরে আনলাম।"

"ভাল করেছিস।"

"তুমি কথা বলো শিবাম্মা। আমি কেয়া মাসির জন্য এক কাপ কফি করে আনি।"

কথাটা বলেই জোজো ভেতরে চলে গেল। আমি ভাল করে তাকালাম কেয়াদির দিকে। দেখে ভাল লাগল না। মাসখানেক আগে ভুলেশ্বরের মন্দিরে বসে হিয়া বলেছিল, 'দিদি খুব আপসেট হয়ে পড়েছে, সুব্রতদা কোনও খোঁজ খবর না নেওয়ায়।' কথাটা মনে পড়তেই মাথাটা সাফ হয়ে গেল। মনটা কেমন করে উঠল।

"কেমন আছ শিবাশিস? অনেকদিন তুমি আমাদের বাড়িতে যাওনি।"

গলাটা ভাঙা ভাঙা। কান্নাকাটি করলে যেমন হয়। বললাম, "সময় পাইনি কেয়াদি। এত ব্যস্ত। আপনি কেমন?"

"ভাল। বেশ ভাল। জীবনটা নতুন করে শুরু করব ভাবছি। শিবাশিস, তোমার ফ্যাক্টরিতে আমাকে একটা চাকরি দেবে ভাই? আমি একটা কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চাই।"

বললাম, "সত্যি করবেন? তা হলে খুব ভাল হয়।"

"তুমি বাবাকে বোঝাও। আজকাল রোজ আমি বলছি, আমাকে চাকরি করতে দাও। লোকটা শুনছেই না।"

"আমি বললে মেসোমশাই না করবেন না কেয়াদি।"

"সেই জন্যই তো তোমার কাছে এলাম। তোমাকে বাবা খুব বিশ্বাস করে। বলে, শিবাশিসের মতো ছেলে হয় না।"

"কী কাজ আপনার পছন্দ কেয়াদি?"

"আমার আর কোনও পছন্দ-অপছন্দ নেই ভাই। সব শেষ হয়ে গেছে।"

পরিষ্কার ডিপ্রেশনের লক্ষণ। মনে মনে সুব্রতদার উপর রাগ হতে লাগল। লোকটা এখানে এসে একজনকে নাচিয়ে, এখন প্যারিসে স্ফূর্তি করছে। ঠিক করে নিলাম, আজ রাতেই একবার ফোনে ধরব। আচ্ছা করে ঝাড়ব। তাতে আমার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়, হোক। সুব্রতদা নিজেকে ভেবেছেটা কী? কেয়াদির মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। এমন বিধ্বস্ত চেহারা।

জোজোর সঙ্গে কেয়াদির দেখাই বা হল কোথায়? এই পোশাকে তো কেয়াদির রাস্তায় বেরোনোর কথা নয়। আমার মন বলল, বাড়ির লোককে কিছু না বলেই কেয়াদি বেরিয়ে এসেছে। পরে জানা যাবে। আপাতত কিছুক্ষণ কথা বলা দরকার। যাতে কেয়াদির মন হালকা হতে পারে। তাই বললাম, "বড় একটা ঝুঁকি নিলাম কেয়াদি। জানি না, কী হবে?"

কেয়াদি বলল, "তুমি পারবে। প্রথম দিন তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছি। তুমি আলাদা। অন্যদের মতো নও। তোমাকে নিয়ে রোজ একবার না একবার আমাদের বাড়িতে কথা হবেই।"

"কী কথা কেয়াদি?

"বাবা প্রায়ই তোমার প্রশংসা করে। হিয়ার সঙ্গে তো একদিন তর্কই হয়ে গেল। বাবা বলল, এই ছেলেটাকে দেখে তোদের অনেক কিছু শেখা উচিত। দ্যাখ, নিজের পায়ে কেমন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। হিয়া তখন বলল, অন্যের সঙ্গে তুলনা করছ কেন? আমিও তোমাকে দেখিয়ে দেব, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি।"

"কেমন আছে হিয়া?"

"বেশ ভাল। নিজেকে নিয়েই আছে। হেলথ ক্লাব আর বিউটি কনটেস্ট নিয়ে বেশ আছে। আর দু'তিনদিন পরেই মিস ক্যালকাটা কনটেস্ট। সকালে কলকাতায় গেছে। এতক্ষণে বোধহয় ফিরে এসেছে।"

কেয়াদি কথাগুলো শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই মিনু পিসি জল খাবার নিয়ে ঢুকল।

জোজোর হাতে কফির ট্রে। টেবলের উপর রেখে ও বলল, "কেয়া মাসি, তুমি একটু মুখ-হাত ধুয়ে এসো। বিচ্ছিরি লাগছে তোমাকে দেখতে। তারপর পেটপুজো করা যাবে।"

কেয়াদি বলল, "আমি আবার কবে সুন্দর ছিলাম রে? সুন্দরী হলে কি লোকে আমায় এমন তাচ্ছিল্য করতে পারত?"

জোজো বেশ হুকুম দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "কোনও কথা নয়। চলো, বাথরুমে চলো।"

কেয়াদি বাড়িতে ঢোকার পর এই প্রথম হাসল। তারপর আমাকে বলল, "এই ছেলেটা পাগল। আমি কিছুতেই আসব না। আমায় জোর করে নিয়ে এল।"

মিনু পিসির সঙ্গে কেয়াদি ভেতরে ঢোকার পর জোজো ফিসফিস করে বলল, "আজ একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যেত শিবাম্মা।"

কথাটা ও এমনভাবে বলল, শুনে বুকের রক্ত আমার চলকে উঠল। বললাম, "কী ঘটনা রে?"

"কেয়া মাসি সুইসাইড করতে গেছিল।"

"কী বলছিস তুই?"

"প্রীতমের বাড়ি থেকে ফিরছিলাম। মাকড়দা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখি, কেয়া মাসিকে ঘিরে ছোটখাট ভিড়। জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার। লোকজন বলল, আপ ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিতে গেছিল কেয়া মাসি। বিকেল থেকে প্ল্যাটফর্মে বসেছিল বোধহয়। লোকজনের সন্দেহ হয়। বেঁচে গেছে। কী হত শিবাম্মা, যদি সুইসাইড করত?"

"তুই কিছু জিজ্ঞেস করেছিলি?"

"না। দিদার শ্রাদ্ধে বোধহয় একবার আমাকে দেখেছিল। প্ল্যাটফর্মে আমাকে দেখেই বলল, "জোজো, এই লোকগুলো তখন থেকে আমাকে বিরক্ত করছে। পুলিশ ডাকতে গেছে। তুমি আমাকে নিয়ে চলো ভাই। তখন আমি রিকশায় এখানে নিয়ে এলাম। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে তারপর হিয়া মাসির বাড়িতে যাব।"

"ভাল করেছিস। সোজা খাটোরায় যাসনি। এই অবস্থায় নিয়ে গেলে জানাজানি হয়ে যেত।"

চুপ করে বসে রইলাম। কী হত, যদি জোজো আজ প্রীতমের বাড়ি না যেত? আমাদের এদিকে বড়গাছিয়া লাইনে লোকে ট্রেনে খুব কমই যাতায়াত করে। সকাল-বিকেল মিলিয়ে গোটা ছয়েক ট্রেন। মাকড়দা, ডোমজুড়, ডোমজুড় হল্ট স্টেশনগুলোতে সারাদিন লোক থাকে না বললেই চলে। আগে ঘুরতে ঘুরতে কয়েকবার স্টেশনের দিকে গিয়ে মনে হয়েছে ভুতুড়ে জায়গা। দু'পাশে ঘন জঙ্গল। সুইসাইড করার আদর্শ জায়গা। মাঝেমধ্যেই শুনতাম, ট্রেনে কাটা পড়েছে। সুইসাইড করেছে। একবার মাকড়দার একটা ছেলে আর একটা মেয়ে এক সঙ্গে আত্মহত্যা করেছিল। সেই ঘটনা নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল। আজ হয়তো কেয়াদির ছিন্নভিন্ন লাশ পড়ে থাকত মাকড়দা স্টেশনের কোনও জায়গায়। কথাটা ভাবতেই শিউরে উঠলাম।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে কেয়াদি ফিরে এল। মুখ-চোখ এখন অনেক ভদ্রস্থ লাগছে। প্রথম যে দিন কেয়াদিকে দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল এমন নিখুঁত সুন্দরী আর হয় না। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই কেমন যেন চাপা পড়ে গেছে সেই সৌন্দর্য। এই অবস্থার জন্য সুব্রতদাই দায়ী। ফের চিনচিনে একটা রাগ হতে লাগল। কিন্তু সেটা প্রকাশ হতে দিলাম না। হেসে বললাম, "আমার খুব খিদে পেয়ে গেছে কেয়াদি। এসো, ভাগাভাগি করে খাওয়া যাক।"

ভেবেছিলাম কেয়াদি কিছু মুখে দেবে না। কিন্তু দিব্যি খেতে লাগল। জোজো নানা

মজার মজার কথা বলছে প্রীতমকে নিয়ে। শুনে আমিও হো হো করে হাসছি। দু'দিন হল, জোজো এখানে এসেছে। বেশ ভাল মেজাজে আছে। আমার সঙ্গে মাঝেমধ্যে ফ্যাক্টরিতেও যাচ্ছে। একবার বলেও ফেলেছে, "শিবাম্মা, আমিও কিন্তু তোমার মতো পারফিউম নিয়ে পড়াশুনো করব।" আমার অবশ্য ইচ্ছে, ও কসমেটিক্স নিয়ে পড়াশুনা করতে ইসিপকায় যাক। যা খরচ লাগে আমি দেব। দিদির উপর আমার প্রচণ্ড রাগ। কিন্তু জোজোর কথা আলাদা। ওকে আমার দিদির ছেলে বলে মনেই হয় না।

জোজো বলছে, "জানো কেয়া মাসি, প্রীতমটা এমন সাদাসিধে, মাঝে মাঝে মনে হয় ওর শরীরের টপ ফ্লোরটা একদম খালি। একদিন ওকে কে এসে বলল, এই তোকে মহারাজ ডাকছে। কোনও কিছু চিন্তা ভাবনা না করেই ও মহারাজের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কখন উনি ডাকবেন সেই আশায়। পুরো দুপুরটা ও দাঁড়িয়েই থাকল। মহারাজের চোখে পড়ে যাওয়ায় সে কী বকুনি।"

বলেই জোজো হাসতে শুরু করল। কেয়াদিও হাসতে হাসতে বলল, "এই প্রীতমটাকে একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাস তো।"

বাড়ির কথা মনে হতেই বোধহয় কেয়াদির টনক নড়ল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "এই শিবাশিস, আমাকে একটু পৌঁছে দেবে?"

"চলুন।"

গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বের করলাম। সুস্থ অবস্থায় কেয়াদিকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, এটাই বড় কথা। যদি সত্যিই ওই বোকামিটা করত, তা হলে হিয়াদের পরিবারটা আজ দুমড়ে মুচড়ে যেত। ধাক্কাটা সুপ্রতিমবাবু সামলে উঠতে পারতেন না। সারা জীবন হয়তো উনি সুব্রতদাকে দোষ দিতেন। সেই সঙ্গে আমাকেও। আমি ওঁর চোখে খারাপ হয়ে যেতাম বরাবরের মতো।

হড়ের পোলের কাছে গাড়ি পৌঁছতেই কেয়াদি হঠাৎ প্রশ্ন করল, "তোমার সুব্রতদা কেমন আছে শিবাশিস?"

প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠলাম। কেয়াদি যে সরাসরি প্রশ্নটা করবে, ভাবতে পারিনি। বললাম, "জানি না। আমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। আপনি যদি চান, আজই খোঁজ নিতে পারি।"

"না। আমার চাওয়া সব শেষ হয়ে গেছে। আমি ক্যাজুয়ালি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম।" বলেই একদম চুপ করে গেল কেয়াদি। গাড়ি খাটোরা পৌঁছনো পর্যন্ত আর কোনও কথা বলল না। বাড়ির সামনে গাড়ি থামানোর পর আমাকে ভেতরে যেতেও বলল না। দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। একবার ভাবলাম, ফিরে যাই। তারপর কী মনে হওয়াতে ভেতরে ঢুকলাম।

ড্রয়িং রুমে সুপ্রতিমবাবু বসে। আমাকে দেখেই বললেন, "কেয়া কি এতক্ষণ তোমাদের ওখানে ছিল? আমরা তো বাবা, চিন্তায় মরছি। বিকেল থেকেই মেয়েটা উধাও। কাজের মেয়েটাকে এ বাড়ি সে বাড়ি পাঠালাম। কোথাও ছিল না। কখন গেছিল তোমাদের বাড়ি?"

"অনেকক্ষণ মেসোমশাই। এতক্ষণ আমি, জোজো আর কেয়াদি গল্প করছিলাম। খাওয়া-দাওয়া করলাম।"

সুপ্রতিমবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, "মেয়েটা তো খাওয়া-দাওয়া সব ছেড়ে দিয়েছে। সুব্রতটার কাণ্ড শুনেছ বোধহয়।" দরজার সামনে হিয়া দাঁড়িয়ে। ওর মুখটা গম্ভীর। আমি তাকানো সত্ত্বেও ওর মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া লক্ষ করলাম না। হঠাৎ মনে হল, মাঝে ও অনেক দিন ফোন করেনি। হঠাৎই যেন নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল হিয়া। ওর সঙ্গে আজই একবার আলাদা কথা বলতে হবে। ওকে ছাড়া আমি অন্য কোনও মেয়েকে ভাবতেই পারি না।

সুপ্রতিমবাবু অত্যন্ত ভদ্রলোক। সুব্রতদা সম্পর্কে কোনও খারাপ মন্তব্য করলেন না। কিন্তু সামান্য একটা কথাতেই বুঝিয়ে দিলেন উনি মানসিক অশান্তির মধ্যে আছেন। এখান থেকে সুব্রতদাকে একবার ফোন করলে কেমন হয়? ওকে এখন অফিসে পাওয়া যাবে। কথাটা মনে হতেই বললাম, "মেসোমশাই, আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়েছে। সুব্রতদাকে ফোন করে দেখব?"

সুপ্রতিমবাবুর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "এখন করবে? তা হলে আমিও একবার কথা বলে দেখতে পারি। ওর তো কোনও ক্ষতি করিনি বাবা। তা হলে কেন আত্মীয়স্বজনের কাছে ও আমাকে এত ছোট করে দিল?"

"সুব্রতদার ফোন নম্বরটা আপনাদের কাছে আছে?"

"আছে বই কী। হিয়া মা, নম্বরটা এনে দাও তো।"

হিয়া এক টুকরো কাগজে নম্বরটা লিখে আমার দিকে এগিয়ে দিয়েই ভেতরে চলে গেল। ডায়াল করার সময় আমার বুকটা একবার কেঁপে উঠল। লাইনে যদি সুব্রতদাকে পাওয়া যায়, তা হলেও আজকের ঘটনা আমি বলতে পারব না। সুপ্রতিমবাবু আর হিয়ার সামনে কী করে বলব, কেয়াদি আজ মরতে গিয়েছিল? মনে মনে প্রার্থনা করলাম, সুব্রতদা যেন এই সময় অফিসে না থাকে। অথবা যেন লাইনটাই না পাই।

আশ্চর্য, একবার ডায়াল করতেই লাইনটা পেয়ে গেলাম। ও প্রান্তে ফরাসি ভাষায় এক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "কাকে চাই?"

ফরাসিতেই উত্তর দিলাম। দু'তিন সেকেন্ডের মধ্যেই সুব্রতদার গলা শুনতে পেলাম, "কি এস্ কি পার্ল?" (কে বলছেন?)

আড়চোখে দেখলাম, সুপ্রতিমবাবু উদগ্রীব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে। বাংলায় না বলে ফরাসিতেই বললাম, "আমি শিবা। রাতের দিকে একবার ফোন করবে? জরুরি দরকার।"

ও দিক থেকে সুব্রতদা বলল, "এই হতভাগা। তোর কী হল রে। আমার সঙ্গেও ফরাসিতে বলছিস। ভাষাটা ঝালাই করে নিচ্ছিস নাকি?"

"শোনো বেশি কথা বলার সময় নেই। তুমি কেয়াদির সঙ্গে যোগাযোগ করছ না কেন?"

"কী বলব বল। সেই আলজিরিয়ান পেট্রিটা..... ফতেমা আবার ঘাড়ে এসে

জুটেছে। বলছে, মাস দু'য়েক পরেই আমেরিকায় চলে যাবে। তখন আমি ফ্রি। কেমন আছে কেয়া?"

"ভাল না। আজ ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দিতে গেছিল।"

"মাই গড। আচ্ছা প্রবলেমে পড়া গেল তো। বাঙালি মেয়েদের নিয়ে এই এক সমস্যা। এত ন্যাকামির কী আছে। এই দ্যাখ না, আলজিরিয়ান পেট্রিটাকে ভাল লাগছে না। ওকে বললাম। চলে যাচ্ছে। কোনও ঝামেলা নেই তা, তুই ফরাসিতে কথা বলছিস কেন? ডোমজুড়ে কি আজকাল খুব ফরাসি চর্চা চলছে?"

বলেই সুব্রতদা হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল। শুনে আমার গা পিত্তি জ্বলে গেল। বেশ কড়া গলায় বললাম, "তোমার লজ্জা করে না? এখানে এত বাড়াবাড়ি করে গেলে। তোমার জন্য আমি এদের কাছে ছোট হয়ে গেলাম।"

"তুই এক কাজ কর শিবা। ও বাড়িতে মহৎ হওয়ার জন্য তুই হিয়াকে বিয়ে করে ফ্যাল। ব্যস।"

"ছিঃ। বলতে তোমার লজ্জা করল না? সুপ্রতিমবাবুকে কী বলব আমি?"

"বল, মাস দু'য়েক অপেক্ষা করতে। ডিসেম্বরে আমি ইন্ডিয়ায় যাচ্ছি। একেবারে বর সেজে যাব। পাত্তর হিসেবে তো আমি মন্দ না। তুই না পারিস, কেয়াকে আমিই সাজিয়ে গুছিয়ে বলে দেব।"

"আজই তুমি কেয়াদির সঙ্গে কথা বলে নেবে। বলবে, তুমি এতদিন অসুস্থ ছিলে। যদি না বলো, তোমাদের সঙ্গে কোনওদিন আর সম্পর্ক রাখব না। ছাড়ছি।"

বলেই আমি লাইনটা কেটে দিলাম। সুপ্রতিমবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। আমার সারা শরীর জ্বলছে। কয়েকটা সেকেন্ড সময় নিলাম। কী বলব তা গুছিয়ে নিতে। ভাগ্যিস, কথাগুলো ফরাসিতে বলছিলাম। এঁরা বুঝতে পারলেন না। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে নিলাম। দরজার দিকে চোখ যেতেই দেখি, মাসিমার পিঠে মুখ রেখে হিয়া দাঁড়িয়ে। ওর মুখটা থমথম করছে।

সুপ্রতিমবাবু বললেন, "সুব্রত কি অফিসে নেই বাবা?"

বললাম, "না। হসপিটালে?"

মাসিমা বলে উঠলেন, "কী হয়েছে সুব্রতর?"

"বিচ্ছিরি ধরনের জন্ডিস মাসিমা। প্রায় মাস দেড়েক হাসপাতালে শুয়ে আছে। বোধহয় কলকাতা থেকে জার্মটা নিয়ে গেছে।"

মিথ্যে কথা আমি বলতে পারি না। তবু অনায়াসে বলে যাচ্ছি। হিয়া বড় বড় চোখে আমাকে দেখছে। মাসিমা বলে উঠলেন, "তাই বলি, সুব্রত তো খারাপ ছেলে না। হিয়াকে একদিন বলেওছি, নিশ্চয়ই ওর কোনও অসুখ করেছে। বিদেশ-বিভূঁইয়ে কোথাও পড়ে আছে। তা বাবা, ও এখন আছে কেমন?"

"ভাল-র দিকে। এখনও হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে মাস দু'য়েক লাগবে।" কথাটা বলার পর হিয়ার দিকে চোখ গেল। ওর চোখে অবিশ্বাস। চোখাচোখি হতে ও মুখ নিচু করে নিল। ওর বডি ল্যাঙ্গয়েজই বলে দিচ্ছে মাসিমা-মেসোমশাইকে আমি ঠকাচ্ছি এবং ও সেটা বুঝে গেছে। কিন্তু মাসিমারা কি সহ্য করতে পারতেন, যদি

সত্যি কথাগুলো আজ বলতাম? এই যে ওঁদের মুখে এখন স্বস্তির ছাপ, সেটা থাকত? যদি সুব্রতদার কথাগুলো ওঁদের কানে যেত? মাসিমা বলছেন, "রোজ আমি লোকনাথবাবাকে ডাকি, কেয়ার মুখের দিকে একটু তাকাও বাবা। আমার প্রার্থনা, মিথ্যে হতে পারে না।"

মিনিট খানেক পরই উঠে পড়লাম। গাড়িতে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গেই নীচে রাস্তায় নেমে এল হিয়া। একবার পিছন দিকে তাকিয়ে, তারপর বলল, "মা আর বাবাকে আপনি কেন মিথ্যে কথাগুলো আজ বলে গেলেন শিবাশিসদা? আপনার কাছ থেকে এটা আমি আশা করিনি। ছিঃ।"

শেষের শব্দটাই আমাকে মাটিতে মিশিয়ে দিল। শূন্য দৃষ্টিতে হিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওর চোখ জ্বলছে। কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে ও বলল, "সুব্রতদার সঙ্গে আপনার সব কথা আমি প্যারালাল লাইনে শুনেছি। পুরুষ জাতের উপর ঘেন্না হচ্ছে। তবে দিদিকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি জানি, দিদি ফেরার জন্য আজ বাড়ি থেকে বেরোয়নি। কলকাতা থেকে ফিরেই বালিশের নীচে ওর সুইসাইড নোট-টা আমি পেয়েছিলাম।"

কথাগুলো বলেই কান্না চাপতে চাপতে হিয়া দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

॥ পনেরো ॥

কারখানায় ইলেকট্রিক নিয়ে যে এত সমস্যায় পড়তে হবে, জানতাম না। ছোটকার আমলে লাগত দশ কিলোওয়াট। এত কম বিদ্যুতে তো এখন চলবে না। আমি চেয়েছিলাম তিরিশ কিলো ওয়াট। একটা বাড়ি পুরো এয়ার কন্ডিশনড হবে। সেই সঙ্গে গুদামের একাংশও। যেখানে একেবারে তৈরি বোতলগুলো রাখা হবে। পারফিউমের বোতল ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা উচিত। এই তথ্যটা অনেকে জানে না। তা, সেই ইলেকট্রিক কানেকশনের জন্য মাসখানেক স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের অফিসে ঘুরেও মিত্তির কাকা কোনও ব্যবস্থা করতে পারলেন না। একদিন বলে, ইন্সপেকশন করতে লোক যাবে। অন্যদিন বলে, আপনাদের ওখানে ট্রান্সফর্মার বসাতে হবে। এক একদিন এক এক রকম কথা।

শেষে একদিন বিরক্ত হয়েই মিত্তির কাকা বললেন, "বাবা, তুমি নিজে একবার বিদ্যুৎ ভবনে যাও। বড় কর্তাদের সঙ্গে কথা বলো। আমাকে ফালতু ফালতু ওরা ঘোরাচ্ছে।"

কিছু টাকা পয়সা দিলেই সমস্যাটা মিটে যায়। অথচ মিত্তির কাকা দেবেন না। গোঁ ধরেছেন, "একটা পয়সাও ঘুস দেব না। দেখি হয় কি না।" মিত্তির কাকার বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। অন্য চরিত্রের মানুষ। কী করে বোঝাই, পশ্চিমবাংলায় ব্যবসা করতে হলে কিছু গুণাগার দিতে হবেই। কিছু করার নেই। ব্যবসা করতে নামার আগে মনে হত, এই সব হাত পাতা লোকগুলোর পাছায় তিনটে লাথি মারা উচিত। এখন মনে হয়, ফালতু ঝামেলা করে কী দরকার। অযথা দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মাঝে একদিন বোর্ডের অফিসে ফোন করেছিলাম। এক কর্তা ফোন ধরে বললেন, "আরে মশাই, ডোমেস্টিক লাইনেই সাপ্লাই দিতে পারছি না। এত ঘাটতি এখন। আর আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাসে চাইছেন? এত দেব কোত্থেকে?" কী উত্তর দেব? মনে হল ঠাস করে একটা চড় মারি। কিন্তু এই সব ব্যাপারে রাগ হলেই রমাপ্রসাদবাবুর একটা উপদেশ মনে পড়ে। "ইন্ডাস্ট্রি করতে নামছ। পদে পদে কতবার যে তোমাকে মাথা ঝোঁকাতে হবে, তুমি ভাবতেও পারবে না।" দীর্ঘদিন ট্রেড ইউনিয়ন করেছেন। রমাপ্রসাদবাবুর অনেক অভিজ্ঞতা। এখন দেখছি, উনি ঠিকই বলেছেন। ঝুঁকি নিয়ে আমি ফ্যাক্টরি খুলছি। অন্তত পঞ্চাশ-ষাটজন লোকের চাকরির ব্যবস্থা করছি। আরও কয়েক হাজার লোকের রোজগারের উপায় করে দিচ্ছি। তবুও প্রতি পদক্ষেপে আমাকে ফালতু লোকের কাছে মাথা নিচু করতে হবে। কেন?

এই সব কারণেই কেউ পশ্চিমবাংলায় বিনিয়োগ করতে আসে না। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে 'মউ' সই করে। কিন্তু ফ্যাক্টরির জন্য একটা ইটও গাঁথে না। এই যে কিছুদিন আগে লখার সঙ্গে এক চোট হয়ে গেল আমার, অন্য কোনও বিজনেসম্যান হলে ভয়েই আর ডোমজুড়ে ঢুকত না। লখা আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু চট করে বুঝে নেয়, সুবিধে করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত একটা সমঝোতা করে নেয়।

সেদিন লখার ডেরায় কথার শুরুতেই বিস্ময় ছিটকে বেরোচ্ছিল ওর চোখ-মুখ থেকে, "তুমি এই ফ্যাক্টরিটা নিয়েছ? তুমি তো এদিককার ছেলে!"

আমিও চোখে চোখ রেখে বলেছিলাম, "এত অবাক হওয়ার কী আছে। ওই ফ্যাক্টরিটা আমার বাপ-ঠাকুর্দার।"

"জি ট্যাক্স না দিয়ে, ফ্যাক্টরিটা তো খুলতে পারবে না ভাই।"

"তার মানে?"

"গুণ্ডা ট্যাক্স। শোনোনি কখনও?"

"দরকার হয়নি। প্রথমেই জানিয়ে রাখি, জি ট্যাক্স দেওয়ার লোক আমি নই।"

"তা হলে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমার স্ট্রেংথ সম্পর্কে বোধহয় তোমার কোনও আইডিয়া নেই।"

হেসে বললাম, "কিন্তু আমার স্ট্রেংথ সম্পর্কে তো তোমার একটা আইডিয়া থাকা উচিত। মাকড়দার বাজারে সেদিন অবশ্য আমি পুরো স্ট্রেংথ দেখাইনি।"

কথাটা শুনে মুখ লাল হয়ে গেল লখার। বলল, "ঠিক আছে, পরে কিছু ঘটে গেলে, আমায় কিন্তু দোষ দিও না।"

পিছন থেকে হেলমেট হাতে ছেলেটা এই সময় বলে উঠেছিল, "লখাদা, শালাকে নামিয়ে দেব নাকি?"

ঘুরে তাকিয়ে আমি ধমক দিয়েছিলাম, "এই, ভদ্রভাবে কথা বলো।"

ছেলেটা জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। কতই বা বয়স। বাইশ-তেইশ। উঠতি মস্তান, সেজন্যই বোধহয় রক্ত এখন গরম। ছেলেটা আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে লখার দিকে তাকিয়ে বোধহয় বুঝতে পারল, সুবিধা হবে না। চোখ সরিয়ে

নিল।

বললাম, "শোনো লখা, আমার সঙ্গে লড়াই করে তোমার কোনও লাভ হবে না। ডোমজুড় আর মাকড়দার বহু পরিবার এই ফ্যাক্টরির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওদের মুখের অন্ন তুমি যদি কেড়ে নিতে চাও, তা হলে পার পাবে না। গঙ্গার ওপারেও তোমাকে আমি তাড়া করব।"

লখা বলল, "ঢোলকিয়া কিন্তু আমার পার্টির ছ'জনকে চাকরি দেবে বলেছিল।"

ওহ্ সুজিত ঢোলকিয়াকেও তা হলে এরা তুলে এনেছিল! বললাম, "ঢোলকিয়া কিন্তু আমার সঙ্গে পারেনি। তুমি একজাক্টলি কী চাও বলো তো?

"বললাম তো, আমার কয়েকটা ছেলেকে চাকরি দিতে হবে। লোকাল ছেলেদের যদি তোমরা না দেখো, এরাই বা কী করবে?"

লখার সুর অনেক নরম দেখে বলেছিলাম, "ঠিক আছে, তোমার কথা ভেবে দেখব। লেখাপড়া জানে, এমন চার-পাঁচটা ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। নিজে কথা বলে যদি উপযুক্ত মনে হয়, নেব। আপাতত, বড় রাস্তায় আমাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে বলো।"

"আরেকটা কথা, সামনেই পঞ্চায়েত ইলেকশন। আমি ক্যান্ডিডেট হয়ে দাঁড়াচ্ছি। ভোটের সময় কিন্তু হেলপ করতে হবে।"

"দেখা যাবে।"

বলেই সেদিন লখার ডেরা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। ওই দিনের পর অন্তত বার পাঁচেক লখা আমাকে ফোন করেছে। গলার স্বরই ওর এখন পাল্টে গেছে। ফ্যাক্টরির মেরামতির জন্য এক ট্রাক সিমেন্ট আসছিল দিন কয়েক আগে। মাকড়দা বাজারের বাঁকে দু'তিনটে ছেলে বোধহয় ট্রাক আটকে টাকা পয়সা চেয়েছিল। লখার ছেলেদের হাতে ওরা এমন মার খেয়েছে, আর এ মুখোই হয়নি।

কারখানা খোলার চেষ্টা না করলে আমার অনেক অভিজ্ঞতাই হত না। লখা নিজে একদিন গন্ধপুরে এসে আমাকে বলল, "মাকড়দার বাচ্চু দত্ত তোমার ফ্যাক্টরিতে নিজের কিছু ছেলেকে ঢোকাতে চাইছে। তুমি কিন্তু নেবে না।"

বৃষ্টির সন্ধ্যায় মাকড়দা বাজারে যে দিন জয়ন্ত কর্মকারকে লখা মারতে গিয়েছিল, সেদিন বাচ্চু দত্ত-ও ওর সঙ্গে ছিল। এখন দু'জনে আলাদা পার্টিতে। সে দিন বোধহয় স্রেফ মাস্তান ছিল। এখন জনপ্রতিনিধিও দু'একজনেই সাম্রাজ্য বাড়ানোর কথা ভাবছে। একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "ওর ছেলেরাও তো লোকাল ছেলে।"

লখা বলেছিল, "ওর ছেলেদের নিলে, পরে কিন্তু তোমাকে ট্রাবল দেবে।"

"কীভাবে?"

"লেবারদের মধ্যে দল পাকাবে। ওদের পার্টিকে তো জানোই। তোমার ফ্যাক্টরি স্মুথলি চলতে দেবে না।"

কথাগুলো শুনে সে দিন হাসতেও ভুলে গেছিলাম। ফ্যাক্টরিই চালু হল না। অথচ এখন থেকে শ্রমিক অশান্তির চিন্তা। পশ্চিমবাংলাতেই এটা সম্ভব। কোথায় উৎপাদন

বাড়ানোর কথা ভাববো তা না ভেবে নিজেদের দল বাড়ানোর চিন্তা! অভিজ্ঞতা আমারও ব... জানে না, বাচ্চুর তিনটে ছেলেকে আমি চাকরি দিচ্ছি। দু'টো দলকেই আমার হাতে রাখতে হবে। দু'দলকে মারার জন্য।

ফ্যাক্টরিতে মিটার চুরি হয়ে গেছে। আলো-পাখার ব্যবস্থা নেই। দিনের বেলায় তিন-চার ঘণ্টার বেশি থাকা যাচ্ছে না। রাস্তার ওপাশ থেকে একটা লাইন টেনে এনেছেন মিত্তির কাকা। উল্টো দিকের এক ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে। একটা ঘরে পাখার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে বসেই আপাতত কাজ চালাচ্ছি। ভদ্রলোক নিজে মুড়ির ব্যবসা করেন। বেশ অবস্থাপন্ন। ইলেকট্রিকের লাইন দেওয়ার সময় উনি কথা আদায় করে গিয়েছেন, ওঁর বেকার শালাকে একটা চাকরি দিতে হবে।

পার্বতীপুরে, আমাদের গ্রামে অবশ্য আমার কোনও সমস্যা নেই। কেউ এসে বিরক্ত করে না। অনেকেই আমাদের জ্ঞাতি। তাঁদের সঙ্গে খুব একটা সম্পর্ক নেই আমার। অনেকেরই অ্যালুমিনিয়াম গয়না তৈরির ব্যবসা। কেউ কেউ বেশ স্বচ্ছল। ছেলে স্কুল থেকে বেরলেই বাবা হাতের কাজ শিখিয়ে দেয়। চাকরি করার কথা ভাবেই না। পাড়ার মিলন সংঘের ছেলেদের মধ্যে মাত্র একজনই একদিন আমার কাছে এসেছিল। ছেলেটা অফিসের স্টেশনারি সাপ্লাইয়ের কাজ করে। খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিল, "যদি আমাকে কিছু কাজ দেন, ব্যবসাটাকে দাঁড় করাতে পারি।"

চাকরি চাইবার লোক অনেক। কিন্তু কাজ করার লোক পেলে হয়। ব্যবসা করতে নেমে দেখছি, ওয়ার্ক কালচারটাই নষ্ট হয়ে গেছে। সামান্য সামান্য কাজ। একদিনে হয়ে যাওয়া উচিত। তা এগোতেই পাঁচদিন লেগে যাচ্ছে। জলের সাপ্লাই বাড়ানোর জন্য লিখেছিলাম পঞ্চায়েতের কাছে। শুধু একটা পাইপ বদলানোর কাজ। একমাসেও সেই পাইপ বদলানো গেল না। উল্টোদিকে, শিশি-বোতলের জন্য একটা চিঠি লিখেছিলাম মুম্বইয়ের মহারাষ্ট্র গ্লাস ফ্যাক্টরিতে। ওরা আমাদের ডিজাইন দেখে পারফিউমের বোতল তৈরি করে দেবে। এক আধটা বোতল তো নয়, বিভিন্ন সাইজের কয়েক লাখ বোতল। ব্যবসার গন্ধ পেয়ে ওরা তিনদিনের মধ্যে সেই চিঠির উত্তর দিয়েছে। শুধু তাই নয়, লিখেছে, এক সপ্তাহের মধ্যে কোম্পানির একজনকে আমার কাছে পাঠাচ্ছে বিশদ কথা বলতে। ওদের আগ্রহ দেখে অবাক হয়ে গেছি। একটা সময় গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিতে বাংলা অন্য রাজ্যগুলো থেকে অনেক এগিয়েছিল। এখন আমাদের মহারাষ্ট্রের কাছে ছুটতে হচ্ছে। এই কোম্পানিটা ডাচ টেকনোলজি নিয়েছে। চুটিয়ে ব্যবসা করছে এখন সারা ভারত জুড়ে। এই কাজটাই তো আমি দিতে পারতাম যাদবপুরের কৃষ্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরিকে। কোথায় গেল নামী এই কোম্পানি?

মহারাষ্ট্রের গ্লাস কোম্পানিকে একটা উত্তর দেওয়া দরকার। চিঠির খসড়া করে কোচাইকে পাঠিয়েছি ডোমজুড় বাজারে টাইপ করানোর জন্য। এমন সময় দিদির ফোন, "ভাই, তুই কি আমাদের পথে বসাবি?"

আজকাল দিদির মুখে ভাই ডাকটা শুনলে প্রচণ্ড রাগ হয়। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "কী বলতে চাস, সাফ সাফ বল, আমার সময় নেই।"

" তুই শোভাবাজারের বাড়িটার জন্য উকিলের চিঠি পাঠিয়েছিস?"

"হ্যাঁ। যত তাড়াতাড়ি পারিস বাড়িটা খালি করে দে।"

"এই বাড়ি ছাড়লে আমরা কোথায় যাব, বল।"

"দীপেনদাকে জিজ্ঞেস কর। বিয়ে করার সময় মনে ছিল না?"

"ওর মুরোদ তো জানিস। জীবনে কিছুই করতে পারল না।"

"তার মানে? ফড়েপুকুরের কাছে দীপেনদা যে ফ্ল্যাটটা কিনেছে, সেখানে উঠে যা।"

"ওটা তো ভাড়া দেওয়া আছে।"

"তুলে দে। শোভাবাজারের বাড়িটা আমি বিক্রি করে দিচ্ছি। আমার এখন টাকার দরকার।"

"মা তো প্রচুর রেখে গেছে। সেখান থেকে খরচ কর। আইনত, আমারও তো সম্পত্তির একটা অংশ পাওনা।"

"তোকে মা কিছু দিয়ে যায়নি। আগেও দু'একবার বলেছি।"

"এই অপকর্মটা তো তুই করে রেখেছিস। তাই মা মারা যাওয়ার পর খবরটা পর্যন্ত আমায় দিসনি। আমি মিলির মুখে খবরটা পেয়েছিলাম।"

দিদি বুঝে গেছে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। তাই এখন নখওয়ালা আঙুলটা বাঁকিয়ে ধরছে। এসব কথার পাত্তা দেওয়ারই দরকার নেই। তাই বললাম, "তোকে খবর দিতে প্রবৃত্তি হয়নি। আমাকে ঘাটাস না দিদি। মুশকিলে পড়ে যাবি।"

দিদি হিসহিস করে বলল, "কী ভয় দেখাচ্ছিস? দেশ থেকে কি আইন উঠে গেছে? আমিও কোর্টে যাব। দেখি তুই কী করে আমাকে উৎখাত করিস।"

"তোর ইচ্ছে। তবে শোন, তোকে একটা খবর দিয়ে রাখি। দীপেনদা খুব শিগগির অ্যারেস্ট হবে। আগে ঘর সামলা। তারপর আমার পিছনে লাগিস।"

"অ্যারেস্ট হবে মানে? তুই কি অ্যারেস্ট করাবি নাকি?"

"আমি এসব তুচ্ছ কাজে যাই না। কথাটা বলে রাখলাম। পরে বলিস না, আমি সাবধান করিনি।"

"তোর দীপেনদা কী এমন অপরাধ করেছে, বল।"

"শুনতে চাইছিস যখন, বলি। চাকরি করে দেওয়ার নাম করে দীপেনদা কয়েকটা ছেলের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা নিয়েছিল। চাকরি দিতে পারেনি। একজন পুলিশের কাছে কমপ্লেন করেছে। প্রতারণার অভিযোগ, বুঝলি? তুই জানিস না, তা হতে পারে না। তোর জন্যই লোকটার গায়ে চিটিংবাজের লেবেল লেগে গেল।"

"মিথ্যে কথা।"

"একদম না। তোর আবদার আর বড়লোকি চাল মেটাতে গিয়ে লোকটার এই অবস্থা। যাক গে, এটা তোর প্রবলেম। আমাকে এর মধ্যে টানিসনা।"

"দীপেনদার নামে ফালতু বদনাম দিচ্ছিস। শিবা, ভগবান আছেন। তোর কিন্তু ভাল হবে না।"

"ফালতু কথা রাখ। বাড়িটা কবে খালি করে দিচ্ছিস, বল। না হলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।"

"কী ব্যবস্থা তুই করবি?"

"প্রথমে থানা-পুলিশ করব। তারপর হাত কাটা ঝন্টুকে লাগিয়ে দেব।"

"আমাদের পিছনে তুই গুণ্ডা লাগাবি? এত নীচে নেমে গেছিস?"

"তোর সঙ্গে তো এর চেয়ে ভাল ব্যবহার করা সম্ভব না। তুই এত লোভী আর ব্যাড ক্যারেকটার ..... তোকে দিদি বলতেও আমার লজ্জা হয়।"

"তার মানে?"

"বুঝতে পারিসনি? বলি তা হলে? নিখিল দেব নামে একটা লোকের সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক আমি জানি না ভেবেছিস? ডোমজুড়ে আসার নাম করে, দীপেনদাকে মিথ্যে কথা বলে, লোকটার সঙ্গে তুই দু'দিনের জন্য দিঘায় স্ফূর্তি করতে যাসনি? কী রে বল, সত্যি কি না। দীপেনদা এখনও জানে না। তুই যদি বেগড়বাই করিস, তা হলে কিন্তু দীপেনদাকে তো বটেই, জোজোর কানেও তুলে দেব।"

ও প্রান্তে দিদি চুপ করে আছে। বোধহয় ধাক্কা সামলাচ্ছে। নিশ্চয়ই আবাক হয়ে গেছে, শিবা এত সব খবর জানল কীভাবে? মা মারা যাওয়ার পরই ভেবে রেখেছিলাম, দিদিকে একটা ঝাপটা দেব। কালুয়ার এক চ্যালাকে দিদির পিছনে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ছেলেটা শোভাবাজারের। সে দিনই আমার মাথা গরম হয়ে গেছিল, যে দিন শুনলাম, কারখানার ভাগ নেওয়ার জন্য দিদি উকিলের বাড়ি যাতায়াত করছে।

এরপর জোজোও একদিন একটা খবর এনে দিল। "শিবাম্মা, তোমার কস্তুরীদি তো শোভাবাজারের বাড়িটা বিক্রি করে, সেই টাকায় গোল পার্কে ফ্ল্যাট কেনার ব্যবস্থা করছে। মাঝে একদিন ও বাড়িতে ছিলাম। তখন এক মারোয়াড়ি বাড়িটা দেখতে এসেছিল। তেইশ লাখ টাকা দর দিয়েছে। তোমার দিদি আর কতদিন তোমাকে টুপি পরাবে, বলো তো?" দিদির ওপর জোজোর এমন রাগ, কখনও মা বলে ডাকে না। সেদিন জোজোকে বলেছিলাম, "আর বেশিদিন পারবে না।"

ও প্রান্তে দিদি চুপ করে আছে দেখে বললাম, "কী করবি, আমাকে জানিয়ে দিস তা হলে। মাসখানেক সময় দিচ্ছি। তার বেশি পারব না। আর হ্যাঁ, একটা খবর তোকে জানিয়ে রাখছি। আমার কোম্পানিতে ডিরেক্টর করে নিচ্ছি জোজোকে। তুই তো ওকে দেখবি না। ওর ভবিষ্যৎ আমাকেই দেখতে হবে। যাক, ছাড়ি তা হলে?"

দিদি বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল। আমি লাইনটা কেটে দিলাম। ওর অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি। একটা দাঁড়ি টেনে দেওয়ার দরকার হয়ে পড়ছিল। মা আর বাবা একটা সময় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ভাল স্কুলে পড়ত দিদি। ক্যালকাটা গার্লস। তখনই কোথাও আলাপ দীপেনদার সঙ্গে। স্কুল ফাঁকি দিয়ে দীপেনদার সঙ্গে দিদি ঘুরে বেড়াত। ক্লাস টেনে ফেল করল। একদিন ধর্মতলায় কোনও রেস্তোরাঁয় কেবিনের ভেতরে বসে বোধহয় দু'জনে দৃষ্টিকটু কিছু করছিল, মালিকের চোখে পড়ে। দিদির চেহারা দেখেই উনি বুঝতে পেরেছিলেন ভদ্রবাড়ির মেয়ে। তাই ফোন করে বাড়িতে সব জানান। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছিল বাবার।

দিদির সঙ্গে আমার প্রায় দশ বছরের তফাত। মায়ের মুখে শুনেছি, আমার যখন

এক বছর বয়স, তখন দিদি আমাকে একবার ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছিল খাট থেকে। মা-বাবার আদরে কেউ ভাগ বসাক, দিদি ওই বয়সেই সহ্য করতে পারেনি। বাবা তখন শোভাবাজারের বাড়িতে কম থাকত। মা একা দিদিকে সামলাতে পারত না। নিত্যি নতুন আবদার। দামি দামি সব জিনিসের ওপর দিদির লোভ। বাবা মারধর করত। কোনও ফল হত না। একদিন স্কুল থেকে ফিরে শুনলাম, দিদি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। মা বলল, "আপদ গেছে।" কিন্তু কিছু দিন পর দীপেনদাকে সঙ্গে নিয়ে দিদি বাড়ি আসতে শুরু করল। সুযোগ পেলেই চাপ দিয়ে মায়ের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে যেত।

বাবা অবশ্য জানতে পারত না। ডোমজুড়ে কারখানা নিয়ে ছোটকাকার সঙ্গে তখন প্রবল অশান্তি চলছে। কারখানা থেকে বেরিয়ে এসে বাবা নিজে কিছু করার কথা ভাবছে। আমাদের আত্মীয়রা বেশিরভাগ ছোটকাকার পক্ষে। ও সব নিয়ে বাবা এমন বিপর্যস্ত যে, আমাদের দেখার সময়ই পেত না। মাও জানাত না, শোভাবাজারে কী হচ্ছে। দিদি এমন স্বার্থপর, জোজো হওয়ার পরও নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করল না। জোজোকে মায়ের কাছে রেখে নিজে স্ফূর্তি করে বেড়াত। তখন থাকত আহিরিটোলায় একটা দু'কামরার ফ্ল্যাটে। জোজো আমাদের বাড়িতেই মানুষ। তাই আমাদের ওপর ওর এত টান।

দিদির ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার পর ড্রয়িং রুমে বসে পুরনো এই সব কথা ভাবছি। এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন ডাকল, "শিবা, বাড়িতে আছিস?"

গলা শুনে মনে হল অমিত খৈতান। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে দেখি, হ্যাঁ, অমিত। আগে কখনও ও এ বাড়িতে আসেনি। কয়েকদিন আগে একবার ফোন করেছিল। তখন আমি বাড়ির ডিরেকশন দিয়ে রেখেছিলাম। আজ বোধহয় বড়গাছিয়ার দিকে গেছিল। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ও বলল, "কী রে, বাড়িতে ঢুকতে বলবি না?"

বললাম, "আয়, ভেতরে আয়।"

আগের দিন অমিতকে ঝকঝকে লেগেছিল। আজ ওর মুখটা শুকনো। কিন্তু কথাবার্তায় তার কোনও চিহ্ন নেই। ঘরে ঢুকে বলল, "এইবার একটা বিয়ে-থা কর। আমাদের বাঙালিদের ঘরে মেয়েছেলে না থাকলে লক্ষ্মীশ্রী থাকে না বুঝলি?"

বললাম, "দাঁড়া আগে ব্যবসাটা দাঁড় করিয়ে নিই। তারপর ভাবা যাবে।"

"পছন্দ করে রেখেছিস নাকি?"

"রাখতেও পারি।"

"আরে শালা, বল না।"

"এখন না। তোর খবর বল।"

কথাটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল অমিত। তারপর বলল, "আমার খবর ভাল না রে। পিঙ্কিকে তো দেখেছিস তুই। আমার সেই বোনটা। শ্বশুর বাড়িতে মার্ডার হয়ে গেছে।"

"বলিস কী? কেন?"

"পণ। বাবা বিয়ে দিল মাল্লেয়াড়ি ফ্যামিলিতে। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে চাপ। টাকা নিয়ে এসো। প্রথম প্রথম দিতাম। দেখলাম, শালা আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিলাম। তারপর থেকেই শুরু হল অত্যাচার। বোনটা কিছু বলত না। মা একদিন ওর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সব বুঝে গেল। মা ওকে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। এল না। এই ক'দিন আগে শুনি, পাঁচতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বিশ্বাস হল না। পুলিশের কাছে গিয়ে কমপ্লেন করলাম। খবরের কাগজে ও নিয়ে খুব লেখালেখি হল। চোখে পড়েনি তোর খবরটা?"

মনে পড়ে গেল, আনন্দবাজারে কয়েক দিন আগে দেখেছি গৃহবধূ হত্যার খবরটা। পিঙ্কি জালান। কিন্তু সে যে অমিতেরই বোন, বুঝিনি। কলেজে পড়ার সময় যখন অমিতদের বাড়ি যেতাম, তখন মেয়েটাকে দেখেছি। ইস, এখনও পণের জন্য কাউকে মার্ডার করা হতে পারে ভাবা যায় না। এ তো বর্বরতা। বললাম, "কেসটা এখন কী অবস্থায় আছে?"

"পুলিশ পিঙ্কির হাজবেন্ড, শ্বশুর-শাশুড়িকে অ্যারেস্ট করেছে। এখনও বেল দেয়নি। তবে বুঝতেই তো পারছিস। এবার টাকা খাওয়াখাওয়ি হবে। যে পার্টি বেশি দেবে, পুলিশ তার দিকেই বেশি ঝুঁকবে। আমিও বলেছি, শালা ছাড়ব না। দরকার হলে একটা ফ্যাক্টরি বিক্রি করে দেব। তবুও ওদের শিক্ষা দেব। শালা, আমার বাঙালের গোঁ।"

"শুনে খারাপ লাগছে রে।"

"কী আর করা যাবে। ইট'স আ পার্ট অফ লাইফ। বাংলায় আমরা বলি না, জীবনের অঙ্গ, ঠিক তাই। যাক সে কথা, তোর কাছে এলাম কেন জানিস? সুধা, আমার বউ তোর কাছে পাঠাল।"

"কেন রে?"

"কিছুদিন আগে তোর পারফিউম নিয়ে সার্ভে করতে জনা তিনেক মেয়ে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবে গেছিল। সেই সময় সুধা ক্লাবে ছিল। আমার কাছে তোর গল্প অনেক শুনেছে। বুঝতে পেরেছিল। ও বলল, তোর পারফিউমটা নাকি দুর্দান্ত হয়েছে। মল্লিক বাড়ির মেয়ে তো। পারফিউম নিয়ে ও অনেক কিছু জানে। আমার শ্বশুর মশাইয়ের কাছে অনেক রেয়ার পারফিউম আছে। শ্বশুরমশাই তোর সঙ্গে কথা বলতে চান। সেই কারণেই এলাম।"

আগের দিন কথায় কথায় অমিত বলেছিল, ওর এক আত্মীয় পারফিউম বিজনেসে আছে। তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে। সেই প্রসঙ্গটা তুলতেই ওর মুখ থমথমে হয়ে গেল। একটু ইতস্তত করে ও বলল, "ওই শূয়ারের বাচ্চাটা কে জানিস? পিঙ্কির হাসবেন্ড। সুরেশ জালান।"

নামটা শুনেই আমি চমকে উঠলাম। এই সেই লোক, মঁসিয়ে বেনোনিল যাকে বিরাট একটা কনট্র্যাক্ট দিয়েছেন। মাথার মধ্যে একরাশ চিন্তা খেলে গেল। অমিতকে বললাম, "সুরেশ জালানকে তুই টাইট দিতে চাস?"

অমিত বলল, "চাই মানে? ওকে ধনে-প্রাণে মারার জন্য আমি শালা, সব কিছু

দিতে রাজি আছি।"

"তা হলে একটু বোস। খাওয়া-দাওয়া কর। ফোন করে সুধাকে বলে দে, ফিরতে একটু দেরি হবে।"

কলেজ লাইফে দেখতাম, নিজেকে বাঙালি প্রমাণ করার জন্য অমিত প্রাণপণ চেষ্টা করত। বাঙালি মেয়েও বিয়ে করেছে। পুরোপুরি বাঙালি করে তোলার জন্যই আজ ওকে বসতে বললাম।

॥ ষোলো ॥

সকালবেলায় জোজো এসে বলল, "শিবাম্মা, খবরটা শুনেছ?"

কাল বিকেলের ডাকে আসা চিঠিগুলো খুলে পড়ছিলাম। কাজ করতে করতেই বললাম, "কী খবর রে?"

"হিয়া মাসি মিস ক্যালকাটা হয়েছে।"

জোজো ভেবেছিল, খবরটা শুনে আমি খুব খুশি হব। খুঁটিয়ে সব জানতে চাইব। কিন্তু আমি চিঠি পড়তে লাগলাম। কয়েকদিন আগে খাটোরায় ফোন করেছিলাম। দরকারটা ছিল সুপ্রতিমবাবুর সঙ্গে। ফোনটা এসে ধরল হিয়া। গলা শুনেই বুঝতে পেরেছিল, আমি। তবু একটাও কথা না বলে ফোনটা রেখে দেয়। একটু পরে এসে কথা বললেন সুপ্রতিমবাবু। আসলে সেদিন আমি সাজিয়ে গুছিয়ে সুব্রতদা সম্পর্কে গল্পটা তৈরি করায় হিয়া আমার উপর প্রচণ্ড রেগে গেছে। রাগলেও আমার কিছু করার নেই।

ইদানীং জোজোর সঙ্গে হিয়ার প্রায়ই যোগাযোগ হয়, বুঝতে পারছি। ফোনে কথাবার্তা হয়। কলেজে দু'দিন ছুটি। শনি-রবি বাইক চালিয়ে জোজো ও বাড়িতে চলে আসে। মাঝেমধ্যে দেখি। আবার কখন উধাও হয়ে যায়। দু'এক বার হিয়ার হেলথ ক্লাব নিয়ে আমার কাছে উৎসাহ দেখিয়েছে। কিন্তু আমি তখন ইচ্ছে করেই ব্যস্ততার ভান করি। তাই হিয়ার প্রশংসা করতে গিয়েও জোজো চুপ করে যায়। একেক সময় আমার সন্দেহ হয়, জোজো বোধহয় আমাকে পরীক্ষা করছে। দেখতে চায়, ওর হিয়া মাসি সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহ আছে কি না। আমি ওর ফাঁদে পা দিতে চাই না।

"দারুণ কনটেস্ট হয়েছিল লাস্ট রাউন্ডে। বুঝলে শিবাম্মা। রীতা মেটা আর হিয়া মাসির মধ্যে। তারপর ....."

"তোর কলেজ ছুটি বুঝি?"

"না। আজ যেতে পারিনি। কাল রাতে কলকাতা থেকে ফিরতে এত দেরি হয়ে গেল, বেলুড় যেতে ইচ্ছে করল না। হিয়া মাসি আর আমি এক সঙ্গেই ফিরলাম। উফ্ দুর্দান্ত একটা এক্সপিরিয়েন্স হল। কাল রাতেই খবরটা দিতাম। এসে দেখলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।"

বললাম, "এই শোন, রাতে যদি কোনওদিন দেরি করে ফিরিস, ফোন করে

জানিয়ে দিবি। কার সঙ্গে মিশছিস, কোথায় যাচ্ছিস, তা জানার অধিকার আমার আছে।"

"এত খচে গেলে কেন শিবাম্মা?"

"লেখা পড়া ছেড়ে তুই পার্ক হোটেলে গিয়ে বিউটি কনটেস্ট দেখতে গেছিস। খচব না? ফিরে গিয়ে মিশনের মহারাজকে কী বলবি?"

"হিয়া মাসি বলেই গেলাম। আমাকে বলল, ফিরতে রাত হয়ে যাবে। জোজো তুইও আমার সঙ্গে চল। হিয়া মাসিটা এত ভাল, না করা যায়?"

"কীসে ফিরলি?"

"কেন হিয়া মাসিদের গাড়িতে। যা একটা ট্রফি পেয়েছে না, দারুণ। হেলথ ক্লাবে এনে আজ রাখবে। কাল রাতে তো অনেক ফটোগ্রাফার এসেছিল। আজ নিশ্চয়ই টিভি-তে দেখাবে।

"কাল সন্ধেবেলায় প্রীতম এসে তোর খোঁজ করে গেল।"

"এসেছিল নাকি? তা হলে তো একবার আজ ওদের বাড়িতে যেতে হয়। ইস, প্রীতমও আমাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু হিয়া মাসি নিতে চাইল না। আমার কোনও দোষ নেই।"

"আজ একবার ফ্যাক্টরিতে যাবি। কিছু কাগজ পত্রে সই করে আসবি। মিত্তির কাকার কাছে রাখা আছে।"

"কীসের কাগজপত্র গো শিবাম্মা।"

"তোকে আমি কোম্পানির একজন ডিরেক্টর করে নিচ্ছি। আজে-বাজে দিকে মন না দিয়ে নিজেকে তৈরি কর। গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরই তোকে আমি ভার্সেইতে পাঠাব।"

"তুমি যেখানে পড়াশুনো করেছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"আমাকে নেবে? আমার তো মতিগতির ঠিক নেই। এখন মনে হচ্ছে, যাব। আবার কাল মনে হতে পারে, দূর গিয়ে লাভ কী। জানো, টিভি-তে কার্গিলের যুদ্ধ দেখছি। আর পাহাড়গুলো আমায় টানছে। মনে হচ্ছে, আর্মিতে চলে গেলে ভাল হয়। ট্রেকিং করা যাবে। আবার দেশের জন্য কিছু করাও সম্ভব হবে। হিয়া মাসিকে সেদিন বললাম। কী বলল জানো? না বাবা, বললে তুমি চটে যাবে।"

জোজো ফের হিয়ার কথা তোলায় আমি চিঠি পড়তে শুরু করলাম। হিয়া মিস ক্যালকাটা হয়েছে। তাতে আমি খুশি। প্রচণ্ড খুশি। ওর একটা স্বপ্ন সফল হয়েছে। ভুলেশ্বরের মন্দিরে বসে ও কিন্তু বলেছিল, কিছু করে দেখাবে। বিউটি কনটেস্ট সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। অমিত খৈতানের মুখে সেদিন শুনলাম, ওর এক বন্ধুর কসমেটিক্স কোম্পানি নাকি মিস ক্যালকাটা কনটেস্ট স্পনসর করেছে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অমিতও একজন। তখনই কথায় কথায় ও বলেছিল, "তোর প্রোডাক্ট বাজারে ছাড়ার পরই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করিস। এরপর মিস বেঙ্গল কনটেস্ট হবে। ওটা স্পনসর করার কথা ভাব। ট্রিমেন্ডাস পাবলিসিটি পেয়ে যাবি।"

কথাটা মন্দ বলেনি অমিত।

আমার কাছ থেকে উৎসাহ না-পেয়ে জোজো উঠে গেল। ফের চিঠিতে মন দিলাম। কনৌজ থেকে এক ভদ্রলোক চিঠি লিখেছেন। নাম সুমিত ত্রিবেদী। লেটার হেড দেখে মনে হল, আতরের ব্যবসা করেন। ভদ্রলোককে আমি চিনি না। তা সত্ত্বেও, আমার ঠিকানা পেলেন কীভাবে? একটু অবাকই হলাম। চিঠিতে চোখ বোলানোর পরেই অবশ্য বিস্ময়টা কেটে গেল। মেছুয়া বাজারে মিত্রের দোকানে সুমিত ত্রিবেদী আতর সাপ্লাই করেন। গোলাপ, জুঁই আর চাঁপা ফুলের তেলও উনি পাঠান। আমার ঠিকানাটা উনি পেয়েছেন মিত্রের দোকান থেকে।

চিঠিতে ভদ্রলোক লিখেছেন, "মিত্রের মুখে শুনলাম, আপনি পারফিউম ফ্যাক্টরি নতুন করে খুলছেন। নিশ্চয়ই আপনার গোলাপ আর জুঁই নির্যাস দরকার হবে। আমার কোম্পানি বছরে ষাট কেজির মতো আতর তৈরি করে। এক তৃতীয়াংশ বিদেশে রপ্তানীও করে। এক কেজি আতরের দাম সাড়ে তিন লাখ টাকা। যদি প্রয়োজন মনে করেন, সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।" চিঠিটা পড়ে আলাদা সরিয়ে রাখলাম। সুমিত ত্রিবেদীকে উত্তর দিতে হবে। এজরা স্ট্রিটে গোলাপ বা জুঁই নির্যাস পাওয়া যায়। তবে দাম অনেক বেশি।

নির্যাসের দাম মাঝে এত বেড়ে গেছিল, কয়েকটা শৌখিন আইটেমে ব্যবহৃত হচ্ছিল বলে। যেমন পান মশালা। বছর পনেরো আগেও পান মশালার বিক্রি এতটা ছিল না। এখন অনেক কোম্পানি। ফুলের নির্যাসের নব্বই শতাংশই কিনে নিচ্ছিল এই কোম্পানিগুলো। কিন্তু ইদানীং এরা সমস্যায় পড়েছে। সরকার পান মশালার বিক্রি বন্ধ করে দিচ্ছে। তাই ফুলের নির্যাসের দাম কমে আসতে বাধ্য। এই যে ত্রিবেদী নিজে উদ্যোগ নিয়ে আমাকে চিঠি দিয়েছে, তা ওই আশঙ্কা থেকেই। পান মশালার বাজার পড়ে গেলে ত্রিবেদীর মতো লোকেরা বসে মাছি তাড়াবে।

চিঠির গোছায় হঠাৎ দেখলাম, একটা সুন্দর খামের ওপর লেখা "ফ্রম মিনিস্টার ইন চার্জ অফ ইন্ডাস্ট্রিস, গর্ভমেন্ট অফ অন্ধ্রপ্রদেশ।" তাড়াতাড়ি খামের মধ্যে থেকে চিঠিটা বের করে আনলাম। অন্ধ্রপ্রদেশের শিল্পমন্ত্রী পি বেঙ্কট রামালু চিঠিটা লিখেছেন। "প্রিয় শিবাশিস, আমাদের রাজ্যে আপনি একটা পারফিউম ফ্যাক্টরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠি। আপনি সত্বর আমাদের রাজ্যের শিল্প উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান এস নারায়ণস্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার আপনাকে সব রকম সুবিধা এবং সুযোগ দিতে প্রস্তুত। সেকেন্দ্রাবাদের কাছে ইল্লুরে আমরা নতুন শিল্পনগরী তৈরি করছি। সেখানে আপনার প্রয়োজনীয় জমি নামমাত্র মূল্যে আমরা দিতে রাজি। আশা করছি, আপনি দ্রুত উত্তর দেবেন।"

চিঠি পড়ে মনটা ভরে গেল। মাস দেড়েক আগে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু কলকাতায় এসে শিল্পপতিদের ডাক দিয়েছিলেন, অন্ধ্রপ্রদেশে চলুন। খবরের কাগজে পড়ে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। কুড়ি দিনের মধ্যে উত্তর এসে গেল। অথচ আমাদের রাজ্যে শিল্পোন্নয়ন পর্ষদে তিন মাস আগে একটা চিঠি দিয়েছি।

এখনও কোনও উ[illegible]নি। ডোমজুড়ের ফ্যাক্টরিটা হাতে না এলে, আজই হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতাম, বাংলা ছেড়ে চলে যাব। চিঠিটা আলাদা করে সরিয়ে রাখলাম। একটা উত্তর দিতে হবে।

হাতঘড়িতে দেখলাম, প্রায় দশটা। স্নান সেরে, খাওয়া-দাওয়া করে আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই কারখানায় যেতে হবে। ইন্টিরিয়র ডেকোরেশনের কাজ চলছে। সে সম্পর্কেই তদারকি দরকার। আমি একটা ঝকঝকে তকতকে কারখানা করতে চাইছি। লোকে শৌখিন জিনিস কিনতে এসে যেন কোম্পানি সম্পর্কে একটা ভাল ধারণা নিয়ে যায়। ফ্রান্সে থাকার সময় একবার গেরলাঁ কোম্পানিতে গেছিলাম। অনেকটা সেই ধরনেই ফ্যাক্টরিটা সাজাতে চাই। ইন্দ্রাণী দত্ত নামে এক ভদ্রমহিলা ডেকোরেশনের কাজটা করে দিচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, ও পারবে।

স্নান করে বেরোনোর পরই মিনু পিসি উপরে এসে বলল, "ছোট দাদাবাবু, রমেনবাবু এসেছে। তোমার জন্য বসে আছে।"

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে দেখি, শুধু রমেন নয়, সুস্মিতাও এসেছে। অনেক দিন পাত্তা নেই দু'জনের। সুস্মিতার পাশে রাখা একটা কিট ব্যাগ। ওকে দেখেই মনে হল, গুরুতর কিছু হয়েছে। দু'জনেই গম্ভীর। বললাম, "তোমার তো কোনও খবরই নেই রমেন। ব্যাপার কী? সেদিন লাইব্রেরিতে খোঁজ করলাম। ওরা বলল, জানে না।"

রমেন বলল, "শিবাশিসদা, সে দিন আপনি আমাকে একটা চাকরি দিতে চেয়েছিলেন। চাকরিটা আমি নিতে চাই।"

ওর গলার স্বরেই বুঝলাম, মানসিক অশান্তির মধ্যে আছে। না হলে সরাসরি কথাটা তুলত না। বললাম, "এমন কী ঘটল, হঠাৎ তুমি মত বদলালে?"

সুস্মিতার দিকে একবার তাকিয়ে রমেন বলল, "ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। আজ বারোটার সময় আমরা দু'জন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে যাচ্ছি। তার আগে আপনার সিদ্ধান্তটা শুনতে চাই।"

মনে মনে হাসলাম। কারখানার গেটে মারামারির দিনই বুঝেছিলাম, রমেনের সঙ্গে সুস্মিতার একটা সম্পর্ক আছে। রমেনের জন্য সুস্মিতা যেরকম উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, নিছক বন্ধুত্বের সম্পর্কে তা হয় না। হয়তো সেই পুরনো গল্প। সুস্মিতার বাবা-মা রমেনের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি নন। তাঁরা আরও ভাল পাত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ করছেন। সুস্মিতাকে বাড়িতে আটকে রেখেছিলেন। সুযোগ পেয়ে ও পালিয়ে এসেছে। রমেনকে বলেছে, আজই বিয়ে করতে হবে। এত সব জানার দরকার নেই। বললাম, "রমেন, শুধু তুমি নও। সুস্মিতাও যদি বেঙ্গল পারফিউমে চাকরি করতে চায়, আমি রাজি।"

কথাটা শুনেই সুস্মিতা হাত জড়িয়ে ধরল রমেনের। তারপর বলল, "উফ্ আপনি নিশ্চিন্ত করলেন আমাদের।"

"রেজিস্ট্রিটা কোথায় করবে?"

"আন্দুলে।"

"বোসো। এখানে চান খাওয়া-দাওয়া করে যাবে। তোমাদের দেখে ঝোড়ো কাক

মনে হচ্ছে।"

দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠল, "না, থাক।"

থামিয়ে দিয়ে বললাম, "তা হয় না রমেন। তোমাদের সঙ্গে আমি আন্দুলে যাব। এই সময়টায় তোমাদের পাশে না থাকলে আমার খুব খারাপ লাগবে।"

....বেলা এগারোটার সময় আমরা তিনজনে বেরোলাম। ডোমজুড় বাসস্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছতেই দেখি লেডিস কর্নার দোকানের গেটে দাঁড়িয়ে আছে হিয়া আর একটা মেয়ে। কাছাকাছি যেতেই রমেন বলল, "এক মিনিট দাঁড়াবেন শিবাশিসদা। হিয়াদিও আমাদের সঙ্গে যাবে।"

সঙ্গী মেয়েটা পিছনে উঠে সুস্মিতার পাশে গিয়ে বসল। উপায় নেই বলে হিয়াকে আমার পাশে এসে বসতে হল। স্পষ্টই বুঝলাম, সামনের সিটে বসতে ও চায়নি। ভ্রু কুঁচকে রয়েছে। তার মানে, মেয়েটার উপর বেশ চটে আছে। আমার ওপরও। সিটে বসে হিয়া একবারও আমার দিকে তাকাল না। বেশ সেজেগুজে এসেছে। আড়চোখে ওকে একবার দেখামাত্রই আমার দারুণ লাগল। এই দিনটার কথা আমি মাঝেমধ্যে ভাবি। পাশে বসিয়ে একশো মাইল স্পিডে গাড়ি ছুটিয়ে দেওয়ার কথা। এখন তা সম্ভব না।

গাড়ি স্টার্ট করার আগে আমি হিয়ার দিকে তাকিয়ে বললাম, "কনগ্রাচুলেশনস।"

"থ্যাঙ্কস।" বলেই হিয়া পিছনের দিকে তাকিয়ে হালকাভাবে বলল, "একটু সাজগোজ করে নিতে পারতি মিতা। বিচ্ছিরি লাগছে।"

সুস্মিতা কোনও উত্তর না দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'হিয়াদিকে কনগ্রাচুলেশনসটা কীসের জন্য দিলেন শিবাশিসদা?"

"তুমিই ওকে জিজ্ঞেস করো।"

পিছনে যে মেয়েটা বসেছে, সে কলকল করে বলে উঠল, "সে কী, মিতাদি তুমি জানো না? আজ তো কাগজে খবরটা বেরিয়েছে। হিয়াদি কাল মিস ক্যালকাটা হয়েছে।

হিয়া বিরক্তি দেখিয়ে বলল, "এই রিমা, তুই থাম তো।"

"কেন থামব? কাগজে খবরটা দেখে আমার এত আনন্দ হল, অন্তত কুড়ি জনকে ফোন করে জানালাম। এটা আমাদের ক্লাবের সাকসেস। কেন বলব না?"

"আহ, তুই বড্ড বেশি কথা বলিস।"

রমেন বলল, "হিয়াদি, এটা কিন্তু অন্যায়। এতক্ষণ আপনার ক্লাবে রইলাম, অথচ একবারও বললেন না। এত বড় একটা খবর চেপে রাখলেন। আপনি তো আশ্চর্য মেয়ে।"

হিয়া বলল, "বলার কী আছে? সবাই পছন্দ নাও করতে পারে।"

রিমা বলে মেয়েটা বলে উঠল, "কেউ পছন্দ করুক বা না করুক, আমি কিন্তু চিৎকার করে সবাইকে বলব, ডোমজুড়ের মেয়েরাও তা হলে পারে।"

হিয়া এ বার রেগেই বলল, "এই থাম তো। যাচ্ছি একটা কাজে। আর বকবক শুরু করেছিস।"

সুস্মিতা বলল, 'জানো হিয়াদি, আমি ভাবতেও পারিনি, শিবাশিসদা সব কাজ ফেলে আমাদের জন্য ছুটে আসবে। ভাগ্যিস, তুমি শিবাশিসদার কথাটা বলেছিলে।"

ওহ, আমার কথা ওদের তা হলে হিয়াই বলেছিল! আড়চোখে হিয়ার দিকে একবার তাকালাম। ও চোখ-মুখে বিরক্তি নিয়ে বসে আছে। ওকে একটু চটানোর জন্যই বললাম, "রমেন, শুনে ভাল লাগল, তোমাদের একজন অ্যাডভাইসার আছে। আমি যদি তোমার মতো অবস্থায় পড়ি, আমিও তা হলে খাটোরায় চলে যাব।"

রিমা মেয়েটা হি হি করে হেসে উঠল। তারপর ফট করে বলে বসল, "না শিবাশিসদা, আপনাকে এই অবস্থায় পড়তে হবে না। কোনও মেয়ের বাবা-মা আপনাকে অন্তত অপছন্দ করবে না।"

হিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে কড়া চোখে মেয়েটার দিকে তাকাল। লুকিং গ্লাসে দেখলাম, মেয়েটা চুপসে গেছে। ওকে উদ্দেশ্য করে বললাম, "রিমা জানলার কাচগুলো তুলে দাও তো। হঠাৎ আবহাওয়াটা গরম হয়ে যাচ্ছে। এ সি-টা চালিয়ে দিই।"

এ সি চালিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল গাড়ির ভেতর। কয়েকদিন আগে এই গন্ধের ব্যবস্থাটা মাথা খাটিয়ে বের করেছি। দেখি, এরা কী বলে। মিনিট খানেক পরই রিমা বলল, "আহ, শিবাশিসদা, গন্ধটা এত সুন্দর, মনটা তাজা হয়ে যাচ্ছে।"

"কীসের গন্ধ বলো তো?"

"মনে হচ্ছে, তরমুজের।"

"পাঁচ মিনিট পর অন্য একটা গন্ধ পাবে।"

"তাই নাকি? দারুণ তো! এই পারফিউমটা কি আপনি নিজে তৈরি করেছেন?"

"হ্যাঁ। গোমড়ামুখোদের জন্য। ধরো, কোনও কারণে তুমি বিরক্ত হয়ে আছ। তখন ঘরে এই গন্ধটা স্প্রে করে দিলে তোমার বিরক্তি ধুয়ে মুছে যাবে। তোমার মুখে হাসি ফিরে আসবে। গান শুনতে ইচ্ছে করবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। একে বলে অ্যারোমাথেরাপি।"

রিমা অবাক হয়ে বলল, "বাবা, গন্ধের এত রিঅ্যাকশন আছে, তা তো জানতাম না।"

সুস্মিতা বলল, "সত্যিই তো শিবাশিসদা, গন্ধটা মনে হচ্ছে পালটে গেছে। এখন মনে হচ্ছে, এলাচ-এলাচ গন্ধ।"

বললাম, "আর দু'তিন মিনিট পর ফের নতুন একটা গন্ধ পাবে।"

রিমা বলল, 'আপনি তো দেখছি ম্যাজিক জানেন।"

'আমার বাড়িতে একদিন এসো। এ রকম কয়েকশো ম্যাজিক তৈরি করা আছে।"

"আশ্চর্য, সত্যিই আমার এখন গান শুনতে ইচ্ছে করছে। শিবাশিসদা, চালান না, কোনও ক্যাসেট থাকলে।"

সঙ্গে সঙ্গে মেহেদি হাসানের একটা ক্যাসেট চালিয়ে দিলাম। সবাই চুপ করে শুনতে লাগল। গানটা শেষ হওয়ার পর সুস্মিতা বলল, "আপনি এত রোমান্টিক টাইপের শিবাশিসদা, বোঝা যায় না।"

বললাম, "গন্ধের সঙ্গে রোমান্সের একটা গভীর সম্পর্ক আছে সুস্মিতা।"

মাকড়দহ বাজারের কাছে পৌঁছে হঠাৎ গাড়িটা থামিয়ে এক ধারে পার্ক করলাম। তারপর বললাম, "রিমা, বেরিয়ে এসো। দরকার আছে।" হিয়া ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। মনে মনে হাসলাম। রিমার প্রগলভতা ও পছন্দ করছে না। আর সেই কারণেই ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছি আমি। হিয়া চটুক। চটলেই কথা বলবে।

রিমা আর আমি ফুলের দোকানে গিয়ে গোড়ের দু'টো মালা কিনলাম। তিন গোছা গোলাপও। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সামনে সই সাবুদ হয়ে যাওয়ার পর মালা বদল করানো দরকার। সেই সঙ্গে মিষ্টি মুখ করানোও। মালা আর মিষ্টির প্যাকেট হাতে নিয়ে আমরা মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এলাম। রিমার হাতে প্যাকেট দেখে রমেন বলল, "শিবাশিসদা, কী দরকার ছিল এত খরচের। আপনি বাড়াবাড়ি করছেন।"

বললাম, "জীবনে তো একবারই এই মুহূর্তটা আসবে রমেন। একটু বাড়াবাড়ি হলে ক্ষতি কী?"

সুস্মিতা হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল। ওকে জড়িয়ে ধরে রিমা সান্ত্বনা দিচ্ছে। বিয়ে নিয়ে প্রত্যেক মেয়েরই একটা স্বপ্ন থাকে। কাল রাতেও কি সুস্মিতা ভেবেছিল, এই ভাবে বিয়ে করতে যাবে? আন্দাজ করতে পারছি, স্বপ্নভঙ্গে কী বেদনা হচ্ছে ওর মনের মধ্যে।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে আমরা পৌঁছলাম, প্রায় বারোটায়। সাইন বোর্ডে দেখলাম লেখা, মঞ্জুলিকা বিশ্বাস। ভদ্রমহিলা আমাদের দেখেই বললেন, "সব রেডি করে রেখেছি। বারোটা সাঁইত্রিশে ভাল একটা টাইম আছে। ওই সময়টায় সই করবেন। আপনারা আমার ড্রয়িং রুমে চলে যান। একটু সাজগোজ করে নিতে পারেন। এখন আমাকে বার্থ সার্টিফিকেট দু'টো দিয়ে যান।"

রমেনের দু'তিনজন বন্ধুও এসে গেছে। একজনের হাতে ক্যামেরা। সুস্মিতাকে নিয়ে হিয়া আর রিমা ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পর রমেনকে আমি বললাম, "এখান থেকে তোমরা কোথায় যাবে?"

"আমাদের বাড়িতে।"

"তোমার বাড়ির সবাই জানেন?"

"হ্যাঁ, আমার এক ভাই এসে গেছে। বাবাও আসছেন।"

"বড়গাছিয়ায় আমার এক বন্ধু অমিত খৈতানের একটা গেস্ট হাউস আছে। ইচ্ছে করলে সেখানে তিন-চারটে দিন কাটিয়ে আসতে পারো।"

"সুস্মিতাকে বলে দেখি।"

ঠিক সাড়ে বারোটার সময় সুস্মিতাকে সাজিয়ে বাইরের অফিসে নিয়ে এল হিয়া। পরনে একটা নীল বেনারসি শাড়ি। মুখমণ্ডলে চন্দনের টিপ। চুল দু'পাশে সিঁথি করা। সুস্মিতাকে কনের সাজে নিয়ে এল ওরা। হিয়া নিজেও শাড়ি পাল্টে নিয়েছে। ওর পরনে কাঞ্চিপুরম শাড়ি। মুখে হালকা মেকাপ। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। চোখাচোখি হতেই ও ভ্রু কোঁচকাল। তারপর আমাকে উপেক্ষা করেই বলল,

"রমেনদা, এবার আপনার হাতে তুলে দিলাম, সামলান।"

ঠিক বারোটা সাঁইত্রিশে প্রথমে রমেন, তারপর সুস্মিতা কাগজপত্রে সই করল। সাক্ষী হিসাবে সই করলাম আমি, হিয়া। আরও দু'জন। রমেন বা সুস্মিতাকে আমি দেখছি না। আমি শুধু লক্ষ করে যাচ্ছি হিয়াকে। এই দিনটা আমারও আসবে। কেমন দেখাবে হিয়াকে সেদিন কনের সাজে? হিয়া আমার দিকে তাকাচ্ছেই না। ও মালা বদল করাচ্ছে রমেন আর সুস্মিতার মধ্যে। হঠাৎই ওর কনুইটা ছুঁয়ে গেল আমার কবজিতে। বিরক্তি ভরা চোখে হিয়া একবার আমার দিকে তাকাল। মনে মনে বললাম, যতই আমার উপর রাগো। আমি কিন্তু রাগব না। রমেন সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছে সুস্মিতাকে। রিমা উলু দিতে লাগল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই চুকে গেল বিয়েটা।

রমেনের ভাই একটা গাড়ি ভাড়া করে এনেছে। সুস্মিতাকে নিয়ে সবাই তাতে উঠে বসল। ওরা যাবে জগদীশপুরে। আমি আর হিয়া ডোমজুড়ে। বাধ্য হয়েই হিয়া এল আমার গাড়িতে। বাড়ি ফিরতে লাগবে মিনিট কুড়ি। মনে মনে বললাম, এটাই সময়। গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই বললাম, "আমার উপর রাগ তা হলে এখনও কমেনি তোমার?"

হিয়া বলল, "কোনও দিন কমবে না।"

'সুব্রতদার উপর রাগটা আমার উপর ঝাড়ছ কেন বলো তো?"

"আমার চোখে আপনারা দু'জনেই সমান।"

"তুমি আমাকে ভুল বুঝছ হিয়া।"

"লোক চিনতে আমি ভুল করি না। এই যে সেদিন এত মিথ্যে কথা বলে এলেন, তার পরিণতিটা ভেবে দেখেছেন?"

"সুব্রতদার ওপর আমারও কি কম রাগ হচ্ছে? বিশ্বাস করো, লোকটা কিন্তু এ রকম ছিল না।"

"বিশ্বাস করি না। সুব্রতদাও আপনার সম্পর্কে আমাকে অনেক কিছু বলে গেছে।"

"কী বলে গেছে?"

"মিলিদির সঙ্গে আপনার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।"

"বাজে কথা।"

"যাক গে, এটা আপনার পার্সোনাল ব্যাপার। আমার কোনও আগ্রহ নেই। সুব্রতদা সম্পর্কে সত্যি কথাটা বাবাকে যদি জানিয়ে আসেন, তা হলে আমি খুশি হব।"

"ঠিক আছে। তুমি যদি চাও, কালই গিয়ে বলে আসব। তার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"বলুন।"

"তুমি কি কাউকে পছন্দ করে রেখেছ?"

"এটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার। মিলিদির সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক, আমাকে বলেছেন।"

"মিলি আমার বন্ধু। আমার ওয়েলউইশার। তুমি তো ওর ফোন নাম্বার জানো। ওকেই জিজ্ঞেস কোরো না, আমার সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে কি না? অবশ্য ফোনটা তাড়াতাড়ি কোরো। ও আবার থাকছে না।"

"তার মানে?"

"মিলির সঙ্গে একজন এন আর আই ছেলের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। বিয়েটা ঠিক করেছে সুব্রতদাই। মিলি রাজি হচ্ছিল না। এখন বোধহয় মত দিয়েছে। ওখানে চাকরিও পেয়ে গেছে একটা।"

কথাগুলো বলতে বলতেই হিয়ার দিকে তাকালাম। ওর মুখটা নরম হয়ে এসেছে। তবে বিশ্বাসও করতে চাইছে না আমাকে। আমার দিকে সামান্য ঘুরে বলল, "এ কথাটা তো মিলিদি আমাদের বলেনি।"

"তার দায়িত্ব নিশ্চয়ই আমাকে নিতে বলবে না। বিয়ের কথাটা সবাই জানে। তুমি জানো না শুনে আমারই অবাক লাগছে। আমি তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই, মিলি কী বলল।"

হিয়া চুপ করে রইল। হেলথ ক্লাবে নেমে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ও কোনও কথা বলল না। আমি জানি, মিলির সঙ্গে ফোনে ও কথা বলবে। আমার আধা-মিথ্যে কথাটা ও ধরে ফেলবে। কিন্তু এ সব না বলেও আমার কোনও উপায় নেই। কেন না, প্রেমে আর যুদ্ধে মিথ্যে বলে কিছু নেই।

॥ সতেরো ॥

সকাল থেকেই মনটা একটু চঞ্চল হয়ে আছে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার স্বপন মুখার্জি আজ ইন্সপেকশনে আসবেন। সকাল আটটার মধ্যেই মিত্তির কাকাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছি। ন'টার মধ্যে পৌঁছে যাবেন গণেশ অ্যাভেনিউ আর মিশন রো-র মোড়ে। স্বপনবাবুকে দশটার সময় ব্যাঙ্ক থেকে তুলবেন। ডোমজুড় আসতে আসতে প্রায় এগারো, সোয়া এগারোটা।

সুপ্রতিমবাবুর কথা মতো কাল ব্যাঙ্ক গেছিলাম। প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকার প্রোজেক্ট। এই মন্দার বাজারে লোন দেওয়ার আগে ব্যাঙ্ক তিনবার ভাববেই। এর আগে দু'টো ব্যাঙ্ক ঘুরেছি। ম্যানেজারদের প্রোজেক্টেড ব্যালান্স শিটও দিয়ে এসেছি। এক মাস ঘুরিয়ে ওরা না বলে দিয়েছেন। সত্যি বলতে কী, মনে মনে একটু দমে গেছি ওদের ব্যবহারে। মা দু'টো ফিক্সড ডিপোজিট রেখে গেছিল সাত লাখ টাকার। সেই দু'টো ভেঙে কারখানার মেরামতির কাজ করেছি। বারো-চৌদ্দজন ইতিমধ্যেই কাজে লেগে গেছে। তাদের মাইনে দিতে পারব না, যদি স্বপনবাবু মুখ ফিরিয়ে নেন।

কাল যখন ইউ বি আই-তে যাই, স্বপনবাবু ব্যস্ত ছিলেন। চিরকুট পাঠাতেই ডেকে পাঠালেন। ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

"সুপ্রতিম ঘোষাল আমাকে পাঠিয়েছেন।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করেই স্বপনবাবু বললেন, "ও, ডোমজুড়ের সুপ্রতিমবাবু? বসুন। বসুন। কেমন আছেন উনি?"

"ভাল।"

"ক্লাসিক্যাল মিউজিকে ভদ্রলোকের অসম্ভব টান। আমার সঙ্গে আলাপও ডোভার

লেনের কনফারেন্সে। পাশাপাশি বসে সারা রাত গান শুনেছিলাম। তারপর থেকেই আমার সঙ্গে হৃদ্যতা। যাক, কী ব্যাপারে, আপনাকে পাঠিয়েছেন বলুন। আপনি কি ওঁর কেউ হন?"

"উনি আমার শুভানুধ্যায়ী। আমি শিবাশিস চৌধুরী। পার্বতীপুরে থাকি। আমি একটা পারফিউমের ফ্যাক্টরি নতুন করে চালু করছি। সেই ব্যাপারেই লোন নিতে চাই।"

স্বপনবাবু একটু অবাক হতেই আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "পারফিউম তৈরি করবেন? কী পারফিউম? ছোটবেলায় মা-দের দেখতুম, কান্তা সেন্ট মেখে সিনেমায় যেতেন। আর মাখতেন ইভনিং ইন প্যারিস। কী গন্ধ! শিশি ফুরিয়ে গেলেও গন্ধ ফুরিয়ে যেত না। আমরা ছোটরা জল ভরে, সেটাই গায়ে মাখতুম। এখন বাজার থেকে পারফিউম কিনি। বেলগাছিয়া থেকে মেট্রো রেলে আপিসে আসতেই গন্ধ উঠে যায়। কারণটা কী বলুন তো?"

কথাটা উনি ঠিকই বলছেন। বোঝানোর জন্য বললাম, "তখন ন্যাচারাল পারফিউম পেতেন। এখন সব সিন্থেটিক পারফিউম। তাই গন্ধটা বেশিক্ষণ থাকে না।"

"কী জানি বাবা। তা, আপনি সিন্থেটিক পারফিউম তৈরি করবেন, না কী যেন বললেন ন্যাচারাল?"

"ন্যাচারাল পারফিউমের অনেক দাম। সাধারণ লোকের বায়িং ক্যাপাসিটির বাইরে চলে যাবে। আমি সাধারণ লোকের জন্য ভাল একটা প্রোডাক্ট বানিয়েছি।"

"কত টাকার লোন দরকার আপনার?"

একটু বাড়িয়েই বললাম, "লাখ ষাটেক। ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যাল লাখ কুড়ি। বাকিটা টার্ম লোন।"

"অ্যাপ্লিকেশন লিখে এনেছেন?"

"হ্যাঁ। একটু যদি পড়ে নেন, ভাল হয়।"

"এখন সময় নেই। আপনার কি ইন্সফ্রাস্ট্রাকচার আছে?"

"আছে। ঠাকুর্দা বানিয়ে গিয়েছিলেন। গন্ধপুরে।"

"সেটা আবার কোথায়?"

"মাকড়দার একটু আগে।"

"গেলে দেখা যাবে?"

"কবে যাবেন, বলুন?"

"কাল সকালে। কেউ এসে নিয়ে যাবেন। ঠিক আছে?"

ভদ্রলোক আর কিছু জানতে চাইলেন না বলে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছিল। কিন্তু রাতে সুপ্রতিমবাবুকে সব কথা বলতেই, উনি বললেন, "এ নিয়ে কিছু ভেবো না। উনি অত্যন্ত এফিসিয়েন্ট। যা জানার জেনে নিয়েছেন। ওকে যদি কনভিন্স করতে পারো, তা হলে এক সপ্তাহের মধ্যে লোন পেয়ে যাবে।"

পরে মিলিয়ে দেখলাম, সুপ্রতিমবাবুই ঠিক। আগের দুই ব্যাঙ্ক ম্যানেজার এত অল্প

সময়ে ইন্সপেকশনে আসার কথা বলেননি। একজন দু'সপ্তাহ পরে কারখানায় এসেছিলেন, কিন্তু আকারে-ইঙ্গিতে লাখ দু'য়েক টাকা ঘুস চেয়েছিলেন। হয়তো রাজি হয়ে যেতাম। কিন্তু হঠাৎ স্বপনবাবুর কথা মনে হয়েছিল। এই ভদ্রলোক লোন না দিলে আমি মুশকিলে পড়ে যাব।

লোক লাগিয়ে মিত্তিরকাকা কারখানার চেহারা এই ক'দিনে একেবারে ফিরিয়ে দিয়েছেন। রমাপ্রসাদবাবুও মার্কেটিং আর সেলসের লোক বাছছেন। মাঝে একদিন পলি বিশ্বাসকে কারখানায় দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। ও চলে যাওয়ার পর রমাপ্রসাদবাবু বললেন, 'মেয়েটা চাকরি চাইতে এসেছিল। অগাধ জলে পড়ে গেছে।"

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "মেয়েটাকে আপনি চেনেন?"

"চিনি। ধুর্জুটি বাবুর মেয়ে। অল্প বয়েসে একটা ভুল করে ফেলেছিল। এখন তার মাশুল দিচ্ছে। ডিভোর্সি। একটা ছেলেকে নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। মেয়েটা করেসপন্ডেন্স কোর্স করেছিল। আমি মার্কেটিংয়ের জন্য নিয়ে নিলাম।"

শুনে আমি কিছু বলিনি। তাজ হোটেলে পলি বিশ্বাসের যে পরিচয় পেয়েছিলাম, তাতে ওর হাবুডুবু খাওয়ার কথা নয়। মঁসিয়ে বেনোনিলকে খুশি করার জন্য সুরেশ জালান ওকে প্রায় রাতেই তাজ হোটেলে পাঠাত। এটা আমি শুনি পরে বেনোনিলের মুখে। এও হতে পারে, পলি অভাবের তাড়নায় লাইনে নেমে গেছে। যদি আমাদের কারখানায় চাকরি নিয়ে সুস্থ জীবনে ফিরে আসে, ক্ষতি কী?

চান করে খেতে বসব, এমন সময় মিলির ফোন, "শিবাদা, তুমি জানলে কী করে আমি ফ্রান্সে যাচ্ছি?"

বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। হিয়া কি তা হলে সত্যিই ফোন করেছিল মিলিকে?

নিশ্চয়ই বিয়ের কথাও জানতে চেয়েছে। ইস, ওর কাছে ফের আমি ছোট হয়ে গেলাম। এবার কোথাও দেখা হলে হয়তো আমার সঙ্গে কথাই বলবে না। ধরা যখন পড়ে গেছি, যা হওয়ার তা হবে। মিলিকে বললাম, "কে যেন বলল কথাটা মনে নেই।"

"জানো, কেয়াদি অনেকদিন পর আমাকে কাল ফোন করেছিল। আগের মতো গল্প করল। দাদা বোধহয় কেয়াদিকে ফোন করেছে। পুজোর পরই একবার আসছে। তখন বিয়ে করে নিয়ে যাবে।"

"তুমি কবে যাচ্ছ মিলি?"

"দিন সাতেকের মধ্যে। মার্সেইতে একটা চাকরি পেয়েছি। অনুবাদের কাজ করতে হবে। বাবাই কোষ্ঠী দেখে বলেছিল, বিদেশে চাকরির যোগ আছে। তুই চেষ্টা করে যা। সত্যিই পেয়ে গেলাম।"

"আমাকে তো বলোনি।"

"তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম। আর তুমি এখন যা ব্যস্ত, তোমাকে পাওয়াই যায় না। তিনদিন ট্রাই করে, আজ পেলাম।"

"মার্সেইতে থাকবে কোথায়?"

"ওরাই ব্যবস্থা করে দেবে। আমি যাওয়ার আগে শিবাশিসদা তুমি একবার

আসবে? সারাটা দিন তোমার সঙ্গে গল্প করতাম।"

"নিশ্চয়ই যাব। পারলে তুমিও একদিনের জন্য চলে এসো না।"

"হবে না গো। প্রিপারেশনের অনেক বাকি। তোমার কাজ কীরকম এগোচ্ছে।"

"ভাল। এখনও ব্যাঙ্ক লোন জোগাড় করতে পারিনি। পেলে ফুল সুইংয়ে কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে। আশা করছি, পুজোর দিন পনেরো আগেই বাজারে মাল ছাড়তে পারব।"

"বাবা তো বলছে। তুমি সাকসেসফুল হবেই। কী একটা বড় প্রাইজও নাকি তুমি পাবে। তাতে তোমার ভাগ্য খুলে যাবে। তখন কিন্তু মনে রেখো আমাদের।"

"কী জানি, কপালে কী লেখা আছে? এত বড় ঝুঁকি নিয়েছি। সামলাতে পারব কি না, জানি না। মা বেঁচে থাকলে তবুও মাথার উপর একটা ছাতা থাকত। এখন আমি যে একা মিলি।"

"চিন্তা কোরো না। ওপর থেকে মাসিমা নিশ্চয়ই তোমাকে আশীর্বাদ করছেন। ভাল থেকো। ছাড়ি তা হলে?"

"তোমার কি তাড়া আছে?"

"হ্যাঁ গো। একবার ট্রাভেল এজেন্টের কাছে যেতে হবে। একদিন এসো কিন্তু।" বলেই লাইনটা ছেড়ে দিল মিলি। ওর ব্যস্ততা দেখে আমার একটু অবাকই লাগল। অন্য দিন আমি ফোন ছাড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি। ও কথা বলে যায়। আজ মনে হল, মার্সেই যাওয়ার খবরটা দিয়েই ও ফোন রেখে দিতে চাইছিল। সেদিন রাতে আমাদের বাড়িতে ওই ঘটনার পর থেকে মিলি ও নিয়ে বার পাঁচেক ফোন করল। একবারও ওই প্রসঙ্গটা আর তুলল না। অন্য কোনও মেয়ে হলে আমার উপর অধিকার ফলাত। ইনিয়ে বিনিয়ে বিয়ের কথা তুলে আমার জীবন দুর্বিসহ করে তুলত। হঠাৎ মার্সেইয়ে ওর চাকরি নেওয়াটাই আমার কাছে রহস্য মনে হচ্ছে। কী এমন ঘটল, মা-বাবাকে ফেলে রেখে মিলি চলে যাচ্ছে? ঠিক করলাম, ঘণ্টা খানেক পর ওদের বাড়িতে ফোন করতে হবে। মেসোমশাইয়ের কাছ থেকে সত্যি কথাটা জানতে হবে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি কারখানায় পৌঁছলাম। প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে, মিত্তির কাকারা এখনও আসেননি। তা হলে কি স্বপনবাবু মত বদলালেন? হয়তো আজ আসবেন না। কিন্তু সেক্ষেত্রে মিত্তির কাকা অবশ্যই ফোনে আমাকে জানিয়ে দিতেন। এত সময় লাগার কথা নয় কলকাতা থেকে আসতে। হয়তো ট্র্যাফিক জ্যাম হয়েছে। এক্সচেঞ্জ থেকে একটা টেম্পোরারি লাইন দিয়ে গেছে কারখানায়। ব্যাঙ্কে ফোন করলাম। ডেপুটি ম্যানেজার প্রণববাবু বললেন, "ম্যানেজারবাবু ঠিক দশটায় বেরিয়ে গেছেন।"

অফিস ঘরে গিয়ে বসতেই কোচাই একগাদা চিঠি এনে দিল। নানা জায়গা থেকে চিঠি আসছে। গুরুত্ব বুঝে সেগুলি খোলার জন্য আলাদা একজন লোক দরকার। ইদানীং কোচাই এই কাজটা করছে। বলল, "ফ্রান্স থেকে একটা চিঠি এসেছে শিবাদা। মনে হচ্ছে ইম্পরট্যান্ট।"

নিশ্চয়ই মঁসিয়ে বেনোনিলের চিঠি। আর কে দেবেন। তাড়াতাড়ি খুলে পড়তে

শুরু করলাম। যা ভেবেছিলাম, তা নয়। চিঠিটা এসেছে সোসাইটি টেকনিক অফ পারফিমারি ফসে থেকে। মঁসিয়ে বেনোনিল মারফত, যেখানে আমার নতুন পারফিউমটা পাঠিয়েছিলাম। সোসাইটির প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, "তোমার পারফিউম আমরা পেয়েছি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে। তুমি পারফিউমের কোনও নাম দাওনি। এক সপ্তাহের মধ্যে নামটা পাঠাও। না হলে প্রতিযোগিতায় তোমার এন্ট্রি গ্রাহ্য করা হবে না।"

চিঠির বয়ান পড়ে মনটা দমে গেল। দশদিন আগে চিঠিটা ওরা আমাকে পাঠিয়েছেন। তার মানে এক সপ্তাহের মেয়াদ এর মধ্যে ফুরিয়ে গেছে। এখন নাম পাঠিয়েও আমার লাভ হবে না। আমি জানতামই না, নাম না দিলে কম্পিটিশন বিভাগে ওরা আমার পারফিউম রাখবে না। মঁসিয়ে বেনোনিলও আমাকে কিছু বলেননি। আমি না হয় নিয়মকানুন জানি না। ওঁর তো জানা উচিত। এবার বোধহয় হাত থেকে সুযোগটা ফসকে গেল। দেশে ফেরার পর মঁসিয়ে বেনোনিল একবার ফোন করেছিলেন। সুরেশ জালান সম্পর্কে খোঁজ নিলেন। তখনও যদি বলতেন। নামটা পাঠিয়ে দিতে পারতাম।

চিঠি নিয়ে ভাবতে ভাবতেই স্বপনবাবুরা এসে গেলেন। গাড়ির শব্দ শোনামাত্রই বাইরে বেরিয়ে এলাম। ভদ্রলোককে খুশি করা দরকার। সুপ্রতিমবাবু বারবার বলে দিয়েছেন। চোখাচোখি হতেই বললাম, "ভেতরে এসে বসুন। বড্ড ঘেমে গেছেন।"

স্বপনবাবু হেসে বললেন, "দূর মোশাই, বসার কি সময় আছে? পায়ে ঘোড়ার খুর লাগিয়ে এয়েচি। চলুন, সব দেখাবেন। একটা পুকুর দেখছি। মাছ আছে?"

"আছে। রুই, কাতলা, মিরগেল।"

"এ হে-হে কাল বলতে পারলে না ভাই। বড়শিটা নিয়ে আসতুম। মাছের সাইজ কীরকম হবে?"

"তিন-চার কেজি। তার বেশিও হতে পারে।"

"পুকুরটা কি কারখানার ভেতরে?"

"হ্যাঁ। আমাদেরই। যদি মাছ ধরতে চান, ব্যবস্থা করা যেতে পারে।"

"আজ নয়। সামনের রোববার। আমার সঙ্গে কিন্তু আরও দু'চারজন ভদ্দরলোক থাকবেন। তুমি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা রেখো ভাই।"

একদিনের মধ্যেই স্বপনবাবু সম্বোধনটা তুমি-তে নামিয়ে আনলেন। শুনে ভাল লাগল। বললাম, "একটা রোববার কেন, যেদিন আপনার ইচ্ছে, মাছ ধরতে আসুন। আমার ভাল লাগবে।"

স্বপনবাবুর বোধহয় মনে পড়ল, ইন্সপেকশনে এসেছেন। আশপাশে একবার তাকিয়ে বললেন, "এই পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ক'দিন আগে করা ভাই?"

"চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর তো হবেই। ব্যবসাটা আসলে শুরু করেন আমার ঠার্কুদা।"

"হু, ব্যবসা তা'লে তোমার ব্লাডেও আছে। তা, তোমার কোয়ালিফিকেশনটা কী? কোনও অভিজ্ঞতা আছে? ব্যাঙ্ক যে তোমায় লোন দেবে, কী দেখে দেবে?"

স্বপনবাবুকে ইন্সটিটিউটের কথা বললাম। জাঁ পাতু কোম্পানিতে কিছু দিন কাজ করার কথাও। মিনিট তিনেকের মধ্যেই সব গুছিয়ে বলে শেষে বললাম, "এই দেখুন, আমার প্রোভাক্ট এস টি পি এফেও পাঠায়েছি। তবে নাম দিইনি বলে ওরা এন্ট্রি নিতে পারেনি।"

"দেখি চিঠিটা।" বলেই হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে স্বপনবাবু বললেন, "এই তো ই-মেল অ্যাড্রেস রয়েছে ওদের। এক মিনিট লাগবে ওই নামটা ওদের কাছে পৌঁছতে। কালই কলকাতায় আমার অফিসে গিয়ে একবার দেখা করবে আমার সঙ্গে। নামটা পাঠিয়ে দেবে সোসাইটিতে।" ভদ্রলোকের পরামর্শ শুনে আমি একটু অবাকই হলাম। সুপ্রতিমবাবু তা হলে ঠিকই বলেছিলেন, স্বপনবাবু সত্যিই কাজকর্মে তুখোড়। ই-মেল অ্যাড্রেসের কথা আমার মাথায় আসেনি। অথচ ফ্রান্সে থাকতে, কত ই-মেল ব্যবহার করেছি।

"হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না।" স্বপনবাবু তাড়া দিলেন, "চলো, তোমার স্থাবর সম্পত্তি কী আছে, আমাকে দেখাবে।"

দু'টো বাড়ি আর গোডাউন ঘুরিয়ে দেখালাম। মিত্তিরকাকার কাছ থেকে পুরনো দিনের সব কথা জেনে নিচ্ছেন। হঠাৎ বললেন, "গোডাউনে যেদিকটায় তুমি কেমিকেল রাখবে, সেখানে ফায়ার সেফটির জন্য আলাদা কোনও ব্যবস্থা রেখেছ শিবাশিস? কেমিকেলগুলো তো প্রচুর দামি, শুনলাম।"

বললাম, "প্ল্যানে সেফটির ব্যবস্থা আছে। তৈরি করছি।"

"পুরো এরিয়াটা কত একর জমি হবে?"

"বারো একর। পুকুরটা বাদে।"

মনে মনে কী যেন হিসেব করে নিলেন স্বপনবাবু। তারপর বললেন, "চলো পাখার সামনে একটু বসি গিয়ে। জামাটা ভিজে জ্যাবজ্যাব করছে।"

"ওদিকে স্টাফ কোয়ার্টার্স আর গেস্ট হাউস আছে। দেখবেন?"

"দরকার নেই। আমার দেখা হয়ে গেছে। ক'টা বাজে বলো তো এখন? বামুনের ছেলে, বুঝলে? পেটপুজোর সময় হয়ে গেছে।"

মিত্তিরকাকা সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমার ঘরে সবাই মিলে বসলাম। ভদ্রলোককে যত দেখছি, তত শিখছি। কথা বলছেন। কিন্তু চোখটা চারদিকে। হঠাৎ বললেন, "তুমি ব্যবসা করতে নামলে কেন ভাই? তোমার যা চেহারা, স্বচ্ছন্দে কোনও টিভি সিরিয়ালে নেমে যেতে পারতে। বলো তো, চেষ্টা করি।"

হেসে বললাম, "দরকার নেই। আমি গন্ধের জগতের লোক। আমাকে আমার জগতেই থাকতে দিন। আর পারলে তাড়াতাড়ি লোনটা সাংশান করে দিন।"

"ষাট লাখটা পঞ্চাশে নামিয়ে আনতে পারবে?"

"কেন বলুন তো?"

"তা'লে আমার কাজটা সহজ হয়ে যায়। রিজিওনাল অফিস থেকেই সাংশানটা করিয়ে আনতে পারি। মেন অফিসে ছুটতে হবে না।"

"ষাট হলে আমার ভাল হত।"

"তা'লে সব কাগজগুলো নিয়ে কাল এসো। দেখি, কী করতে পারি।"

টেবিলের উপর খাবার সাজিয়ে দিলেন মিত্তিরকাকা। দেখে আঁতকে ওঠার ভান করলেন স্বপনবাবু, "এত কে খাবে? সে বয়েস কী আছে? আমি নৈহাটির ছেলে। সমরেশ বোসের পাড়ার লোক। এক সময়ে জল চিবিয়ে খেতুম। বুকে একটা অল্প ধাক্কা সামলেছি। এখন তাই একটু সমঝে চলি।"

আলাদা একটা প্লেটে সামান্য কিছু খাবার তুলে নিলেন স্বপনবাবু। তিনটে লুচি, এক টুকরো মাংস আর দু'টো সন্দেশ। কেওড়া আর গোলাপের জল দিয়ে আমি সরবত তৈরি করতে বলেছিলাম। যাতে গন্ধপুরে এসে উনি গন্ধের সামান্য স্বাদ নিয়ে যেতে পারেন। সরবত খেয়ে আত্মহারা হয়ে গেলেন স্বপনবাবু। বললেন, "কাল যখন যাবে বড় ফ্লাস্কে করে এই সরবত নিয়ে যাবে। ব্যাঙ্কের সবাইকে ডেকে ডেকে আমি খাওয়াব।"

ভদ্রলোকের চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, খুশি। কিন্তু লোনটা পাওয়া যাবে কি না, সে সম্পর্কে কোনও কথা উনি এখনও বলেননি। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "সুপ্রতিমবাবুর বাড়িটা এখান থেকে কদ্দূর? একবার ঘুরে আসা যাবে?"

মিত্তিরকাকা বললেন, "নিশ্চয়ই যাওয়া যাবে। এখান থেকে মাত্র মিনিট দশেকের পথ।"

"চলুন তো একবার যাওয়া যাক। আজ সকালে ওর মেয়ে ফোন করে বলল, 'আঙ্কল, বেঙ্গল পারফিউমের লোনটা পারলে করে দেবেন।' শুনলাম মেয়েটা নাকি মিস ক্যালকাটা হয়েছে। ফোনে অনেকদিন কথা কয়েচি, চোখে দেখার বড্ড ইচ্ছে।"

কথাটা শুনে আমি চমকে তাকালাম। কে ফোন করেছে? কেয়াদি? না, কেয়াদির এত মাথাব্যথা নেই আমার ফ্যাক্টরি নিয়ে। নিশ্চয়ই হিয়া। কথাটা ভাবতেই, চোখের সামনে রামধনু দেখতে পেলাম। যে হিয়া আমাকে সহ্যই করতে পারে না, সে কেন লোন সাংশানের জন্য স্বপনবাবুকে অনুরোধ করবে? সব থেকে বড় কথা, ও জানলইবা কী করে স্বপনবাবু আজ ইন্সপেকশনে আসছেন? হয়তো এমনও হতে পারে, কাল রাতে আমি যখন সুপ্রতিমবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন প্যারালাল লাইনে হিয়া সব শুনেছে। এটা সম্ভব।

স্বপনবাবু মিটিমিটি হাসছেন। আমার দিকে তাকিয়ে এরপরই বললেন, "তোমার মতো একটা হ্যান্ডসাম ছেলের জন্য একজন বিউটি কুইন রিকোয়েস্ট করছে, ভাবতে ভালই লাগছে শিবাশিস।"

ভদ্রলোক বেশ রসিক তো? বললাম, "আসলে কী জানেন, গন্ধের কারখানায় এসেছেন তো। সে জন্য রোমান্সের কথা ভাবতে আপনার ভাল লাগছে।"

বয়স-টয়স ভুলে স্বপনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "ওয়েল সেড মাই বয়। ওয়েল সেড।"

মিত্তিরকাকার সঙ্গে খাটোরায় রওনা হওয়ার আগে আমার কাঁধ চাপড়ে স্বপনবাবু বললেন, "তুমি এগিয়ে যাও। আমি আছি। আরও কিছু কোয়ারিজ আছে। কাল জেনে নেব।"

ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। রাতে সুপ্রতিমবাবুকে ফোন করে জেনে নিতে হবে, স্বপনবাবু কী বলে গেলেন। ইস, ওঁকে একটা নিজের তৈরি পারফিউমের বোতল দিলে হত। গন্ধটা উনি বুঝতে পারতেন। কাল অবশ্যই নিয়ে যাব। মনটা হালকা হয়ে গেল।

হাতের বাকি কাজ সেরে বিকেল বেলায় বাড়ি ফিরে এলাম। আমাকে দেখেই বাইরে বেরিয়ে এল মিনু পিসি। বলল, "কলকাতা থেকে তোমার ছোটকাকিমা ফোন করেছিল। বিকেল তিনটের সময় তোমার ছোটকাকা মারা গেছেন।"

॥ আঠারো ॥

মঁসিয়ে বেনোনিলের ফোনটা এল রাত আটটার সময়। বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে তখন আমি কারখানার কথা ভাবছি। মুম্বই থেকে সিলিং, ফিলিং মেশিন এসে গেছে। আটোমেটিক প্যাকেজিং আর মিকশ্চার মেশিনও। সেগুলো ঠিকঠাক জায়গায় বসাতে আজ সারা দিন লেগে গেছে। হাজার লিটারের দু'টো স্টেনলেস স্টিলের ড্রাম কাল আসার কথা। সঙ্গে পাঁচশো আর একশো লিটারের পাঁচটা করে ড্রামও। কর্ক লিফটার মেশিনটা কোথায় বসাব, ঠিক করতে পারছি না। মাপের গণ্ডগোল হল কেন, বুঝতে পারছি না।

এই সব চিন্তায় ব্যস্ত, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। ও প্রান্ত থেকে মঁসিয়ে বেনোনিল বললেন, "তোমার এন্ট্রি সোসাইটি অ্যাকসেপ্ট করেছে। ওরা এই মাত্র আমাকে জানাল।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। আপনি সাহায্য না করলে এটা সম্ভব হত না।"

"শোনো, মোট একুশটা এন্ট্রি হয়েছে। যে সব কোম্পানি পার্টিসিপেট করেছে, তাতে তোমার কোনও কিছু আশা করা উচিত হবে না। ইন্ডিয়া থেকে আরও একটা এন্ট্রি এসেছে। তোমারটা হল ইয়া। আর অন্যটা মেনকা। এটাও এসেছে তোমাদের কলকাতা থেকে।

শুনে অবাকই হলাম। কলকাতা থেকে কোন কোম্পানি আবার এন্ট্রি পাঠাল? মঁসিয়ে বেনোনিল হিয়া-র উচ্চারণ করলেন ইয়া। ফরাসিরা এইচ-এর উচ্চারণ করে না। কিন্তু মেনকা ব্র্যান্ডটা কে পাঠাল? জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি একটু খোঁজ নিয়ে বলবেন, মেনকা পারফিউমটা কোন কোম্পানির?"

"সুরেশ জালানের। সনেট কোম্পানি। আচ্ছা, একটা কথা বলো তো, সুরেশ জালান লোকটা হঠাৎ কোথায় গায়েব হয়ে গেল?"

বুঝলাম, সুরেশের সাম্প্রতিক কীর্তিকলাপ সম্পর্কে মঁসিয়ে বেনোনিল কিছুই জানেন না। বললাম, "লোকটাকে তো পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে কিছুদিন আগে।" তারপর মার্ডার কেস সম্পর্কে যা জানি, সব বললাম। মিত্রের দোকানে সেদিন শুনলাম, লোকটা আমার পিছনে লেগেছে। এখনও কোনও প্রমাণ পাইনি। তবুও যা বিষ ঢেলে দেওয়ার, দিয়ে রাখলাম।

সব শুনে মঁসিয়ে বেনোনিল বললেন, "লোকটা আমার সঙ্গে কথার খেলাপ করেছে। কারণটা তা হলে এই। তোমাকে ফোন না করলে তো জানতেও পারতাম না শিবাশিস।"

"আমি ভাবছিলাম, আপনাকে জানাব। কিন্তু ফ্যাক্টরির কাজে এমন ব্যস্ত, সময় পাইনি।"

"তোমার পারফিউম বাজারে কবে আনছ?"

"পয়লা অক্টোবর টার্গেট করেছি। জানি না, সম্ভব হবে কি না?"

"ওই দিনটাই কেন?"

"দু'টো কারণে। এক আমার জন্মদিন। দু'নম্বর কারণ, ওই মাসে আমাদের এখানে সব থেকে বড় ফেস্টিভ্যাল। দুর্গাপূজা। অক্টোবর থেকে জানুয়ারি —এই চার মাস পারফিউম বিক্রির ভাল সময়।"

"বটলিং কনসেপ্টটা কী করেছ?"

"পুরোপুরি ওরিয়েন্টাল। মোগল জামানার আতরদানি টাইপের। রঙটা হবে গেরুয়া।"

"তোমাদের দেশে বটলিং ভাল হয় না। এ ব্যাপারে সতর্ক থেকো। কেননা পারফিউম যাঁরা কেনেন, তাঁরা প্রথমে বোতলটা দেখে প্রেমে পড়েন। তারপর পারফিউমের গন্ধ শোঁকেন। এ ব্যাপারে যদি আমি তোমাকে কোনও সাহায্য করতে পারি তো বলো।"

ফট করে মাথায় খেলে গেল বুদ্ধিটা। বললাম, "তা হলে তো খুব ভাল হয়। আমি এখান থেকে আপনাকে চন্দন তেল পাঠাব। ওখান থেকে আপনি বোতলটা করে দিন। সুরেশ জালানের উপর তা হলে আপনাকে নির্ভর করতে হবে না।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমাকে একটু হিসেব করতে দাও। তোমার পারফিউমের লিটারেচারটা আমি পড়েছি। তোমার তো ন্যাচরাল আর সিন্থেটিক মাস্ক দরকার। এত পাবে কোথায়?

"চিনের টংকিং কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আশা করছি, পেয়ে যাব। আপনি ফোর্থ জেনারেশন স্যান্ডাল কেমিকেলের এজেন্সিটা আমাকে করে দিন।"

"তুমি কিন্তু তার আগে বটলিংয়ের প্রোপোজালটা পাঠাবে। আমি সঁ গোবান কোম্পানিকে দিয়ে করিয়ে দেব। পয়লা অক্টোবর তোমার টার্গেট হলে, বেশিদিন সময় নেই।"

"ঠিক আছে।"

ও প্রান্ত থেকে মঁসিয়ে বেনোনিল লাইনটা ছেড়ে দেওয়ার পর আমি উঠে পায়চারি শুরু করলাম। উনি ঠিকই বলেছেন, বোতল সম্পর্কে আমার আরও যত্নবান হওয়া উচিত। ফ্রান্সে থাকার সময় দেখেছি, একটা কোম্পানি অন্য একটা কোম্পানিকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করত বোতলের কারুকার্য আর অভিনবত্বে। একটা নতুন কনসেপ্ট তখন এল 'বিক'। অর্থাৎ ছোট শিশিতে পারফিউম। এমন ছোট যে, মেয়েরা হ্যান্ডব্যাগ আর ছেলেরা পার্সে ফেলে রাখতে পারে। পাঁচ মিলি লিটারের শিশি,

যেখানে সেখানে দু'চারবার ব্যবহার করেই তা ফেলে দিতে পারে। আমি 'বিক' চালু করব আমাদের দেশে।

এ'ছাড়াও মাথায় আছে ন্যুড পারফিউম। অর্থাৎ প্যাকেট ছাড়াই পাবফিউমের বোতল। হু হু করে বিক্রি হবে। বিক আর ন্যুড— সাধারণ লোকেদের জন্য। আর [illegible]ল রাখব পঞ্চাশ আর একশো মিলি লিটারের। এগুলি উচ্চবিত্তদের জন্য। আরেকটা বোতল হবে দু'শো এম এলের। সেটা বিত্তবানদের জন্য। বাজারে এখন অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী। শ্যানেল, ক্রিশ্চিয়ান ডিওর, ইভস সঁ লরোঁ, ল'ওরিয়েল। এই বিদেশি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে লড়াই করে টিকতে হলে আমাকে একটু বৈচিত্র্যের কথা ভাবতেই হবে।

ইন্সটিটিউটে পড়ানোর সময় প্রফেসররা আমাদের প্রায়ই বলতেন, "পারফিউম ইন্ডাস্ট্রিতে তিনটে জিনিস খুবই জরুরি। এক, ভাল নাম। দুই, সুদৃশ্য বোতল। তিন, মনপছন্দ প্যাকেট। সবার উপরে গন্ধ। আমার পারফিউমের নামটা ছোট্ট। হিয়া। উচ্চারণে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। লোকের মনে ঢোকানোর জন্য আদর্শ। আমি বলছি, এটা একুশ শতকের পারফিউম। যৌবনের প্রতীক। কনসেপ্ট দুর্দান্ত। এর উপযোগিতা টের পেলে লোকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিনবে। শুধু খুঁতখুঁত করছিলাম বোতলটা নিয়ে। মঁসিয়ে বেনোনিল সমাধান করে দিলেন।

ব্যরান্দায় পায়চারি করতে করতেই নীচ থেকে পোড়া পোড়া একটা গন্ধ পেলাম। নিশ্চয়ই রান্নাঘরে গ্যাস ওভেনে কিছু বসিয়ে মিনু পিসি এ দিক ও দিক কোথাও গেছে। ধরে যাওয়ার গন্ধটা এখনও পায়নি। আমাদের, মানে পারফিউমারদের নাকটা এত সজাগ, অন্যদের চেয়ে একটু আগেই আমরা গন্ধ পাওয়ার ক্ষমতা ধরি। মাঝে মাঝে নিজের ওপর আমি পরীক্ষাও করি। ভিড়ের মধ্যে একটা পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছি। কে মেখেছে, দেখে তো বোঝা সম্ভব না। জনে জনে জিজ্ঞেস করতে হবে। আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি, কে মেখেছে।

পোড়া গন্ধটা পেয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলাম। দেখি, উনুনে দুধ উপচে পড়ছে। দুধের বাটিটা নামিয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিলাম। মিনু পিসি কি তা হলে নেই? খুঁজতে গিয়ে দেখি, ভাঁড়ার ঘরের মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে মিনু পিসি ঘুমিয়ে আছে। যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ার বদভ্যাস মিনু পিসির। এ জন্য বকুনিও খেত মায়ের কাছে। এখন মা নেই। সারা বাড়িতে একটা কথা বলার লোক পর্যন্ত নেই। মুখ বুজে কাজই করে যাচ্ছে সারা দিন। দেখে এমন মায়া হল, ডাকতে ইচ্ছে করল না। যখন খুশি উঠুক। তখন না হয় ডিনার সারা যাবে।

যুদ্ধের খবর শোনার জন্য ড্রয়িং রুমে টিভি-র সামনে বসেছি। এমন সময় ঘরে ঢুকলেন মিত্তির কাকা আর রমাপ্রসাদবাবু। এত রাতে! দু'জনকে একসঙ্গে দেখে আমি একটু অবাক হলাম। দু'জনে আজ এজরা স্ট্রিটের মার্কেটে গেছিলেন। কেমিকেল সাপ্লায়ারদের সঙ্গে কথা বলতে। ফ্যাক্টরিতে আমার সঙ্গে ওঁদের দেখা হয়নি। কী এমন ঘটল, যাতে ওঁরা দৌড়ে এলেন? রমাপ্রসাদবাবু থাকেন সেই শলপে। এতরাতে বাড়ি ফেরা ওঁর পক্ষে মুশকিল হবে। তবুও এসেছেন। নিশ্চয়ই

গুরুতর কোনও ব্যাপার। আগের মতো, অজানা আশঙ্কায় এখন আর বুকটা ধক করে ওঠে না। মনটা এখন অনেক শক্ত করে ফেলেছি।

বললাম, "কী ব্যাপার, কাকা?"

মিত্তিরকাকা বললেন, "একটা সিরিয়াস ব্যাপার আলোচনা করার জন্য তোমার কাছে আসতে হল বাবা। খুবই আর্জেন্ট।"

"বলুন।"

"শিবাশিস, বোধহয় বেঙ্গল পারফিউমের বিরুদ্ধে কোনও কন্সপিরেসি চলছে।"

"কন্সপিরেসি! কারা করছে?"

"সেটাই তো আমরা বুঝতে পারছি না। গত কয়েকদিন ধরে আমরা এজরা মার্কেট চষে বেড়ালাম। কেউ আমাদের কেমিকেল দিতে রাজি হচ্ছে না।"

"কেন?"

"রাজি হচ্ছে না, কথাটা বলা ঠিক হল না, বাবা। দিতে চাইছে, তবে তিন গুণ দামে।"

"তার মানে? এরা কারা?"

"বড় বড় সব কোম্পানিই। রসিকলাল ভাদুভাই, সিকরি অ্যান্ড সন্স, পাল ব্রাদার্স, ইন্ডিয়া কেমিকেলস.....কত নাম বলব। কর কোম্পানির জন্য এই মাস তিনেক আগেও আমি যে কেমিকেল কিনেছি হাজার টাকা লিটার, এরা চাইছে আড়াই-তিন হাজার। অথচ মার্কেটটা তেমন চড়া নয়। প্রথম প্রথম বুঝতে পারিনি। আমি আর তোমার মিত্তিরকাকা যখনই বেঙ্গল পারফিউমের নাম দিয়ে যাচ্ছি, তখনই দরটা বেড়ে যাচ্ছে। অন্য কোম্পানির নাম বললে কিন্তু দাম বলছে অরিজিনাল।"

কথাগুলো শুনে রাগ হয়ে গেল। বললাম, "আপনি মুম্বই মার্কেটে দেখুন। এজরা মার্কেট থেকে না হয় আমরা কিনব না।"

"সেটা সম্ভব। কিন্তু সময়সাপেক্ষ। তা হলে বাবা, পয়লা অক্টোবরের ডেট লাইনটা তুমি রাখতে পারবে না।"

"এই সপ্তাহে কেমিকেল না পেলে তো প্রোডাকশন শুরু করতে পারব না।"

"সেই জন্যই তো তোমার কাছে এলাম বাবা। একটু আলোচনার দরকার। নিশ্চয়ই কারও কোনও ইন্টারেস্ট আছে। না হলে আমাদের বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটকে চটিয়ে দিত না।"

"সিন্ডিকেট? তার মানে?"

"কলকাতায় কেমিকেল ব্যবসায়ীদের একটা সিন্ডিকেট আছে বাবা। খুব স্ট্রং। এরাই দামটা কন্ট্রোল করে। ইচ্ছে মতো বাড়িয়ে দিতে পারে। কখনও কমিয়ে দেয়। বাইরের লোক ঢুকতে দেয় না সিন্ডিকেটে। যদি না কোনও কারণে বাধ্য হয়।"

"সিন্ডিকেটের পাণ্ডাটা কে রমাপ্রসাদবাবু?"

"সুরেশ জালান। লোকটা মাফিয়া টাইপের। কেউ ওকে চটাতে সাহস পায় না।"

সুরেশ জালান নামটা শোনামাত্রই সোজা হয়ে বসলাম। এই বার বোঝা যাচ্ছে। কার স্বার্থ আছে ষড়যন্ত্রে। লোকটা মেনকা পারফিউম বের করছে। বোধহয় এখানে

কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী চায় না। মিত্তিরকাকাদের কিছু বললাম না। লোকটাকে আমি এমন শিক্ষা দেব, জীবনে ভুলবে না।

মিত্তিরকাকা বললেন, "কী করা যায়, বলো তো শিবাশিস?"

"এজরা মার্কেটে এমন কেউ নেই, যে সিন্ডিকেটের বাইরে?"

"আছে। এস বি ট্রেডার্স। নীলাদ্রি দত্ত বলে একটা ছেলে চালায়। তবে ওর সামর্থ্য কম। এত বড় প্রোজেক্টে মাল সাপ্লাই করার দম ওর নেই।"

"কোম্পানিটা কোথায়?"

"দেবেন মল্লিক রোডে। ছেলেটা থাকে বেলঘরিয়ায়। ফোন নম্বর আছে। নিজে একবার কথা বলবে তুমি?"

"দিন।"

কর্ডলেসটা তুলে মিত্তির কাকা নিজেই সুইচ টিপতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, "কথা বলো বাবা। ছেলেটা লাইনে আছে।"

কর্ডলেসটা কানে ধরেই বললাম, "নীলাদ্রি, আমার নাম শিবাশিস চৌধুরী। আমি....."

ছেলেটা ও পাশ থেকে বলল, "আপনাকে আমি চিনি। মেছুয়া বাজারে মিত্রের দোকানে একদিন আপনাকে দেখেছি। বলুন, শিবাশিসদা, আমাকে কী দরকার?"

"আমি খুব শিগগির একটা ফ্রেঞ্চ কোম্পানির এজেন্সি নিচ্ছি। এমন একটা কেমিকেল আনছি, যা এশিয়ায় পাওয়া যায় না। তুমি কি সাব এজেন্সি নিতে রাজি?"

"কী কেমিকেল শিবাশিসদা?"

"ফোর্থ জেনারেশন স্যান্ডাল কেমিকেল।"

"জানি। জিবোদান রুর রিসার্চ করে বের করেছে। খুব ডিমান্ড হবে আর কিছুদিন পর। আমি রাজি।"

"তার আগে আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। এজরা মার্কেট থেকে কিছু কেমিকেল তোমার কোম্পানির নামে তুলতে হবে। এবং সেটা পৌঁছে দিতে হবে আমার কারখানায়।

"জালানরা আপনার পিছনে লেগেছে বুঝি।"

ছেলেটা বুদ্ধিমান। সেই সঙ্গে পড়াশুনোটাও করে। না হলে চট করে ফোর্থ জেনারেশন স্যান্ডালের নাম জানত না। মনে মনে তারিফ করে বললাম, "হ্যাঁ। আমাদের একজন তোমার কাছে যাবেন। রমাপ্রসাদ মুখার্জি। উনি অর্ডার দিয়ে আসবেন। তোমার যা মার্জিন, রেখে দেবে। যদি টাকা পয়সা আগে দরকার হয়, বলতে সংকোচ করবে না।"

নীলাদ্রি বলল, "অর্ডারটা হিউজ কোয়ান্টিটির হবে নিশ্চয়। তা হলে সিন্ডিকেটকে একবারের বেশি ফাঁকি দিতে পারব না শিবাশিসদা। কেন না, আমার ক্ষমতা সবাই জানে। আমার পিছনে লোক লেগে যাবে। মালটা কোথায় যাচ্ছে, তা জানার জন্য।

"কারেক্ট। সে নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। ভবিষ্যতের ব্যবস্থা আমি করছি। সিঙ্গাপুর আর চায়না থেকে আমি মাল আনাব। এজরা স্ট্রিটে যাবই না।"

"তা করবেন না শিবাশিসদা। জালানরা এত ক্ষমতা ধরে, বিদেশ থেকে আপনাকে সরাসরি মাল আনতে দেবে না। বিদেশে আপনি চিঠি লিখবেন। ওরা আগে জালানদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তারপর লিখে জানাবে, কলকাতায় আমাদের এজেন্ট আছে। মালটা তার কাছ থেকে নাও। এদের টপকে আপনি কিচ্ছু করতে পারবেন না।"

সম্ভব। নীলাদ্রি যা বলছে, সম্ভব। তবুও বললাম, "তুমি এ যাত্রায় আমাকে দেখো। ভবিষ্যতে আমিও তোমায় দেখব। ঠিক আছে? ছাড়ি তা হলে?"

নীলাদ্রি বলল, "দাঁড়ান শিবাশিসদা, আরেকটা ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি। কারখানায় যা কেমিকেল বা অ্যালকোহল রাখবেন, তার কাগজপত্রে যেন কোনও গোলমাল না থাকে। এই হিসেবটা, যত বিশ্বাসী লোকই আপনার কাছে কাজ করুক, কারও হাতে ছাড়বেন না।"

"কেন বলো তো?"

"চোখের সামনে দু'টো ফ্যাক্টরিকে ডুবে যেতে দেখলাম। সেই কারণেই বলছি। একসাইজের লোক আপনার পিছনে লাগিয়ে দেবে জালানরা। আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। মিত্রের মুখে আপনার সম্পর্কে যা শুনেছি, তাতে মনে হয়েছে আপনি ক্রিয়েটিভ টাইপের লোক। এত নোংরামির বিরুদ্ধে লড়া আপনার পক্ষে মুশকিল। কথাটা বললাম বলে কিছু মনে করলেন না তো?"

"না। বরং তোমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছেটা আমার বাড়ল। এসো একদিন ডোমজুড়ে। খুশি হব।"

রমাপ্রসাদবাবু আর মিত্তিরকাকা আমাদের কথা শুনছিলেন। ওঁদের বললাম, "কাল ছেলেটার অফিসে গিয়ে দেখা করুন বেলা দশটায়। প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিই। পরে দেখছি, সিন্ডিকেট পাণ্ডাদের কী করা যায়।"

দু'জনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। রমাপ্রসাদবাবু বললেন, "তা হলে এখন ওঠা যাক। আমাকে আবার অনেকদূর যেতে হবে।"

বললাম, "চিন্তা করবেন না। আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।"

রমাপ্রসাদবাবু বললেন, "না বাবা, থাক। কারও কাছ থেকে একটা সাইকেল চেয়ে নিচ্ছি। পৌঁছে যাব।"

মিত্তিরকাকারা চলে যাওয়ার পর আমি লনে বেরিয়ে এলাম। বাগানে এত ফুল ফুটে আছে। অথচ আজ তার কোনও গন্ধ পেলাম না। আমার মাথায় সুরেশ জালানের নামটা দৌড়ে বেড়াচ্ছে। আমার সম্পর্কে বোধহয় খোঁজ-টোজ নেয়নি। তাই নানারকম ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে লোকটা। আসলে সুগন্ধির বাজারে আমার যাওয়া-আসা নেই। তাই বাজারের গতিপ্রকৃতি নিয়ে কোনও ধারণা নেই। সুরেশ জালানরা কী ভাবছে, কী করতে চাইছে, তা আমার জানা দরকার। নীলাদ্রি? না ওর পক্ষে জালানের মতি গতি জানা সম্ভব নয়। তা হলে কে পারবে, আমাকে খবর এনে দিতে? কালুয়াকে পিছনে লাগিয়ে দেব? না, ওর পক্ষেও সম্ভব নয়। জালানকে টাইট দেওয়ার জন্য ওকে অন্যভাবে কাজে লাগাতে হবে।

লনে পায়চারি করতে করতে ভাবছি। মঁসিয়ে বেনোনিলের সঙ্গে তাজ হোটেলে আমাকে দেখেই সুরেশ জালান মনে মনে নিশ্চয়ই প্রমাদ গুণেছিল। তারপর হয়তো জিজ্ঞাসাও করেছে আমার সম্পর্কে কিছু কথা। কলকাতায় বসে হয়তো খবর রাখছে ডোমজুড়ে কারখানা চালু করার জন্য আমি কী কী করছি। কে দিতে পারে ওকে এই সব খবর? আমার ঘনিষ্ঠদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ না। তা হলে কে হতে পারে, যার সঙ্গে জালানের যোগাযোগ আছে। মুহূর্তেই মনের মধ্যে ভেসে উঠল একটা মুখ— পলি বিশ্বাস। হ্যাঁ সম্ভব। ওর সঙ্গে জালানের যোগাযোগ থাকা সম্ভব। তা হলে কি জালানই চর হিসাবে ওকে বেঙ্গল পারফিউমে ঢুকিয়েছে?

কথাটা মাথায় ঢোকার পরই ড্রয়িং রুমে ফিরে এলাম। অমিতকে একটা ফোন করা দরকার। ডায়াল করে নামটা বলতেই ও প্রান্তে একজন বলল, "ধরুন।" ফোনের ভেতরে আওয়াজ পাচ্ছি মিউজিকের। ঘরে বেশ কিছু লোক কথা বলছেন। বোধহয় কোনও অনুষ্ঠান আছে। কয়েক মুহূর্ত পর অমিত এসে বলল, "কে বলছেন?"

বললাম, "শিবা। তুই কি খুব ব্যস্ত?"

"তেমন কিছু নয়। আজ সুধার জন্মদিন। তাই বাড়িতে পার্টি দিচ্ছি। তা, তুই হঠাৎ ফোন করলি?"

"তোকে যা খোঁজ করতে বলেছিলাম, করেছিস?"

"হ্যাঁ। অনেক ইন্টারেস্টিং খবর আছে। একটা বলছি, তা হলেই বুঝতে পারবি। সুরেশ বাস্টার্ড তোদের ডোমজুড়ের ফ্যাক্টরিটা কিনতে গেছিল। তুই জানিস?"

"ধূর, কী বলছিস তুই? লোকটার নাম তো সুজিত ঢোলকিয়া।"

ও প্রান্তে হা হা করে হাসল অমিত। তারপর বলল, "শিবা, সবে বিজনেসে নেমেছিস তো। পাকতে তোর সময় নেবে। ওই সুজিত ঢোলকিয়া আসলে সুরেশ জালানেরই লোক। ওর জালান পারফিউমের একজন পার্টনার।"

"তা হলে ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি করার কথা বলছিল কেন?"

"ওটা তো ভাঁওতা। পারফিউম ফ্যাক্টরি করবে বললে তোর ছোটকাকা নাও বিক্রি করতে পারত। দ্বিতীয়ত, পুরনো লোকজন, কর্মীরা এসে হুজ্জুত শুরু করত ফের ওদের নেওয়ার জন্য। কারখানার লায়াবিলিটিজ কাঁধে নিতে হত। ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই কারণেই সারের কারখানার নাম করেছিল। সব ভেস্তে দিল লোকাল কিছু ছেলে। তোর ছোটকাকাও বেঁকে বসল। ফ্যাক্টরিটা তুই পেয়ে গেলি। সুরেশের বাড়া ভাতে তুই ছাই দিয়েছিস। একটু সাবধানে থাকিস।"

"আর কী খবর আছে তোর কাছে?"

"পরে বলব। প্লিজ, কিছু মনে করিস না। শ্বশুরবাড়ির লোকজন সব এসে গেছে। বুঝতেই পারছিস, আমাদের বাঙালিদের মধ্যে কত কথা ওঠে, এ সময়টায় ওদের সামনে না থাকলে। কাল তোর সঙ্গে কথা বলব। বাই।"

বলেই অমিত লাইনটা কেটে দিল।

boiRboi.net

॥ উনিশ ॥

হিয়ার বিজ্ঞাপন শুরু করব টিভি-তে। সেজন্য একটা অ্যাড এজেন্সির সঙ্গে মাঝে একদিন কথা বলেছিলাম। তারা বিভাস নন্দী বলে একজনকে পাঠিয়েছে আলোচনার জন্য। ছেলেটা আমারই বয়সী। পুনে ফিল্ম ইন্সটিটিউট থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। এর আগে একটা ডিটারজেন্ট কোম্পানির বিজ্ঞাপন করেছে। বেশ বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে বিজ্ঞাপনে। হিয়া-কে আমি একুশ শতকের পারফিউম হিসাবে দেখাতে চাই। যৌবনশক্তিরও। বিভাস নন্দী মাঝে একদিন ফোনে কথা বলেছিল। তখন মনে হল, ছেলেটা বিজ্ঞাপন নিয়ে বেশ ভাবনা-চিন্তা করছে।

আমি এমন একটা বিজ্ঞাপন করতে চাই, যা নিয়ে বেশ হইচই হবে। কামসূত্রের বিজ্ঞাপনটার মতো। বিবেক বাওয়া বলে একজন মডেল তাতে কাজ করেছিল। আমার ইচ্ছে ছিল, তাকে নেওয়া। কিন্তু এজেন্সির লোকজন ওর যা পারিশ্রমিক বলল, তা শুনে পিছিয়ে গেছি। বিভাস নতুন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বিজ্ঞাপনটা করতে চায়। আমার তাতে আপত্তি নেই। কম বাজেটের বিজ্ঞাপন। উপায় নেই।

বিভাস নন্দীকে ঘরে ডেকে পাঠালাম। পরনে লখনউয়ের কাজ করা ঘিয়ে রঙের ময়লা পাঞ্জাবি। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। চুলে অযত্নের ছাপ। একটু পাগলাটে ধরনের। দেখেই মনে হল, ভাবুক প্রকৃতির। কাজটা যত্ন নিয়ে করবে। হাতের ফাইলটা খুলে সরাসরি আলোচনায় বসে গেল। বলল, "গোটা তিনেক আইডিয়া আমার মাথায় ঘুরছে। ফাইলে সব লেখা আছে। পড়ে আপনার মতামত দেবেন।"

"ছেলে-মেয়ে বেছেছেন?"

"কয়েকটা পোর্টফোলিও দেখেছি। পছন্দ হচ্ছে না।"

"আমি একজনকে রেফার করতে পারি?"

"বলুন।"

"হিয়া ঘোষাল বলে একটা মেয়ে এবার মিস ক্যালকাটা হয়েছে। তাকে ট্রাই করতে পারেন।"

"তার কি কোনও এজেন্ট আছে?"

"সঠিক বলতে পারব না। সম্ভবত ড্রিম মার্চেন্টস। তবে মেয়েটার অ্যাড্রেস আর ফোন নম্বর দিতে পারি। এই অঞ্চলেরই মেয়ে।"

"দিন। এখন কথা বলা যাবে?"

"মনে হয় বাড়িতেই আছে। রেফারেন্সটা আমার, এটা কিন্তু বলা যাবে না।"

"দরকার নেই। মেয়েটাকে আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।"

হিয়ার টেলিফোন নম্বরটা দিতেই বিভাস নন্দী ডায়াল করল। নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, "আমি অ্যাড ফিল্ম করি। সেই ব্যাপারেই ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

সঙ্গে সঙ্গে কর্ডলেসের সুইচটা অন করে দিলাম। হিয়া কী বলছে, তা শোনার জন্য। ও প্রান্তে হিয়া বলল, "কী ব্যাপার বলুন।"

"একটা পারফিউম কোম্পানির অ্যাড ফিল্ম করতে চাই। আপনি কি

ইন্টারেস্টেড?"

হিয়া বলল, "কোম্পানিটা কোথাকার জানতে পারি?"

"সেটা এখনই বলা সম্ভব না।"

"আমার ফোন নম্বর কোথায় পেলেন?"

"ভিম মার্চেন্টস থেকে।"

গলার স্বর স্বাভাবিক হল হিয়ার। বলল, "আমার ব্যাপারে ওদের সঙ্গেই কথা বলুন।"

বিভাস বলল, "ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে কি দেখা করা যেতে পারে?"

"আপনি এখন কোথায়?"

"ডোমজুড় বাস স্ট্যান্ডের কাছে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। ইন ফ্যাক্ট আপনার খোঁজ নিতেই এসেছিলাম।"

"ও। আমার বাড়ি থেকে আপনি তা হলে খুব কাছেই। চলে আসতে পারেন। খাটোরা। স্কুল মাঠের কাছে। জিজ্ঞেস করলে যে কেউ বলে দেবে।"

"আমি তা হলে আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি ম্যাডাম।"

"আসুন।"

ফোনটা ছেড়েই বিভাস বলল, "ভয়েসটা তো বেশ ভাল। পর্দায় কেমন লাগবে, দেখতে হবে। খাটোরা এখান থেকে কদ্দূর মিঃ চৌধুরী?"

"মিনিট দশেক লাগবে।"

"আমি তা হলে একবার ঘুরেই আসি। ফিরে এসে না হয় কথা বলা যাবে।"

"আসুন তা হলে।"

বিভাস চলে যাওয়ার পর বাইরে বেরিয়ে এলাম। রিশেপসনে দেখা পলি বিশ্বাসের সঙ্গে। আমাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, "মিঃ মিত্র আপনাকে একবার ফোন করেছিলেন।"

মিত্তিরকাকা নীলাদ্রির কাছে গেছেন। কেমিকেলের ব্যাপারে। কী হল, ফোনে জানাতে বলেছিলাম। দুঃশ্চিন্তায় রাতে ঘুম হয়নি কাল। বললাম, "কী বললেন, উনি?"

"বললেন, যে ভদ্রলোকের কাছে গেছেন, তাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসার জন্য রওনা দিচ্ছেন। আপনি কি কোথাও বেরোচ্ছেন? কেউ এলে কিছু বলতে হবে?"

"না। তাকে বসতে বলবেন। আমি একবার মাকড়চণ্ডীর মন্দির থেকে ঘুরে আসছি।"

"মন্দির তো এখন খোলা পাবেন না। বেলা এগারোটায় বন্ধ হয়ে যায়।"

"তাই বুঝি! তা হলে তো এখন গিয়ে লাভ হবে না।"

"শিবাশিসদা, আপনাকে খুব টায়ার্ড লাগছে। হিয়াদি সেদিন বলছিল, আপনার বাড়িতে নাকি দেখাশুনা করার মতো কেউ নেই!"

পলি বিশ্বাস কি ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছে? আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে ওর এত আগ্রহ কেন? একবার ভাবলাম, উত্তর না দিয়ে চলে যাই। পরক্ষণেই মনে হল, পলি

বিশ্বাস আমার কারখানার কর্মী। অভদ্রতা করে লাভ নেই। বললাম, "হিয়া আর কী বলেছে?"

"ক্লাবের ছেলে-মেয়েদের সামনে উনি আপনার খুব প্রশংসা করেন।"

হেসে বেরিয়ে এলাম। মাকড়চণ্ডীর মন্দিরে একবার আমাকে যেতেই হবে। কালুয়া দাঁড়িয়ে থাকবে আমার জন্য। ওকে কিছু খবর দেওয়ার ছিল। অমিত খেতান ফোন করলে সেই খবরগুলো দিতে পারতাম। কিন্তু আজ দুপুর পর্যন্ত অমিত ফোন করেনি। এমন তো হওয়ার কথা নয়। নিশ্চয়ই কোনও সমস্যায় পড়েছে।

গাড়ি নিয়ে হাইওয়েতে উঠতেই দেখি, রাস্তা জ্যাম। একটা মিছিল আসছে মাকড়দা থেকে। কার্গিল যুদ্ধে যারা শহিদ হয়েছে, তাদের পরিবারদের জন্য অর্থ সংগ্রহের মিছিল। রাস্তা জুড়ে বিরাট ব্যানার। মিছিলের সামনের দিকে কয়েকটা মোটরবাইক। উল্টোদিকের বাস-ট্র্যাক দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। মিছিলের সামনের দিকে হঠাৎই লখাকে চোখে পড়ল। একটা অটো-র উপর দাঁড়িয়ে মাইকে অর্থ সাহায্যের আবেদন করতে করতে যাচ্ছে। আর মাস তিনেক পরেই ভোট। এখন ওদের এ সব কাজে নামা দরকার। মারুতির কালো কাচটা তুলে দিলাম। যাতে আমাকে চোখে না পড়ে।

মিছিলটা ডোমজুড়ের দিকে চলে যেতেই দেখি, অমিতের সুমো কারখানার দিকে বাঁক নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলাম। আমাকে ও বলল, "তোর বাড়িতে ফোন করলাম। বলল, তুই এখানে।"

"চল, আগে আমার ঘরে বসবি। তোর সঙ্গে আমার অনেক পরামর্শ করার আছে।"

অমিত চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই বলল, "তুই তো বেশ গুছিয়ে ফেলেছিস শিবা। এত অল্প সময়ের মধ্যে করলি কী করে?"

"আমার ভাল লোকজন আছে।"

দু'জনে এসে আমার ঘরে বসলাম। ব্রিফকেস থেকে একটা প্যাকেট বের করে অমিত বলল, "এই নে। তোর জন্য ক্যাসেট নিয়ে এসেছি। মিস ক্যালকাটা কনটেস্টের। তোকে যে কথাটা দিয়েছিলাম, সেটা কিন্তু আমি রেখেছি। মেয়েটা কিন্তু টাইটেল পেয়েছে।"

বললাম, "থ্যাঙ্কস।"

"শালা, এইবার খুলে বল তো, হিয়া ঘোষালের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছিস না তো। ওই মেয়েটার জন্য তোর এত আঠা কেন?"

"মেয়েটা আমাকে দেখলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে বলে।"

উরুতে থাবড়া মেরে অমিত বলল, "তা হলে তো গভীর প্রেম রে। শোন, গিরিশ পার্কের মোড়ে স্কুল-ফেরত সুধার জন্য যখন আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম, তখন একবার জুতো খুলে দেখিয়েছিল। হা, হা হা।" কথাটা বলেই ও হাসতে লাগল।

"তুই কী করলি?"

"পরের দিন দাঁড়িয়ে রইলাম। ও না-দেখার ভান করে চলে গেল। তারপরের দিন দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার দিকে তাকিয়ে একবার ফিক করে হাসল। তারপরের দিন সাহস করে একটা চিরকুট এগিয়ে দিলাম। সেটা হাতে নিয়ে গুটলি পাকিয়ে ফেলে দিল। তারপরের দিন ফের দাঁড়িয়ে রইলাম। ওই, সেই দিনগুলোই ভাল ছিল রে।"

"তোর ধৈর্য আছে।"

"তা, হিয়া ঘোষালের সঙ্গে তোর কেসটা এখন কী অবস্থায় আছে বল তো? মিস ক্যালকাটা কনটেস্টে রীতা মেটা বলে একটা মেয়েকে প্রায় টাইটেল দিয়ে ফেলেছিল জাজরা। আমি বললাম, নাথিং ডুয়িং। হিয়া ঘোষালকেই টাইটেল-টা দিতে হবে। তবে মেয়েটার ট্যালেন্ট আছে। দেখবি, মিস বেঙ্গল কনটেস্টেও মেয়েটা বেরিয়ে যাবে।"

"কবে সেটা?"

"এই তো মাসখানেকের মধ্যে। আমি ওই ব্যাপারেই তোর সঙ্গে কথা বলতে এলাম। সুরেশের জালান পারফিউম কোম্পানি মিস বেঙ্গল কনটেস্ট স্পনসর করতে চাইছে। তখনই আমার কথাটা মনে হল, তুই স্পনসর করবি? আগেও বলেছি, ভাল পাবলিসিটি পেয়ে যাবি।"

"কীভাবে?"

"একটা নামী টিভি চ্যানেল পুরো প্রোগ্রামটা লাইভ দেখাবে মিস বেঙ্গল কনটেস্টের। প্রায় এক ঘণ্টার প্রোগ্রাম। কনটেস্টের ফাঁকে ফাঁকে তোর অ্যাড দেখাতে পারবি।

"কত টাকার ইনভলভমেন্ট রে?"

"লাখ দশেক টাকা। কিন্তু তুই পাবলিসিটি পেয়ে যাবি পঞ্চাশ লাখ টাকার। তোর প্রোডাক্টের নামটা কী রে?"

"হিয়া।"

চেয়ার ছেড়ে পড়ে যাবার ভান করল অমিত। তারপর বলল, "তুই তো আমার থেকেও বড় প্রেমিক রে শিবা। শাহাজানকেও টপকে গেছিস। মাই গড। বাড়ি ফিরে সুধাকে আজ বলতেই হবে।"

ওর কাণ্ড দেখে আমি হাসছি। কে বলবে, ও পাঁচ ছ'টা কোম্পানির মালিক। মোট টার্নওভার যার একশো কোটি টাকার। অমিতকে দেখে মনে হচ্ছে, উত্তর কলকাতার রকবাজ ছেলে। বললাম, "আসলে কী জানিস, আমার ব্র্যান্ডের কনসেপ্ট হৃদয়কে নিয়ে। সেই কারণেই হিয়া।"

"মাজাগি ছাড় তো। তুই তো দেখছি হাবুডুবু খাচ্ছিস। ইস, এই কথাটা যদি আগে জানতাম, তা হলে কনটেস্টের দিনই ভাল করে আলাপটা সেরে রাখতাম। আমার সঙ্গে অবশ্য দু'দিন পরেই দেখা হবে হিয়া ঘোষালের। তখন চিমটি কেটে দেখতে হবে।"

"কোথায় দেখা হবে?"

"আমাদের রোটারি ক্লাবের একটা ফাংশানে। কলামন্দিরে অনাথ শিশুদের অর্থ

সাহায্যের প্রোগ্রাম। তুই যাবি?"

"তোর মাথা খারাপ। পয়লা অক্টোবর পর্যন্ত আমার মরার সময় নেই।"

"তুই শালা, কোনওদিন সাকসেসফুল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে পারবি না। লাখ লাখ টাকা কামালেও না।"

"কেন?"

"শিল্পপতি হিসাবে সফল হতে হলে তোকে সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হতে হবে। সমাজসেবা করতে হবে। না হলে তোকে কেউ পুছবে না। এই দ্যাখ না, জালান-খৈতান-নেউটিয়া-টোডিরা কোথায় নেই। বড় বড় স্কুলগুলো সব কিনে নিচ্ছে। নার্সিং হোম আর হাসপাতালগুলো সব ওদের দখলে। সিনেমা, টিভি সিরিয়ালগুলোর প্রোডিউসারদের নামগুলো দ্যাখ। চেম্বার অফ কমার্সগুলোর কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি, সোশাল ক্লাবগুলোর মাথাতেও ওরা বসে আছে। আমরা কোথাও নেই।"

অমিতের বাঙালিয়ানা দেখে আমি হাসছি। বললাম, "ও সব কথা ছাড়। কাজের কথা বল। স্পনসরশিপ নিলে আমার কী সুবিধা হবে?"

"বললাম তো। তোর টার্গেট বায়ার কারা? ইয়ং জেনারেশন নিশ্চয়। সুস্মিতা সেন মিস ইউনিভার্স হওয়ার পর থেকে আমাদের দেশে ছেলে-মেয়েরা বিউটি কনটেস্ট আর মডেলিং নিয়ে খুব মেতেছে। মিস ক্যালকাটা কনটেস্ট আমরা আগে যখন করতাম, মাছি তাড়াত। এখন হাজার টাকার টিকিট কেটে লোকে দেখতে যাচ্ছে।"

"ঠিক আছে, আমি রাজি। কী করতে হবে বল।"

"তোকে কিচ্ছু করতে হবে না। আমাদের অর্গানাইজেশনই সব করবে। তুই খালি মাল-টা দিবি। আর মঞ্চে উঠে প্রাইজ দিবি। ব্যস। স্পনসরশিপের চিঠিটা তুই কালকের মধ্যে পাঠিয়ে দিবি। আমাদের অর্গানাইজেশনে আবার সুরেশের একটা চামচে আছে। সে শালা, জালান পারফিউমকে ঢুকিয়ে দিতে পারে। আমি বাধা দেব।"

"ও এখন কোথায়?"

"বেরিয়ে এসেছে। আবার অফিসে যাতায়াত শুরু করেছে। মাঝেমধ্যে আমাদের বাড়িতে ফোন করে ভয় দেখাচ্ছে। পুলিশ হাতে, দু'টো মন্ত্রী পকেটে। ভাবছে ওকে কেউ কিছু করতে পারবে না।"

"সুরেশ কি কোনও পারফিউম বের করেছে?"

"হ্যাঁ। মেনকা নামে একটা পারফিউম। থার্ড ক্লাস।"

"তুই ব্যবহার করেছিস নাকি?"

"টয়লেট সাফাইয়ে ব্যবহার করি। আমার শ্বশুরমশাই বলল, তোমরা ইউজ কোরো না। স্কিন ডিজিজ হয়ে যাবে। তবুও, শূয়ারের বাচ্চাটার এমন লাক একেবারে কপাল থেকে পা পর্যন্ত। দেখবি, বাজারে ঠিক চলবে।"

"তোকে যে খবরগুলো নিতে বলেছিলাম, নিয়েছিস?"

"হ্যাঁ। ফ্রান্সের সেই কনট্র্যাক্ট সম্পর্কে তো? হিউজ পরিমাণে স্যান্ডাল অয়েল পাঠাচ্ছে। ওর অফিসে আমার একটা ছেলে চাকরি করে। ছেলেটার নাম গোপাল

বণিক। সে-ই ওকে ভুরিয়ে যাচ্ছে। সুরেশ জানেও না, ফ্রান্সে কী কোয়ালিটির মাল গেছে। ও-ই কনট্রাক্ট বাতিল হতে বাধ্য।"

"তুই কি পিছনে লেগে করালি?"

"অফ কোর্স। তোকে তো সেদিন বলেই গেছিলাম। সুরেশ বাস্টার্ডটাকে ডোবানোর জন্য যা কিছু করার আমি করব।"

"ওর ফ্যাক্টরিটা একজ্যাক্টলি ইস্টার্ন বাইপাসের কোথায়?"

"রুবি হাসপাতালের পিছনে। গাভমেন্ট থেকে দশ একর জমি বাগিয়ে নিয়েছে। যখন ভাল সম্পর্ক ছিল তখন একদিন বলল, দু'চার বছর পারফিউম বিজনেস করব, তারপর একদিন সব তুলে দিয়ে ওখানে একটা নার্সিং হোম খুলব। আসল ইনভেস্টমেন্ট তখনই করব। জালান পারফিউমস বোর্ডটা খুলে জালান নার্সিং হোম লাগাব।"

"এ রকম দু'নম্বরি করলে তো ধরা পড়ে যাবে।"

"তার পরোয়া করে নাকি? এজরা মার্কেটে ওর যে গোডাউনটা আছে, সেটাও পুরোপুরি বেআইনি। একটা পাঁচতলা বাড়ির একতলায় হাজার হাজার লিটার কেমিকেল আর অ্যালকোহল। একেবারে জতুগৃহ হয়ে রয়েছে।"

"নিশ্চয়ই ফায়ার লাইসেন্স আছে।"

"ঘোড়ার ডিম।"

"ওর গোডাউনটা কোথায় রে?"

"অফিস আর গোডাউন একই প্রেমিসেসে। ১৪৭ বাই এক এজরা স্ট্রিট। তোকে তো চেনে না। একদিন গিয়ে দেখে আসতে পারিস।"

"তুই একটা খবর দিতে পারবি, সুরেশ বাজারে যে নতুন পারফিউমটা ছাড়ছে, তার বটলিং করছে কোথায়?"

"জানি না। তবে বললে এখনই জেনে নিতে পারি। বটলিং কি আলাদা জায়গা থেকে করতে হয়?"

"হ্যাঁ। আমাদের মিত্তিরকাকা বলছিলেন, জালান পারফিউমস নাকি মেনকা পাতলা রুপোর বোতলে বিক্রি করবে।"

"তা হলে তো বেশ কস্টলি হয়ে যাবে।"

"হয় হবে। লোককে তো টুপি পরানো যাবে। বিদেশে এখন এই সব হিড়িক উঠেছে।"

"রুপোর বোতল যদি হয়। তা হলে মনে হয় ও জয়পুরের কোনও কোম্পানিকে দিয়ে করাবে। কলকাতাতেও শাঁখারিপাড়ায় কয়েকটা দোকান আছে, যারা তৈরি করে।"

"ঠিক কোন জায়গা থেকে সুরেশ কাজটা করাচ্ছে, সেটা আমি জানতে চাই।"

"কেন? তুইও মার্কেটিং স্ট্রাটেজি পালটাবি তা হলে?"

"ঠিক ধরেছিস।"

"দাঁড়া, এখুনি জেনে দিচ্ছি তোকে।" বলেই অমিত পকেট থেকে মোবাইল

ফোনটা বের করে কাকে যেন ফোন করল। দু'একটা কথা বলার পরই জিজ্ঞেস করল, "সিলভার বটল কোত্থেকে করছে, তুই জানিস?.....তা হলে জয়পুর থেকে নয়।.....ও কে, ঠিক আছে।" বলেই লাইনটা কেটে দিল অমিত। ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে তারপর আমাকে বলল, "যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। শাঁখারিপাড়ায় দত্ত অ্যান্ড কোম্পানি থেকে রুপোর বোতল তৈরি করাচ্ছে।"

"তা হলে প্রাইস খানিকটা কম রাখতে পারে। প্রায় একই সময়ে আমার পারফিউম বাজারে আসছে। তাই দামটা আমার ঠিক রাখতে হবে।"

"তুই একবার নিজে গিয়ে বা লোক পাঠিয়ে তো খবরটা নিতে পারিস। তবে সাবধান। সুরেশ জালান কিন্তু সাপের বাচ্চা।"

"দূর, আমার অত দরকার নেই।"

কোচাই চায়ের ট্রে নিয়ে এল। আমি আর অমিত দু'জনে মিলে চা খেতে লাগলাম। সুরেশ জালান সম্পর্কে আপাতত আর কিছু জানার নেই। অমিত একটা খবর দিয়েছে। সেটাই যথেষ্ট। এজরা স্ট্রিটের ওই ঠিকানাটা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। কালুয়াকে জানিয়ে দিতে হবে। বেচারি, হয়তো এখনও মাকড়চণ্ডীর মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তবে ওকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। দেখা না হলেও, ও রাতে অবশ্যই আমাকে ফোন করবে।

চা শেষ করে অমিত উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, "আজ চলি রে। এক দিন আয় না আমাদের বাড়িতে। বাড়িতে কাল ফোন করেছিলি জানার পর আমাকে তো সুধা প্রচণ্ড বকাবকি করল। তোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। চল না একদিন, বসে আড্ডা মারা যাক। পারলে হিয়াকে নিয়ে চল। সুধা খুশি হবে।"

বললাম, "যাব।"

অমিত চলে যাওয়ার পর ঘড়িতে দেখলাম, প্রায় আড়াইটা বাজে। মন্দিরে গিয়ে আর লাভ নেই। অমিতকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে, ঘুরতে ঘুরতে পিছনের গেট দিয়ে আমার ঘরে এলাম। মিত্রের দোকানে একবার ফোন করা দরকার। একবার জিজ্ঞাসা করতে চাই, জালানের সিন্ডিকেটে ওরাও আছে কি না?

ফোনটা তুলতেই মেয়েলি গলা শুনতে পেলাম। তার মানে রিশেপসনে কেউ কথা বলছে। এ তো পলি বিশ্বাসের গলা! কার সঙ্গে কথা বলছে? শুনতে লাগলাম, "অমিত খৈতানের সঙ্গে শিবাশিসদা এই মাত্র বাইরে গেলেন। তোমার সম্পর্কে খুব নিন্দে করছিল। রাতে তুমি একবার এসো। ডিটেল বলব।"

আমার সন্দেহটা তা হলে ঠিক। সুরেশ জালানের কাছে তা হলে সব খবর পলি বিশ্বাসই দিচ্ছে! আমি যে পিছনের গেট দিয়ে ঢুকব, ও তা ভাবতেও পারেনি।

॥ কুড়ি ॥

সকালবেলায় কেয়াদি এসে হাজির। ড্রয়িংরুমে বসে আমি আর জোজো টি ভি দেখছি। এমন সময় ঘরে ঢুকে কেয়াদি বলল, "শিবাশিস, চলো ভাই। আমি তোমাকে নি[illegible]ছি।"

কেয়াদিকে আগের মতো ঝলমলে লাগছে। দেখে মনটা খুশিতে ভরে উঠল। বললাম, "কোথায়?"

"আমাদের বাড়িতে। তুমি নাকি পণ করেছ আমাদের বাড়িতে আর কখনও যাবে না?"

"কে বলল?"

"হিয়া। ওর জন্মদিনে তুমি গেলে না। পরশু মা খুব দুঃখ করছিল। হিয়া কি তোমার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেছে।"

"না। আসলে সময় পাচ্ছি না।"

কথাটা সত্যি না। তিনদিন আগে সুপ্রতিমবাবু আমাকে নেমন্তন্ন করে ছিলেন হিয়ার জন্মদিনে। তখনই বলে দিয়েছিলাম, যাওয়ার চেষ্টা করব। যাব, বলিনি। এমন কিছু কাজ ছিল না সেদিন। তবু কাজ দেখাতে সে দিন অমিতদের বাড়ি গিয়ে বসেছিলাম। বাড়িতে থাকলে জোজো নির্ঘাত ও বাড়িতে খবরটা পাচার করে দিত। হিয়ার স্পাই বললেও ওকে কম বলা হয়। পরশু যেতাম। যদি হিয়া নিজে ফোন করে জানাত। তবে আমি না গিয়েও সেদিন ডোমজুড়ের 'বাগিচা' দোকানটা থেকে এক গোছা ফুল আর আমার তৈরি একটা পারফিউমের বোতল পাঠিয়েছিলাম। সেটা অবশ্য ফেরত আসেনি।

কেয়াদি নাছোড়বান্দার মতো বলল, "আজ আমি কোনও কথা শুনব না। তোমাকে যেতেই হবে।"

মনে মনে ঠিক করেই নিলাম, যাব না। কিন্তু অভদ্রতা তো করা যায় না। কেয়াদির অনুরোধের মাত্রাটা যাতে ধীরে ধীরে কমে যায়, আগে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই বললাম, "কেয়াদি, আগে বসুন। আজ আপনাদের বাড়িতে কি কোনও অনুষ্ঠান আছে?"

"হ্যাঁ, মা সত্যনারায়ণের পুজো দিচ্ছেন। তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। চলো।"

সত্যনারায়ণের পুজো মানে সিন্নি। ছোটবেলায় খুব ভাল লাগত। মা খুব ভাল সিন্নি করত। মা চলে যাওয়ার পর থেকে আমাদের বাড়িতে পুজো-টুজো সব উঠে গেছে। ঠাকুর-দেবতায় আমার তেমন ভক্তি নেই। বললাম, "পুজোর বাড়িতে আমি গিয়ে কী করব, কেয়াদি?"

"চলো না। আজ স্বপনকাকুও আসছেন কলকাতা থেকে। উনি তোমাকে থাকতে বলেছেন। পুজো হয়ে গেলে বাবা আর স্বপনকাকুরা রামনগরের বিলে মাছ ধরতে যাবেন।"

স্বপনবাবুর কথা শুনে একটু দমে গেলাম। ভদ্রলোক আমার এত উপকার

করেছেন, ভোলার নয়। সাত দিনের মাথায় ব্যাঙ্কের লোন স্যাংশন করে দিয়েছেন। এখানে যেদিন আসেন, সেদিনই অবশ্য বলেছিলেন ফের একদিন আসবেন মাছ ধরতে। ইস, আমারই নেমন্তন্ন করে আনা উচিত ছিল। ভদ্রলোক আমার সম্পর্কে কী ভাবলেন, কে জানে।? কেয়াদিকে বললাম, "আমার স্নান করা হয়নি। পুজোর বাড়িতে স্নান না করে যাওয়া কি ভাল দেখাবে?"

"আমি বসছি। তুমি স্নান করে এসো। কাল এত করে বলে দিলাম জোজোকে। এই পাজি, তুই মামাকে কিছু বলিসনি?"

জোজো বলল, "বললে যেত? কোনও বাহানা করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেত। তুমি এসেছ। ধরে নিয়ে যাও।"

কেয়াদি উঠে এসে আমার হাত ধরে টানল, "যাও, চট করে সেজেগুজে এসো। লক্ষ্মী ছেলে।"

বাধ্য হয়ে উঠলাম। আজ রবিবার। ভেবেছিলাম, শুয়ে বসে গান শুনে কাটাব। তা আর হল না। রান্নাঘরে ঢুকে বললাম, "মিনু পিসি, আজ আর আমার জন্য রান্না কোরো না। খাটোরায় যাচ্ছি।"

চান করতে করতে হঠাৎই মনে হল, আমাকে ও বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এত আগ্রহ কেন? প্রায় মাস দু'য়েক হিয়াদের বাড়িতে যাইনি। তবে মাঝেমধ্যে সুপ্রতিমবাবুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। কী এমন ঘটল যে, কেয়াদি আমাকে ধরে নেওয়ার জন্য চলে এল? আগে এত সব ভাবতাম না। এখন কোনও কিছু হলে, প্রথমে খারাপ জিনিসগুলো ভেবে নিই। ভাবতে ভাবতে ভালর কথা ভাবি।

কেয়াদি কৃতজ্ঞ, তার একটা কারণ আছে। সেই সুইসাইড করতে যাওয়ার কথা ও বাড়িতে আমি বলিনি। সুব্রতদার সঙ্গে ফের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার জন্যও হয়তো আমার উপর খুশি। এমনও হতে পারে, ভাই নেই বলে আমার প্রতি কেয়াদির একটু বাড়তি ভালবাসা আছে। ও বাড়িতে মাঝেমধ্যে গেলে আমার ভালই লাগত। নিজের দিদির কাছ থেকে তো কোনও ভালবাসা পাইনি। সেটা কিছুটা মিটিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু হিয়ার কাছে সেদিন ধরা পড়ার পর, ও বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছেটাই আমার চলে গেছে।

একটা জিনিস বুঝেছি, হিয়া খুব বাস্তববাদী মেয়ে। অন্যদের মতো আবেগে চলে না। হয়তো ও আমাকে যাচাই করে নিচ্ছে। তার জন্য জেদ করতে হবে কেন? রমেন আর সুস্মিতার বিয়ের দিন আমাকে ও প্রায় জানিয়েই দিল, আশায় আশায় থেকো না। তার কয়েকদিন পর, বাস স্ট্যান্ডের কাছে দেখা হতেই আমি লিফট দিতে চাইলাম। ও এড়িয়ে গেল, "না শিবাশিসদা, আমাকে কিছু কেনাকাটা করতে হবে।" সম্পর্কটা তো হিয়াই জটিল করে তুলছে। কেন ওদের বাড়িতে যাব? আর যাই হই, অমিতের মতো প্রেমিক আমি হতে পারব না।

উপরে উঠে পাজামা-পাঞ্জাবি গলিয়ে নীচে নেমে এলাম। আমাকে দেখে কেয়াদি বলল, "বাহ্, খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে তো। ফরাসি কোনও পারফিউম বুঝি?"

বললাম, "না। আমার নিজের তৈরি। ভাল লাগছে?"

কেয়াদি বলল, "দারুণ। মনটা ফ্রেশ হয়ে যাচ্ছে। চলো, আর দেরি নয়। এতক্ষণে বোধহয় পুজো শেষ হয়ে গেছে।"

গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বের করে তিনজনে উঠে বসলাম। জোজো চালাবে। মাসখানেক ধরে এই পাকামোটা করছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। তবু গাড়িটা বড় রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে। কোনদিন দুর্ঘটনা ঘটাবে। এত করে বলি, তবু শোনে না। দিদি এমনিতেই সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, "শিবা আমার ছেলেটাকে নষ্ট করে দিল।" এরপর যদি অন্য কিছু হয়, তা হলে তো আমার প্রাণ অতিষ্ঠ করে দেবে।

শোভাবাজারের বাড়িটা দিদি খালি করে দিয়েছে। অবশ্য চূড়ান্ত শাপ-শাপান্ত করে। সেটা টের পেলাম, ছোটকাকা মারা যাওয়ার পর বেনেটোলার বাড়িতে গিয়ে। দিদি আর দীপেনদা দু'জনেই শ্রাদ্ধে গিয়েছিল। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলল না। আমিও পাত্তা দিইনি। দিদিকে কে একজন বলল, "হ্যাঁ রে কস্তুরী, ভাইয়ের তো বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। এ বার বিয়ে-থা দে।" আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই দিদি বলল, "কে ভাই? আমার কোনও ভাই নেই। ভাই ছিল, সে মারা গেছে।" দিদিকে বেঙ্গল পারফিউমসের একজন ডিরেক্টর করে নেওয়ার কথা মাঝে মনে হয়েছিল। কিন্তু এই কথা শোনার পর দিদিকে মন থেকে মুছে ফেলেছি।

গাড়ি চালাতে চালাতে জোজো হঠাৎ বলল, "শিবাম্মা, ভাল একটা খবর আছে। হিয়াদি অ্যাড ফিল্ম করছে।"

মনে মনে হাসি পাচ্ছে। তবুও গলায় বিস্ময় এনে বললাম, "তাই নাকি? বাহ।"

"বিভাস নন্দী বলে একজন ডিরেক্টর নিজে বাড়িতে এসে কথা বলে গেছে দিন কয়েক আগে। দু'দিন শুটিং করতে হবে। কত দেবে জানো? পঞ্চাশ হাজার টাকা।"

কেয়াদি বলল, "নিজের বোন বলে বলছি না, হিয়ার মধ্যে ট্যালেন্ট আছে। দেখো শিবা, নিজের চেষ্টায় ও তো খানিকটা এগিয়েছে।"

কথাটা শুনে আমি ঘাড় নাড়লাম। সত্যিই, নিজের চেষ্টা থাকলে মানুষ কত কী-ই না করতে পারে!

জোজো বলল, "হিয়া মাসি কত পরিশ্রম করে জানো শিবাম্মা। শুনলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সপ্তাহে চার দিন এখন কলকাতায় যাচ্ছে। ড্রিম মার্চেন্টসে ট্রেনিং নিচ্ছে। দিনে তিন ঘণ্টা শরীরচর্চা করে। এখন টার্গেট মিস বেঙ্গল হতেই হবে।"

"কবে রে?"

"এই তো সামনের রোববার। তাজ বেঙ্গলে। জাজ হিসাবে কে কে আসছে জানো? আমির খান আর জিনত আমন। তুমি যাবে?"

"গেলে হয়।" আমি কোনওদিন বিউটি কনটেস্ট দেখিনি। অমিত মিস ক্যালকাটা কনটেস্টের ক্যাসেটটা দিয়ে গেছিল। মাঝে একদিন দেখে নিয়েছি। হিয়াকে সত্যিই মডেল মডেল লাগছিল। হাঁটাচলা, হাসি, প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দেওয়ার দক্ষতা — সব মিলিয়ে দারুণ।

খাটোরায় পৌঁছনোর পর, বাড়িতে ঢুকেই কেয়াদি যুদ্ধজয়ের ভঙ্গিতে বলল, "এই দেখো, ধরে এনেছি। বলেছিলাম না, আমার কথা শিবাশিস ফেলতে পারবে না।"

ড্রয়িংরুমে দেখি, স্বপনবাবুও বসে। আরও দু'তিনজন অপরিচিত মানুষ। আমাকে দেখে স্বপনবাবু বললেন, "এসো ভাই, তোমার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি। এসেই বলেছি, হাওড়া জেলার হিরো কোথায়?"

কয়েকবার ব্যাঙ্কে যাতায়াত করে স্বপনবাবুর সঙ্গে সম্পর্কটা আমার সহজ হয়ে গেছে। হিসেব রাখার কাজ করেন, অথচ এমন রসিক মানুষ কমই দেখেছি। তাই বললাম, "আপনি দেখছি, টিভি সিরিয়ালে আমাকে নামিয়েই ছাড়বেন।"

স্বপনবাবু বললেন, "বাংলা সিরিয়ালের যা অবস্থা, নেমো না।"

কথাটা শুনে সবাই হেসে উঠলেন। সুপ্রতিমবাবু বললেন, "তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা, বোসো।"

স্বপনবাবুর উল্টোদিকে একটা চেয়ার খালি আছে দেখে, বসলাম। আমার দিকে তাকিয়ে উনি মিটিমিটি হাসছেন। সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে হঠাৎ বললেন, "প্রায় পঁয়তিরিশ বছর কাজ করছি ব্যাঙ্কে। এই প্রথম একজনকে দেখলুম যে, লোকের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য লোন নিচ্ছে।"

কথাটা শুনে আমিও হেসে ফেললাম। বললাম, "উল্টোটা বললেন, লোকে ডিওডরেন্ট ব্যবহার করে দুর্গন্ধ দূর করার জন্য। আর পারফিউম দেয় সুগন্ধ বাড়াতে। আমি সুগন্ধ দিতে লোন নিয়েছি।"

"ওই একই কথা। সেদিন কোথায় যেন পড়লুম, জাপানিরা পারফিউম কেনে। কিন্তু সাজিয়ে রাখার জন্য। কেন বলুন তো? ভয়ে। ওদের ধারণা, যে পারফিউম মাখে তার শরীরে নিশ্চয়ই দুর্গন্ধ আছে। না হলে মাখবে কেন?"

সুপ্রতিমবাবু বললেন, "সত্যি?"

আমি কিছু বলার আগেই স্বপনবাবু বললেন, "হ্যাঁ মোহাই। তবে কি আমি মিথ্যে বলছি? আরও শুনুন, এখানকার পারফিউম তো সব সিন্থেটিক পারফিউম। কেমিকেল দিয়ে তৈরি। তা সায়েন্টিস্টরা মনে করছেন, শরীরের ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলে সিন্থেটিক পারফিউম ক্ষতি করছে। তাই ওরা এমন পারফিউম বের করেছেন, যা ব্যাকটেরিয়া খুব কম মারবে। একে বলে ডিও সেফ পারফিউম।"

বললাম, "আপনি তো বেশ খবর রাখেন দেখছি।"

"রাখতে হচ্ছে এখন। তোমাকে লোন দেওয়ার আগে পড়াশুনা করে নিলাম। ব্যাঙ্কের টাকাটা যাতে জলে না যায়, তা তো দেখতে হবে? ওই আর্টিকেলেই পড়লুম, এমন একটা দিন আসছে যখন পারফিউমে আর অ্যালকোহল ব্যবহার করতে হবে না। নতুন টেকনিক চালু হবে। মাইক্রো এন ক্যাপসুলেশন পারফিউম। অর্থাৎ বিন্না, ক্যাপসুলের মধ্যে পারফিউম। কী, ঠিক বলছি, শিবাশিস?"

স্বপনবাবুর মুখে এই সব কথা শুনে সত্যিই আমি অবাক হচ্ছি। পারফিউমাররা ইদানীং এই সব গবেষণা করছেন। অ্যালকোহল বাদ দিয়ে সুগন্ধি তৈরির।

মুসলিম দেশগুলো অ্যালকোহল দিয়ে বানানো পারফিউম ব্যবহার করে না। ধর্মে বারণ করা আছে। তা'ছাড়া, অ্যালকোহল দিনকে দিন খুব দামি হয়ে যাচ্ছে। এই সব কারণে ফ্রান্সে নতুন এক ধরনের পারফিউম তৈরি করার চেষ্টা চলছে, যা অ্যানজাইম

ভিত্তিক। এত [illegible]নার কথা স্বপনবাবুর নয়। তবুও ওঁকে বলতে দেখে, শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

সুপ্রতিমবাবুরা এ বার মাছ ধরার গল্পে মেতে গেলেন। আমি চুপচাপ বসে শুনছি। এমন সময় হাতে পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে হিয়া ঘরে ঢুকল। পরনে গরদের শাড়ি। চুল কাঁধ অবধি নেমে এসেছে। কপালে একটা লাল টিপ। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। প্রদীপের শিখায় তাত নিয়ে সবাই মাথায় ছোঁয়াচ্ছেন। আমার দিকে প্রদীপটা এগিয়ে দিয়ে হিয়া ফিসফিস করে বলল, "বুড়োদের মাঝে বসে কী করছেন? ভেতরে আসুন।"

কথাটা বলেই হিয়া ভেতরে চলে গেল। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, কী করা উচিত। স্বপনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে ফের মিটিমিটি হাসছেন। উনি কি কিছু বুঝতে পেরেছেন? এখন উঠে ভেতরে গেলে স্পষ্ট বুঝে নেবেন। চুপ করে বসে রইলাম। হিয়া কেন ভেতরে ডাকল, জানি না। কিছু বলবে? কী বলতে চায় হিয়া? হঠাৎ এত আগ্রহ দেখাচ্ছে?

সুপ্রতিমবাবু হিয়ার কথা বলছেন। অন্যরা শুনছেন। "ছোটবেলা থেকেই মেয়েটা খুব জেদি। একবার ওর মাথায় যা ঢুকবে, সহজে যাবে না। মডেলিং নিয়ে এখন মেতে উঠেছে। যা কস্টলি প্রফেশন, আমার তো ভয় হচ্ছে মশাই।"

স্বপনবাবু বললেন, "ওকে বাধা দেবেন না।"

"এই ক'দিন আগে ড্রেস ডিজাইনারের কাছে গেছিল। কী এক কনটেস্টে নামবে। এসে বলল, ড্রেসের দামই নাকি পড়ছে সত্তর হাজার টাকা। তবে আমার থেকে একটা পয়সাও এখন নেয় না। নিজেই রোজগার করছে। খরচ করছে। ওকে নিয়ে ভয়টা কী জানেন, আর ক'দিন পর বিয়ে দিতে হবে। কোন ঘরে গিয়ে পড়বে, কে জানে? হয়তো অ্যাডজাস্ট করতেই পারবে না।"

"ওর বিয়ের ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না মশাই। আমার উপর ছেড়ে দিন। পাত্র আমার হাতের সামনেই আছে। এমন গুণবতী একটা মেয়ের জন্য পাত্রের অভাব হতে পারে? কী বলো শিবাশিস?"

আমাকে সাক্ষী মেনে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন স্বপনবাবু। আচমকা ওই প্রশ্নের কী উত্তর দেব, ভেবে পাচ্ছি না। এমন সময় আমাকে উদ্ধার করল কেয়াদি, "শিবাশিস, তোমার ডাক পড়েছে। ভেতরে চলো।"

এর আগে মাত্র একবারই হিয়াদের বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিলাম। সুব্রতদার সঙ্গে যেদিন প্রথম আসি, সেদিন। ভেতরে ঠাকুর ঘরে পুজো সবে শেষ হয়েছে। মহিলা আর বাচ্চাদেরই বেশি ভিড়। আমাকে দেখেই হিয়া বলল, "আমার ঘরে চলুন। ওখানেই প্রসাদ নেবেন।"

দোতলায় হিয়ার ঘর। এই প্রথম ঢুকলাম। হিয়ার দু'টি মাত্র ছবি। একটা যোগাসনে বসে থাকা অবস্থায়। অন্যটা কয়েকদিন আগে লাগানো। মিস ক্যালকাটা হওয়ার পর। খাট, ড্রেসিংটেবল একটা টুল আর টিভি ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই। রাস্তার দিকে একটা ছোট্ট বারান্দা। খাটে বসাটা উচিত নয় ভেবেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

হিয়া বলল, "আপনার সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া আছে। দাঁড়ান, আগে প্রসাদটা নিয়ে আসি।"

পাত্তা না দিয়ে বললাম, "টিভিটা চালিয়ে দিয়ে যাবে? খবরটা শুনব।"

টিভি চালিয়ে হিয়া নীচে নেমে গেল। চ্যানেল ঘুরিয়ে স্টার নিউজ ধরলাম। টুলের উপর বসে নিউজ দেখছি। ভোট শুরু হতে যাচ্ছে। লালু প্রসাদ যাদব বক্তৃতা দিচ্ছেন। বিরক্তি লাগছে। দেড় বছর অন্তর ভোট। যা অবস্থা, কোনও পার্টিই সিঙ্গল মেজরিটি নিয়ে আসবে না। আবার খিচুড়ি সরকার হবে। আবার ভাঙবে। আবার ভোট। ফ্রান্সে থাকার সময় দেখতাম, ইতালিতে বছরে দশবার সরকার বদলায়। কিন্তু দশবার ভোট হয় না। তখন অবাক হতাম। সেই অবস্থা এখন আমাদের দেশেরও।

হঠাৎই একটা খবরে চমকে উঠলাম। মধ্য কলকাতার এজরা স্ট্রিটে একটা কেমিকেল গুদামে বিধ্বংসী আগুনে কাল রাতে মারা গেছে পাঁচজন।

গভীর রাতে আগুন লাগে বহুতল বাড়ির ওই একতলার গুদামে। আগুন এখনও আয়ত্তে আসেনি। খবরের সঙ্গে ছবিও দেখাচ্ছে। ঘন বসতির ওই বাড়িতে কেমিকেলের গুদাম কেন, পুলিশ উত্তর দিতে পারছে না। প্রাথমিক ভাবে দমকলের কর্তারা বলছেন, শর্ট সার্কিট। গুদামের মালিককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। প্রায় ষাট লাখ টাকার কেমিকেল নষ্ট হয়ে গেছে।

খবরটা দেখতে দেখতে উঠে দাঁড়ালাম। কালুয়া তা হলে কাল রাতেই কাজটা করতে পেরেছে। আমাকে একটা খবর দেওয়ার কথা ছিল ওর সকালে। কেন দিল না? তা হলে কি কাজটা সেরে ও বেরিয়ে আসতে পারেনি? হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় বারোটা। তার মানে প্রায় বারো ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বলছে। খবরে বলল, গুদামের মালিক সুরেশ জালানকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। খবরটা শুনলে অমিত খুশি হবে। খবর এতক্ষণে নিশ্চয়ই পেয়ে গেছে। ওকে একবার ফোনে ধরতে পারলে ভাল হত।

পর্দায় খেলার খবর দেখাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে আমি লাভক্ষতির হিসাব নিকেশ শুরু করলাম। এই ধাক্কাটা সামলাতে সুরেশ জালানের অনেকদিন লাগবে। নিশ্চয়ই বিমা করা ছিল। টাকা পেয়ে যাবে। আজ না হোক, ছয় মাস বাদে। কিন্তু পাঁচজনের মৃত্যুর দায় ওকেই নিতে হবে। বেআইনি কেমিকেল গুদামের অভিযোগ থেকেই বা কী করে ও বেরিয়ে আসবে? ও যত ডামাডোলের মধ্যে থাকবে, আমার তত সুবিধে। অনেক নিশ্চিন্তে আমি হিয়া-কে বাজারে আনতে পারব।

কথাটা মনে হতেই একটা অদ্ভুত সুখানুভূতি ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। নির্মম না হলে জীবনের কোনও ক্ষেত্রে সাফল্য আসে না। হয়তো স্বার্থপরের মতো কথাটা বলছি। কিন্তু এটাই সত্যি। সুরেশ জালান আমাকে মাড়িয়ে চলে যেত, যদি আমি টাফ না হতাম। টিভি-র খবরটা শোনার পর আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। ব্যবসার যুদ্ধে একটা রাউন্ডে যদি আমি জিততে পারি, তা হলে অন্যত্রও হার মানব কেন? এখনকার যুগে লড়াইটা তো আর বাহুবলে হয় না। হয় মনের যুদ্ধে। যার মানসিক বল বেশি, সেই জেতে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। হাতে প্রসাদের থালা নিয়ে উঠে এল হিয়া। টুলের ওপর থালাটা রেখে বলল, "আজ আপনাকে জবাবদিহি করতেই হবে।"

থালা থেকে ফলের টুকরো মুখে চালান করে হালকা ভঙ্গিতে বললাম, "কী ব্যাপারে?"

"আপনার পারফিউমে কেন হিয়া নামটা ব্যবহার করেছেন?"

"বেশ করেছি।"

"তার মানে?"

"আমার জিনিস, আমি যা ইচ্ছে, তাই করব। তোমার কী?"

"কে আপনার জিনিস?"

"খুলে বলার দরকার আছে?"

"জেগে জেগে আজকাল স্বপ্ন দেখছেন বুঝি?"

"না, আমি স্বপ্ন দেখতে দেখতেই জেগে থাকি।"

"একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?"

"হোক, তাতে আমার কোনও ক্ষতি হবে না।"

"আচ্ছা বেহায়া লোক তো আপনি?"

"তার চেয়েও খারাপ লোক আমি।"

" তার মানে?"

"দেখবে?" বলেই এক টানে ওকে কাছে টেনে নিয়ে এলাম। তারপর জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে বললাম, "এই দেখো।"

প্রাথমিক বিস্ময়টা কাটিয়ে হিয়া একবার জ্বলন্ত চোখে তাকাল। তারপর "ছিঃ" বলে দৌড়ে নীচে নেমে গেল।

॥ একুশ ॥

রমেন আর সুস্মিতাকে আজ দুপুরে নেমন্তন্ন করেছি। বিয়ের পর এই প্রথম একসঙ্গে ওরা আমার বাড়িতে আসছে। সে জন্য মিনু পিসিকে ভাল-মন্দ একটু রাঁধতে বলেছিলাম। বেলা বারোটা বেজে গেল, এখনও ওরা এল না। অথচ কাল বিকেলেও কারখানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় রমেন বলে গেছিল, "বেলা দশটার মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা। অনেকদিন পর জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।"

ওদের আশায় বসে আছি, এমন সময় দেখি গেট দিয়ে অমিতের সুমো ঢুকছে। সঙ্গে সুধা। এই সক্কাল বেলায় ওরা কোত্থেকে? তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলাম। আজকাল রবিবারগুলো আর কাটতে চায় না। কারখানায় যাওয়ার তাগিদ নেই। সপ্তাহের অন্য দিনগুলো এমন ব্যস্ত থাকি যে, কীভাবে সময় কেটে যায় বুঝতে পারি না। ছুটির দিনে একা হয়ে যাই। সারাদিন কথা বলার লোক পাওয়া যায় না। তাই অমিত আর সুধাকে দেখে ঠিক করে নিলাম, সারাটা দিন ওদের আটকে রাখতে হবে।

গাড়ি থেকে নেমেই অমিত বলল, "কাল আমরা বড়গাছিয়ায় ছিলাম। ফেরার সময় ভাবলাম, সুধাকে তোর বাড়িটা একবার দেখিয়ে নিয়ে যাই।"

"ভাল করেছিস। আয়।"

আগে একবার অমিতের বাড়িতে গেছিলাম, তখন সুধার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সে দিন ওরা খুব যত্ন আত্তি করেছিল। আজ পাল্টা আমাকে করতে হবে। ওরা দু'জন ড্রয়িংরুমে ঢোকার পর আমি বললাম, "কাল ভাবলাম, তোদের একবার ফোন করি। কী একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় ফোনটা আর করা হল না।"

"কী ব্যাপারে রে?"

" সুরেশ। শুনলাম, ওর কেমিকেলের গোডাউনে নাকি সাবোতেজ হয়েছে? কে করল?"

"ভগবান আছেন, বুঝলি। এত পাপ করছিল, ওর একটা শাস্তি পাওয়া দরকার ছিল। খবরটা শুনে আমরাও অবাক। কে করল, আমার কাছেও মিস্ট্রি। শুনলাম, ঢোলকিয়ার সঙ্গে গণ্ডগোল। সে শালাও তো নিপাত্তা। পুলিশ তাঁকেও খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোর ভালই হল। তোর প্রোডাক্ট এ বার নিশ্চিন্তে লঞ্চ করতে পারবি। কথায় বলে না, কারও পৌষ মাস, তো কারও সর্বনাশ। সুরেশের এই অবস্থায় সব থেকে বেশি লাভ তোর।"

বললাম, "কারও সর্বনাশ হোক, এটা আমি চাই না। তবে লোকটা যে মহাপাজি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

"আমাদের বাঙালিদের এই একটা দোষ বুঝলি। হঠাৎ হঠাৎ আমরা রামকৃষ্ণদেব হয়ে যাই। বিজনেসে এ সব আবেগ দেখালে চলে? টাফ হতে হবে। মারোয়াড়িদের দেখিস না, বিজনেস করতে গিয়ে যে সব অন্যায়গুলো করে, পরদিন সকালে গঙ্গায় চান করে, গোমাতাকে জিলিপি খাইয়ে, সেগুলো সব ধুইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। হা হা হা ..... আমার বাবাকেই দেখেছি।"

সুধা এই সময় মৃদু ধমক দিল অমিতকে। তা গ্রাহ্য করার মানুষ নয় অমিত। আমাকে সাক্ষী মেনে বলল, "কী রে, আমি কি ভুল বলছি? শালা, আমি ভাবলাম, মিস বেঙ্গল কনটেস্টে তোকে স্পনসর করব। সুরেশ ব্যাটা নতুন ভিড়েছে আমাদের অর্গানাইজেশনে। কোত্থেকে মুম্বইয়ের একটা কোম্পানি ধরে আনল। তারা তোর দ্বিগুণ টাকায় রাজি হয়ে গেল। আমি আর কিছু.করতে পারলাম না। অন্যদের কী করে বোঝাই, তোকে আটকানোর জন্য ও এটা করছে।"

বললাম, "ছাড়, ও সব কথা বলে আর কী হবে?"

সত্যি বলতে কী, কুড়ি লাখ টাকা দিয়ে একটা দু'ঘন্টার কনটেস্ট স্পনসর করা এই মুহূর্তে আমার সাধ্যের বাইরে। তাই আমি পিছিয়ে এসেছি। অমিতের রাগ এখনও পড়েনি দেখছি। কথায় কথায় বলল, 'সুরেশ এখন জেল হাজতে। ওর বিরুদ্ধে কাগজে এত লেখালেখি হয়েছে, পুলিশ ওকে ছাড়তে এখন ভয়ই পাচ্ছে। সুরেশের ফ্যাক্টরিতেও রেইড করেছে সেন্ট্রাল এক্সাইজ আর পুলিশের লোকেরা। অনেক চোরাই কেমিকেলও পেয়েছে। ওগুলো এসেছে সিঙ্গাপুর আর হংকং থেকে। কম

দামি কেমিকেলের লেবেল মারা আছে বোতলে। আসলে ওগুলো দামি কেমিকেল। এক্সাইজের লোকেদের ধোঁকা দেওয়ার জন্যই নাকি নিয়মিত সুরেশ এটা করত। যাতে কম ডিউটি দিতে হয়। এত দামি বিদেশি কেমিকেল কোত্থেকে এল, সুরেশ নাকি তার কোনও উত্তর দিতে পারেনি।

অমিত আরও অনেক খবর দিল। যে দুই মন্ত্রীর সঙ্গে সুরেশের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁরা এখন বলছেন সুরেশ জালান নামে কাউকে নাকি চেনেনই না। পুলিশের একাংশও চটে ছিল ওর ওপর। তারাও পিছনে লেগে গেছে। আমার সামান্য একটা চাল সুরেশ সামলাতে পারল না। তবে একটা কাঁটা এখনও বুকের মধ্যে খচখচ করছে। গুদামে আগুন লাগার পর থেকে কালুয়ার কোনও খোঁজ নেই। আমার সন্দেহ, আগুন লাগানোর পর ও আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। মৃতদের মধ্যে একজনকে পুলিশ শনাক্ত করতে পারেনি। এমনই বিকৃত হয়ে গেছিল তার দেহ। আমার মনে হয়, সেই লোকটাই কালুয়া। যত দিন যাচ্ছে, আমার বিশ্বাস তত দৃঢ় হচ্ছে। কালুয়ার আপনজন কেউ ছিল না। ওর খোঁজ করতেও কেউ পুলিশের কাছে যাবে না।

আধ ঘণ্টা নানা গল্প করার পর অমিত হঠাৎ বলল, "আরে, যে কারণে তোর বাড়িতে এলাম। এই নে মিস বেঙ্গল কনটেস্টের কার্ড। সন্ধে সাতটায় শুরু। আসবি কিন্তু তাজ বেঙ্গলে। আমি তোর জন্য অপেক্ষা করব। হিয়া ঘোষালও তো নামছে।"

বললাম, "যাব।" আসলে বিকেলের দিকে কোনও কাজ নেই। সন্ধেটা ভাল কাটবে। উত্তরটা শুনে অমিত আর সুধা উঠে পড়ল।

রমেনরা এল প্রায় বারোটায়। ঘরে ঢুকেই সুস্মিতা কৈফিয়ত দেওয়ার ঢঙে বলল, "বিয়ের আগের দিনগুলোই ভাল ছিল শিবাশিসদা। যখন খুশি বেরোতে পারতাম। এখন পায়ে সংসারের বেড়ি। তা, কেমন আছেন বলুন?"

"চলছে। একই রকম।"

"বিয়েটা এবার সেরে ফেলুন।"

" তুমি এমন ভাবে বলছ, যেন আমার বিয়েটা ঠিক করা আছে?"

"তা হয়তো নয়। কিন্তু পাত্রী তো ঠিক করা আছে। আমাকে বোকা বানাতে পারবেন না। আমার বিয়ের দিনই আমি বুঝতে পেরে গেছি।

কথাটা বলেই রমেনের সঙ্গে একবার চোখাচোখি করল সুস্মিতা। রমেন মিটিমিটি হাসছে। বাড়িতে তা হলে ওরা আমাকে নিয়ে বেশ আলোচনা করে। কিন্তু ওদের বিয়ের দিন কি বুঝতে পেরেছিল সুস্মিতা? সে দিন আমি তো এমন কিছুই করিনি, যাতে কেউ বুঝতে পারে, হিয়ার সম্পর্কে আমার কোনও দুর্বলতা আছে। বললাম, "কী ফাঁকি দেওয়ার কথা তুমি বলছ সুস্মিতা?"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কিছু মনে করবেন না বলুন? এত নাম থাকতে আপনি পারফিউমের জন্য হিয়া নামটাই কেন বাছলেন?"

"নামটা আমার খুব প্রিয় বলে।"

"নামটা, না নামের মানুষটা?" বলেই সুস্মিতা হেসে ফের বলল, "আপনাদের

খুব মানাবে শিবাশিসদা। যদি অনুমতি দেন, তো আমি আর রমেন ঘটকালিটা করে দিই ..."

সুস্মিতা আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলাম। এ সময়ে কে ফোন করতে পারে? 'হ্যালো' বলতেই শুনি ও প্রান্তে মিলি। উত্তেজিত গলায় বলল, "শিবাদা, এই মাত্র টিভি-র ফ্যাশন প্রোগ্রামে ফ্যান্টাস্টিক একটা খবর শুনলাম। তোমার পারফিউম হিয়া এবার বেস্ট প্রাইজ পেয়েছে।"

শুনেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল। কী বলছে মিলি? সোসাইটির ওই কম্পিটিশনের রেজাল্ট কি তা হলে বেরিয়ে গেছে? চিৎকার করে বললাম, "ঠিক বলছ তুমি? ঠিক শুনেছ?"

"হ্যাঁ শিবাদা। এই মাত্র তোমার নামটা বলল। শুনে আনন্দে আমার কান্না পেয়ে গেল। তারপরই তোমাকে এই ফোন করছি। উফ্, শিবাদা, আমার ভেতরটা কেমন যেন করছে তোমার জন্য। মাসিমা বেঁচে থাকলে কী আনন্দই না পেতেন। দেখো, বাবা-র কথাটা ঠিক মিলে গেল। আমি এখুনি বাবাকে ফোন করে জানাচ্ছি।"

ওকে থামিয়ে বললাম, "টিভি-তে আর কী শুনেছ, বলো।"

"আসলে এই সময়টায় আমি টিভি দেখার সময় পাই না। হঠাৎ পর্দায় দেখি, তোমার ছবি। দেখে তো আমি লাফিয়ে উঠলাম। আচ্ছা, তোমার ছবি এরা পেল কী করে শিবাদা?"

"ওরা চেয়ে নিয়েছিল।"

"টিভি-তে তোমার পারফিউম নিয়ে ছোট্ট ইন্টারভিউ দেখাল। জ্যাঁ কার্লিও নামে এক পারফিউমারের। উনি নাকি তোমাকে পড়িয়েছেন এখানকার ইন্সটিটিউটে। ভদ্রলোক তোমার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। উফ্, এমন গর্ব হচ্ছিল তোমার জন্য ... মনে হচ্ছিল এখুনি প্লেন ধরে চলে যাই কলকাতায়।"

"খবরে আর কী শুনলে বলো।"

"বোর্নিয়ে বলে একজন সেকেন্ড প্রাইজ পেয়েছে। পারফিউমের নামটাও মনে আছে পারফুম সিক্স। তুমি এক লাখ ফ্রাঁ পাবে। আগামী মাসে তোমাকে প্যারিসে আসতে হবে। দিনটা জানিও কিন্তু আমাকে। আমি মার্সেই থেকে তোমার কাছে চলে যাব।"

"আমার প্রাইজ পাওয়ার খবরটা কি সুব্রতদা জানে? সুব্রতদা তখন হেল্প না করলে তো আমি আজ এ জায়গায় পৌঁছতে পারতাম না মিলি।"

"দাদা নিশ্চয়ই টিভি-তে শুনেছে। তবুও আমি ফোন করে জানাচ্ছি। ভাল থেকো শিবাদা। ছাড়ছি তা হলে?"

"থ্যাঙ্ক ইউ মিলি।"

কর্ডলেসের সুইচটা অফ করে আমি সোফায় বসে পড়লাম। ড্রয়িং রুমে মায়ের একটা ছবি টাঙিয়ে রেখেছি। হঠাৎ সে দিকে চোখ যেতেই কান্না পেয়ে গেল। মা আমার জন্য কম কষ্ট করেছে? ইন্সটিটিউটে আমাকে ভর্তি করার জন্য ষাট হাজার

টাকা দরকার। মা ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙতে চাইল না। নিজের গয়না বিক্রি করে আমাকে ভর্তি করিয়ে দিল। মিলি বলল, মা বেঁচে থাকলে আনন্দ পেত। মায়ের যে কী হত, তা আমিই জানি।

রমেন আর সুস্মিতা উদ্‌গ্রীব চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রাইজ পাওয়ার কথা বলতেই ওরা লাফিয়ে উঠল। সুস্মিতা বলল, "দাঁড়ান, ঘটকালির প্রথম পর্বটা এখনই সেরে রাখি। কর্ডলেস ফোনটা দিন তো।"

রমেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "শিবাশিসদা, আপনাকে একটু মিষ্টি মুখ করানো দরকার। দাঁড়ান, আমি আসছি।"

বলেই ও ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল। আমি হিসেব কষতে বসলাম। ফ্রান্সের এই প্রাইজটার ইজ্জত অনেক। অন্তত পারফিউমের জগতে। খবরটা সারা বিশ্বের ফ্যাশন পত্রিকাগুলোতে বেরোবে। তারপরই আসতে শুরু করবে নানা ধরনের প্রস্তাব। আমি জানি, মঁসিয়ে বেনোনিল আজই আমাকে ফোন করবেন। হয়তো আমার পারফিউমটা কিনে নিতে চাইবেন। জিবোদান রুর যদি আমার পারফিউমটা কেনে, তা হলে সারা জীবনে আমার আর কোনও কাজ করতে হবে না। ফ্রান্সে থাকার সময় সঁ ইভস লরোঁ এই রকম পারফিউম কিনেছিল আমাদের ইন্সটিটিউটের একজন প্রাক্তন ছাত্রের কাছ থেকে। বছর সাতেক আগে, তখনই দিয়েছিল আমাদের টাকায় পাঁচ কোটি। মনে মনে ঠিক করলাম, ফ্রান্সের কোনও কোম্পানি যদি হিয়া ব্র্যান্ড কিনতে চায়, তা হলে একটা শর্ত রাখব। ভারতের বাজারটা থাকবে আমার হাতে। বিশ্বের বাকি সব অঞ্চলে তারা ব্যবসা করুক। আমার কোনও আপত্তি নেই। এ জন্য আমি চাইব, দশ মিলিয়ন ফ্রাঁ, আমাদের টাকায় ছয় কোটি।

এই টাকায় আমি আরেকটা ফ্যাক্টরি করতে পারব স্বচ্ছন্দে। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের চিঠিটার উত্তর দিয়েছি কয়েকদিন আগে। ইল্লুরে গিয়ে নিজে একবার সব কিছু দেখে আসব। একটা খটকা অবশ্য আছে। ওখানে গরম খুব বেশি। সে দিক থেকে আদর্শ জায়গা হচ্ছে বাঙ্গালোর। ওখানকার আবহাওয়াটা এত সুন্দর, পারফিউম ফ্যাক্টরির পক্ষে উপযুক্ত। লোকের হাতে পয়সা আছে। একেবারে কেরল পর্যন্ত বাজারটা ছড়িয়ে যাবে। তেমন হলে ডোমজুড়ের পাট তুলে বাঙ্গালোরেই চলে যাওয়ার বন্দোবস্ত করব। আমার তো কোনও পিছুটান নেই। তাই অসুবিধেও নেই।

মনে মনে হিসেব কষছি, এমন সময় কর্ডলেসটা এগিয়ে দিয়ে সুস্মিতা বলল, "শিবাশিসদা নিন। লাইনে হিয়াদি।"

ফোনটা কানে ধরেই বললাম, "রাগটা কমেছে?"

হিয়া বলল, "কমানোর মতো কাজ কি আপনি সেদিন করেছেন।"

"কী এমন অন্যায় করেছি?"

"করেননি?" গলার স্বরেই বুঝলাম, হিয়া তাতছে। ওকে আরও একটু চটানো দরকার। কথাবার্তা এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাব, যাতে ও আমাকে কনগ্রাচুলেশন্স জানাতে না পারে। সেদিন চুমু খাওয়ার পর জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়েই ও নীচে নেমে গেছিল। আর আমার সামনে আসেনি। ফোনে একবার কথা বলার চেষ্টা

করেছিলাম। ধরেনি। আজ সুস্মিতাকে বোধহয় এড়াতে পারেনি। তাই কথা বলছে। বললাম, "তোমার সঙ্গে দেখা হলে বুঝিয়ে বলতাম।"

"আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না।"

"তুমি সিওর?"

"অফ কোর্স সিওর। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ আমাকে কিছু করাতে পারেনি। কোনওদিন পারবেও না। মোর ওভার আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না। থাক সে কথা, বাবা কথা বলতে চান। ধরুন, দিচ্ছি।"

একটু পরেই ফোনটা এসে ধরলেন সুপ্রতিমবাবু। বললেন, "খবরটা হিয়ার মুখে শুনলাম বাবা। আশীর্বাদ করি, আরও বড় হও। স্বপনবাবুকে খবরটা দিও। শুনলে উনি খুশি হবেন।"

"আপনি পাশে না থাকলে মেসোমশাই, আমি এত বড় ভেঞ্চারে নামতেই পারতাম না।"

"ওটা বড় কথা নয়। কেউ না কেউ পাশে এসে দাঁড়াত। আমাদের একটা সুখবর দিচ্ছি, তোমাকে। সুব্রত বিয়ের দিন ঠিক করে চিঠি লিখেছে। এগারোই ডিসেম্বর। তুমি আমার পাশে না থাকলে তো বাবা, এত বড় কাজ আমি উদ্ধার করতে পারব না।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মেসোমশাই।"

"পারলে একবার এদিকে এসো। আজ তো বাড়িতে টেনশন, হিয়ার কনটেস্ট। দেখো না বাবা, ওর মা আর আমি বললাম, দেখতে যাব। ও রাজি হচ্ছে না।"

আরও দু'একটা কথা বলে সুপ্রতিমবাবু ফোনটা ছেড়ে দিলেন। তাজ বেঙ্গলে উনি যাচ্ছেন না শুনে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম।

হিয়ার ফোনটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েই সুস্মিতা ভেতরে চলে গেছিল। ফিরে এল চায়ের কাপ হাতে নিয়ে। আমি স্বপনবাবুকে ফোন করে জানিয়ে দিলাম খবরটা। রমাপ্রসাদবাবুকেও। চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার ফাঁকেই দশ বারো জন ছেলেকে নিয়ে হই হই করে ঘরে ঢুকে পড়ল রমেন। সবাইকে চিনি। মিলন সংঘের ছেলে। খবরটা বোধহয় রমেনই ওদের দিয়েছে। ছেলেগুলো বলল, "ক্লাবের তরফে আপনাকে সংবর্ধনা দেব আমরা। প্লিজ, না করবেন না শিবাশিসদা।"

সারাটা দুপুর লোকের আনাগোনা সামলাতে আর ফোন ধরতেই কেটে গেল আমার। দুপুরে খেতে বসে স্টার নিউজে খবরটা শুনে চমকে উঠলাম। মিলি কী শুনতে কী শুনেছে, এ নিয়ে একটা আশঙ্কা ছিল। স্টার নিউজে খবরটা শোনার পর নিশ্চিত হয়ে গেলাম। না, প্রাইজটা আমিই পেয়েছি। ওরা বলল, পারফিউম জগতে এটা যুগান্তকারী আবিষ্কার। অমর্ত্য সেনের নোবেল পাওয়ার পর আরেক বাঙালির বিশ্বজয়। এটা অবশ্য বাড়াবাড়ি। সত্যি বলতে কী, লজ্জাই লাগছে খবরটা শুনে।

দূরদর্শনের ফোনটা এল বেলা তিনটেয়। সুস্মিতা-রমেন চলে যাওয়ার পর। প্রতীক রায় বলে একজন জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি শিবাশিস চৌধুরীর বাড়ি?"

বললাম, "হ্যাঁ। বলছি।"

"শিবাশিসবাবু, কনগ্রাচুলেশন। আপনাকে আমরা ইন্টারভিউ করতে চাই। আপনি কি আজ পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটার মধ্যে গলফ গ্রিনে আসতে পারবেন?"

"ইন্টারভিউ করতে কতক্ষণ লাগবে?"

"আসলে আমরা এখনও ঠিক করতে পারিনি প্রোগ্রামটা লাইভ দেখাব, না রেকর্ডেড। আমার ইচ্ছে, লাইভ দেখানো। স্টার টিভি-তে আপনার খবরটা বারবার দেখাচ্ছে। ওরা আপনাকে ধরার আগেই আমরা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ করতে চাই। প্লিজ ডোবাবেন না।"

সন্ধে সাতটার মধ্যে আমাকে তাজ বেঙ্গলে পৌঁছতে হবে। কোনওমতেই দেরি করা যাবে না। বিকেল পাঁচটায় দূরদর্শনে গেলে ঠিক সময় হিয়ার কনটেস্ট দেখার জন্য পৌঁছতে পারব কি না, বুঝতে পারছি না। তাই প্রতীকবাবুকে বললাম, "আমাকে কিন্তু অবশ্যই ছ'টার মধ্যে ছেড়ে দেবেন।"

উনি বললেন, "আসুন। মনে হয়, অতক্ষণ লাগবে না।"

... বেলা চারটের সময় গাড়ি নিয়ে বেরোতে যাব, এমন সময় কাঁধে গদার মতো ক্যামেরা নিয়ে চারজন হাজির। রমেনদের বয়সী হ্যান্ডসাম একটা ছেলে বলল, "আমার নাম সুবিনয় ব্যানার্জি। আমি বি বি সি-র হয়ে কাজ করি। আপনার ইন্টারভিউ নিতে চাই।"

"আপনারা আমার ঠিকানা পেলেন কোথায়?"

"লন্ডন থেকে। আরও আগেই চলে আসতাম। আমরা ভুল করে দফরপুরে চলে গেছিলাম। বি বি সি আজ বিকেলেই টেলিকাস্ট করবে। আমাকে সন্ধে ছ'টার পর ফুটেজ পাঠিয়ে দিতে হবে। যাতে ওরা লন্ডন টাইম বিকেল পাঁচটায় দেখাতে পারে।"

অগত্যা বললাম, "ভেতরে আসুন।"

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই সুবিনয়রা তৈরি হয়ে নিল। ড্রয়িং রুমে আমার পিছনে মায়ের ছবি। সামনে টেবলের উপর রাখা হিয়ার বোতল। ইন্টারভিউ-র আগে ছেলেগুলো বাড়ি, পুকুর আর ল্যাবরেটরির ছবি তুলে নিল। ল্যাবে এডমন্ড রুদনেৎস্কির আত্মজীবনীমূলক বইটা ছিল। আমার আইডল। শুনে ফরাসি ভাষায় লেখা ওই বইটার ছবিও ওরা তুলল। ছেলেগুলোর কথা-বার্তা, হাঁটা-চলা, কাজকর্মের ধরনে এত পেশাদারিত্বের ছাপ, দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ওরা কী দেখাবে, তা যেন মহড়া দিয়ে এসেছে। একটা মিনিট সময়ও যেন ওদের কাছে মূল্যবান।

সুবিনয় ইন্টারভিউ-র শুরুতেই সেই প্রশ্নটা করল, যা দুপুরে আচমকাই করেছিল সুস্মিতা। "হিয়া নামটা কেন?"

বললাম, "প্রত্যেক পারফিউম তৈরির পিছনে একটা বিশেষ কনসেপ্ট কাজ করে। দীর্ঘদিন ভাবনা-চিন্তার পর সেটা একটা রূপ নেয়। আমি একটা এমন পারফিউম তৈরি করতে চেয়েছিলাম যা, পুরোপুরি প্রাচ্যের ধারণা দেবে। সেই সঙ্গে হবে ইকো-ফ্রেন্ডলি। অর্থাৎ কিনা এমন পারফিউম যা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায়। আপনি যদি মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে জলজ ভাবনার কোনও পারফিউম ব্যবহার করেন, তা হলে

সেটা খাপ খাবে না। ওখানে গন্ধটা হতে হবে রুক্ষ, উগ্র এবং দীর্ঘমেয়াদি কিছু। তো, হিয়া নামকরণের ভাবনার মধ্যে প্রাচ্যের প্রতীকী রয়েছে। শব্দটার মানে, হৃদয়। গন্ধের মাধ্যমে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের উষ্ণতা বিনিময় করার প্রচেষ্টা। আমাদের, মানে প্রাচ্যের লোকেদের কাছে হৃদয়ঘটিত আবেগটাই বেশি প্রশ্রয় পায়। যুক্তির থেকে সেই কারণেই, হিয়া নামটা বেছে নিয়েছি।"

"আপনার এই পারফিউমকে যুগান্তকারী বলা হচ্ছে কেন?"

হেসে বললাম, "যুগান্তকারী কথাটা কিন্তু আমি ব্যবহার করিনি। আমার পারফিউম ইউনিসেক্স। অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর ব্যবহারযোগ্য। এবং ফেরোমোন ভিত্তিক। গন্ধ অণুগুলো আকর্ষণ করবে পুরুষের প্রতি নারীকে। এবং নারীর প্রতি পুরুষকে। শুধু জৈবিক চাহিদার জন্যই নয়, হৃদয় বিনিময়ের উষ্ণতার জন্যও। আমি জীবজগতের ফেরোমোনকে মানুষের প্রয়োজনে লাগিয়েছি। এই কারণে কেউ যদি এটা যুগান্তকারী আবিষ্কার বলেন, আমার অবশ্য তাতে আপত্তি নেই।"

সুবিনয় ছেলেটা বেশ হোমওয়ার্ক করে এসেছে। আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগল। ওর ইন্টারভিউ যখন শেষ হল, সন্ধে তখন সাড়ে ছ'টা। দূরদর্শনে যাওয়ার সময় নেই। হিয়াকে দেখার জন্য আমি গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম তাজ বেঙ্গলের দিকে।

॥ বাইশ ॥

বোম্বে রোডে জ্যাম কাটিয়ে তাজ বেঙ্গলে যখন পৌঁছলাম, রাত তখন আটটা। একবার টয়লেটে যাওয়া দরকার। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যাবে। কথাটা ভেবে টয়লেটে ঢুকলাম। প্রাকৃতিক কাজটা সেরে, চোখমুখে জল দিয়ে, রুমাল বের করার জন্য পকেটে হাত দিতেই কী যেন ঠেকল। একটা চিঠি। কাল বিকেলে বাড়িতে ঢোকার সময় লেটার বাক্সে এই চিঠিটা পেয়ে পকেটে ফেলে রেখেছিলাম। চোখ বোলানোর সময় পাইনি। খুলে দেখি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকচারিং দফতর থেকে পাঠিয়েছে। ছয় মাস আগে কারখানার জন্য সাহায্য চেয়ে ওই দফতরের মন্ত্রীকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। এতদিনে তার উত্তর এল। কী লেখা আছে, পড়ে দেখার ইচ্ছেও হল না। এমন রাগ হল, কুচি কুচি করে ছিঁড়ে কমোডে ফেলে আমি ফ্ল্যাশ টেনে দিলাম। রাজ্য সরকারের কোনও সাহায্য এখন আমার দরকার নেই। যদি কিছু করি, তা হলে বাঙ্গালোর বা ইল্লুরে করব।

বল রুমে এসে দেখি, লোক গিজ গিজ করছে। ভেতরে ঢোকার উপায় নেই। এই ভিড়ের ভেতরে অমিতকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। ও অর্গানাইজারদের খুব ঘনিষ্ঠ। নিশ্চয়ই ভেতরে কোথাও আছে। আমার প্রাইজ পাওয়ার খবরটা ও শুনে আসেনি। এখানে দেখা হলে, দিতে হবে। শুনলে ও আনন্দই পাবে। অমিতকে ছাড়া এখানে আর কাউকে আমি চিনি না। কী রকম যেন অস্বস্তি শুরু হল মনে।

দরজার গোড়া থেকেই উঁকি দিলাম ভেতরে। পুরো মঞ্চটা দেখা যাচ্ছে না।

র‍্যাম্পের একাংশ শুধু দেখতে পাচ্ছি। শেখর সুমন নামে একজন ঘোষক অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করছেন। মাইকে তিনি বললেন, "এবার মোস্ট বিউটিফুল স্মাইল প্রতিযোগিতা শুরু হবে। বাংলার সেরা ন'জন সুন্দরী এবার একে একে আপনাদের সামনে আসবেন।"

মাত্র ন'জন, কেন? তার মানে, ছাঁটাই পর্ব শুরু হয়ে গেছে। অনেকেই বাদ চলে গেছে। মিউজিক শুরু হয়ে গেল। এই সময় ঘোষক বললেন, "দর্শকদের মধ্যে কি কোনও হার্ট স্পেশালিস্ট আছেন? যদি কেউ থাকেন, তা হলে তৈরি থাকুন। সুন্দরীদের হাসি দেখে অনেকেরই হার্ট ব্লক হয়ে যেতে পারে।"

সঙ্গে সঙ্গে হাসির হুল্লোড়, হাততালি। ভিড়ের ভেতর ঠেলে ঠুলে একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। শেখর সুমন একেকজনের নাম ধরে ডাকছেন। আর মেয়েরা র‍্যাম্পে এসে ঘুরে গিয়েই নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ছেন। হর্ষ অগ্রবাল, দীপা দত্তা, শোভা রাজ, রীতা মেটা, শ্রীপর্ণা ব্যানার্জি ....। বলরুমে হাততালির আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার জোগাড়। উজ্জ্বল আলো, ঝলমলে পোশাক, একেকজনকে স্বপ্নের জগতের নারী বলে মনে হচ্ছে। ন'জনের নাম ডাকা হয়ে গেল। কই, হিয়া ঘোষাল তো নেই! বিউটি কনটেস্ট সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। তাই ভাবলাম, হয়তো পরের রাউন্ডে ওকে দেখা যাবে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে কনটেস্ট দেখতে লাগলাম। সাড়ে আটটা বাজে। এখন নিশ্চয়ই বি বি সি চ্যানেলে আমার ইন্টারভিউটা দেখাচ্ছে।

পুরো বল রুম জুড়ে সুন্দর একটা গন্ধ। মুম্বইয়ের যে কোম্পানিটা স্পনসর করেছে, তারাই মাঝেমধ্যে স্প্রে করে দিচ্ছে। গন্ধটা আসছে মঞ্চের দিক থেকে। ধোঁয়াশার মধ্যে দিয়ে মেয়েরা একে একে বেরিয়ে আসছে। চন্দন, খস আর কস্তুরীর গন্ধ পাচ্ছি। কোনও নতুনত্ব নেই। বরং আমার মনে হল বিভিন্ন গন্ধের লিনিয়ার লেভেল ঠিক নেই। ইন্সটিটিউটে পড়ার সময় জিরো ডিগ্রি ইনফিনি বলে আমরা যে পারফিউমটা তৈরি করেছিলাম, এটা প্রায় তারই গন্ধ। মেয়েরা পছন্দ করবে। গন্ধে ডুব দিয়ে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎই পিঠে টোকা, "এই শিবা, এতক্ষণ ধরে ডাকছি। শুনতে পাচ্ছিস না?"

তাকিয়ে দেখি, অমিত। পরনে সোনালি কাজ করা পাঞ্জাবি আর চোস্ত। কোমরে একটা তরোয়াল ঝুলিয়ে দেওয়া বাকি। তা হলেই ওকে রাজপুত বলে মনে হবে। বললাম, "এতক্ষণ তোকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

অমিত হঠাৎ উচ্ছসিত হয়ে বলে উঠল, "দাঁড়া, আগে তোকে কনগ্রাচুলেশনস জানাই। খবরটা আমি পেয়েছি।"

"কে দিল তোকে?"

"শ্বশুরমশাই। টিভি-তে শুনেই মোবাইলে আমাকে খবরটা দিলেন। সত্যি শিবা, তোর জন্য আমার এত গর্ব হচ্ছে, কী বলব।"

"হিয়া কোথায় রে?

"আর বলিস না। সেকেন্ড রাউন্ডেই ছাঁটাই হয়ে গেছে। ওর এখানে নাম দেওয়াই

উচিত হয়নি। এ সব কনটেস্টে কে জিতবে, আগে থেকে ঠিক করা থাকে। এখানে একটা মেয়ে কনটেস্ট করছে। নাম শোভা রাজ। দেখবি, ওকেই মিস বেঙ্গল করবে। মেয়েটা কে জানিস? স্পনসর কোম্পানির টপ বস-এর নাতনি।"

"তা হলে এত সব সেলিব্রেটিকে যে এরা জাজ করে এনেছে, তাঁদের কোনও ভূমিকাই নেই?"

"ধূর, ওদের তো আনা হয়েছে টিকিট বিক্রির জন্য। জাজ-রা জানেও না, কে কাকে কত নম্বর দিচ্ছে। সিস্টেমটাই এমন। ফলে যা কিছু করার, অর্গানাইজাররা আগে থেকে ঠিক করে রাখে।"

বিউটি কনটেস্ট সম্পর্কে এত ধারণা আমার ছিল না। এ সব শুনে মনে হচ্ছে, পুরোটাই জোচ্চুরি! আমার অবশ্য আগেই বোঝা উচিত ছিল, যে দিন মিস ক্যালকাটা খেতাব অমিত হিয়াকে পাইয়ে দেবে বলেছিল। যাক গে, কনটেস্ট নিয়ে আমার আর বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। হিয়া বাতিল হয়ে গেছে। শুনে আমার তখনই আগ্রহ চলে গেছে। এই মুহূর্তে আমার জানা দরকার, হিয়া কোথায়? বেচারি, বিরাট একটা আশা নিয়ে এসেছিল। ছাঁটাই হওয়ার পর নিশ্চয়ই ভেঙে পড়বে। এই মুহূর্তে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো দরকার। কথাগুলো মনে হতেই অমিতকে জিজ্ঞেস করলাম, "হিয়াকে এখন কোথায় পাওয়া যেতে পারে রে?"

"চেঞ্জিং হল-এ থাকতে পারে।"

"তুই সিওর?"

"মনে হয়। এই আগের রাউন্ডেই তো ওকে বাদ দিল। এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই ও চলে যাবে না। তুই যদি বলিস, একবার গিয়ে দেখতে পারি।"

"চল তা হলে।"

বল রুমের পিছনের একটা দরজা দিয়ে অমিত আমাকে চেঞ্জিং হলে নিয়ে গেল। ভেতরে জনা পঁচিশ মেয়ে। কয়েকজন পোশাক বদলে নেওয়ায় ব্যস্ত। কোনও আব্রুর ব্যাপার নেই। ভেতরে ঢুকেই দেখলাম, একটা মেয়ে সবার সামনে শরীরের সব পোশাক খুলে ফেলল। তারপর দ্রুত অন্য পোশাক পরতে লাগল। উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, এমন একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাওয়ায় আমি আর ভেতরে ঢুকলাম না। মেয়েটা অমিতকে দেখেও পরোয়া করল না। ঘুরে পাশের মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। শরীর দেখাতে মনে হয়, এরা অভ্যস্ত। শত শত পুরুষের লোভার্ত চোখের সামনে ক্যাট ওয়াক করে। লজ্জা বলে কোনও বস্তুই মনে হয়, এদের নেই।

তিন-চার মিনিটের মধ্যেই অমিত বেরিয়ে এসে বলল, "না রে। ভেতরে হিয়া নেই। বোধহয় বেরিয়ে গেছে।"

তা হলে কি ও বাড়ি চলে গেল? কার সঙ্গে ও এসেছে, জানি না। বাড়ির কারও সঙ্গে নিশ্চয় নয়। আগের বার জোজোকে নিয়ে এসেছিল। এবার জোজো আসেনি। কলেজ নিয়ে ব্যস্ত। হয়তো ড্রাইভার মুকুন্দকে নিয়ে ও একাই এসেছে। নীচে গেলে এখনও ওকে ধরা যেতে পারে। কথাটা মনে হতেই অমিতকে নিয়ে আমি লাউঞ্জে নেমে এলাম। হিয়াকে আমি চিনি। ও হার সইতে পারে না। ওকে এতটা রাস্তা একা

যেতে দেওয়া উচিত হবে না।

লাউঞ্জেও প্রচুর ভিড়। কনটেস্টে জাজ হিসাবে এসেছেন আমির খান। মনে হল, ভিড়টা আমির খানেরই জন্য। অমিত আর আমি তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। হিয়াকে কোথাও দেখতে পেলাম না। অমিত একবার পার্কিং স্পেসেও ঘুরে এল। তারপর বলল, "মনে হচ্ছে, ও বাড়ি চলে গেছে।"

বললাম, "আমিও চলি রে। বিউটি কনটেস্ট দেখার সাধ আমার মিটে গেছে।"

রাত প্রায় ন'টা রাস্তাঘাট শুনশান। সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ দিয়ে কোনা এক্সপ্রেস হাইওয়ে পর্যন্ত এলাম প্রায় সত্তর মাইল স্পিডে। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমায় খাটোরা পৌঁছতে হবে। একটু রাত অবধি আজ নিশ্চয়ই জেগে থাকবেন সুপ্রতিমবাবু। একটা আশা নিয়ে বসে থাকবেন। দুপুরে সুপ্রতিমবাবু অবশ্য বলেছিলেন, "পারলে আজ একবার এসো।" সেই সুবাদে ও বাড়িতে এই রাতেও যাওয়া যায়। আগে কখনও রাতের দিকে যাইনি।

বোম্বে রোড দিয়ে গাড়ি চালানোর ফাঁকেই মনস্থির করে ফেললাম, আজ সুপ্রতিমবাবুকে কথাটা বলে ফেলব। হিয়াকে আমি বিয়ে করতে চাই। আমার তো আর কেউ নেই, যাকে দিয়ে প্রস্তাবটা দিতে পারি। আমাকেই চেয়ে নিতে হবে। আমি জানি, সুপ্রতিমবাবু গররাজি হবেন না। মাসিমাও আপত্তি জানাবেন না। কেয়াদির কানে গেলে নিশ্চয়ই লাফিয়ে উঠবে। কিন্তু হিয়া? ও যদি বেঁকে বসে? যদি প্রত্যাখ্যান করে? ওর পক্ষে কোনও কিছু অসম্ভব না। আজ দুপুরেও কথা বলার সময় লক্ষ করেছি, বেশ রাগ ভাব। সেই জোর করে চুমু খাওয়ার কথাটা ও এখনও ভুলতে পারেনি। ওকে পোষ মানাতে হবে আমাকেই। দেখা যাক, পারি কি না।

হিয়াকে মা কখনও দেখেনি। ফোনে কয়েকবার কথা বলেছিল। তাতেই মায়ের এমন কৌতূহল বেড়ে যায়, একবার আমাকে বলেছিল, "মেয়েটাকে আমার কাছে একবার নিয়ে আসিস তো শিবা। কত বয়েস রে?" শুভ্রার কাছ থেকে পরে মা হিয়া সম্পর্কে কিছু শুনে থাকতে পারে। অন্য একদিন হঠাৎ আমাকে বলেছিল, "এই মেয়েটা যে বাড়িতে যাবে, ঘর আলো করে রাখবে। আমার খুব ইচ্ছে, এই রকম একটা বউ ঘরে নিয়ে আসি।" আমার কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে মা চুপ করে গেছিল। আগে মা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হা হুতাশ করত মিলির জন্য। হঠাৎ মত বদলাতে দেখে সেদিন আমি মনে মনে হেসেছিলাম। নিজের পায়ের তলায় আমার মাটি নেই। মাকে কী করে বলি, এই মেয়েকেই এক দিন আমি তোমার বউ করে আনব?

হিয়ার কথা ভাবতে ভাবতেই খাটোরা পৌঁছে গেলাম। বাইরে ফিয়াট গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে, হিয়া বাড়ি ফিরে এসেছে। ড্রয়িং রুমে আলো জ্বলছে। গাড়ি থেকে নেমে হঠাৎ উপরের দিকে তাকাতেই মনে হল, একটা ছায়ামূর্তি উঁকি মেরে দেখেই সরে গেল। হিয়া? হতে পারে। মনটা ঠিক করে কলিং বেলে হাত রাখলাম।

দরজা খুলেই সুপ্রতিমবাবু আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত, "এসো বাবা, ভেতরে এসো। একটু আগেই টিভি-তে তোমার ইন্টারভিউ দেখছিলাম। কী যে ভাল লাগছিল, কী

বলব।"

প্রণাম করে বললাম, "হিয়া ফিরেছে মেসোমশাই?"

"এই একটু আগে ফিরল। কী হয়েছে কে জানে? কাউকে কিছু বলল না। সোজা উপরে উঠে গেল। মুখটা এত থমথমে, আমরা কিছু জিজ্ঞেস করতেই সাহস পেলাম না। তুমি কি কিছু জানো?"

কী হল, হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "ও তো কনটেস্টে নামতেই পারেনি মেসোমশাই। অন্য মেয়েরা আপত্তি তুলল।"

সুপ্রতিমবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কেন?"

"মিস ক্যালকাটা আর মিস বেঙ্গল কনটেস্ট দু'টো আলাদা অর্গানাইজেশন করে। ওদের মধ্যে সদ্ভাব নেই। নিয়মও আলাদা। হিয়া মিস ক্যালকাটা হওয়ায়, মিস বেঙ্গলের লোকেরা চায়নি ও এই কনটেস্টে নামুক। অন্য মেয়েদের দিয়ে প্রোটেস্ট করিয়ে দিয়েছে—হিয়া ঠিক সময়ে এন্ট্রি পাঠায়নি। ব্যস, ওখানে যাওয়ার পর হিয়া শুনতে পেল, ওকে নামতে দেওয়া হবে না।"

"তাই ও এত তাড়াতাড়ি ফিরে এল? মুকুন্দ এসে আমাকে বলল, ছোটদিদিমণি সারাটা রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে এসেছে। ভাবলাম, কনটেস্টে অন্য মেয়েদের সঙ্গে পারেনি। আজকাল সব জায়গায় পলিটিক্স! তুমি তাজ বেঙ্গলে গেছিলে নাকি বাবা?"

"হ্যাঁ, মেসোমশাই। অন্য মেয়েদের যা দেখলাম, হিয়া নামলে কেউ ওর সঙ্গে পেরে উঠত না। ভাবলাম, ওকে নিয়ে ফিরে আসব। ওর খোঁজ করতে গিয়ে শুনলাম, বেরিয়ে এসেছে।"

"তুমি একবার ওপরে যাবে বাবা। গিয়ে ওকে বোঝাবে? ও হার মানতে চায় না। ছোটবেলা থেকে দেখছি। স্কুলে প্রতিবার ফার্স্ট হত। একবার হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় সেকেন্ড হয়ে গেল। ব্যস, বাড়িতে এসে বইখাতা ছুড়ে ফেলে বলল, আমি আর ও স্কুলেই পড়ব না। আমি বোঝাই, তোমার মাসিমা বোঝান। একবার সেকেন্ড হয়েছিস তো কী এমন হয়েছে? অ্যানুয়াল পরীক্ষায় ফার্স্ট হ। তো, মেয়ে কিছুতেই শুনবে না। কেঁদে কেটে অস্থির। শেষে এমন পড়া শুরু করল, অ্যানুয়ালে ফার্স্ট।"

"হিয়ার সঙ্গে একবার কথা বলব মেসোমশাই?"

"যাও। ওকে ঠাণ্ডা করো। তোমার কথা ও শুনবে।"

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে হিয়া চুল খুলছে। আমাকে দেখেই বলল, "ফের একগাদা মিথ্যে কথা বললেন বাপিকে? কে বলল, আমার হয়ে সাফাই গাইতে?"

"কেউ বলেনি হিয়া। আমি নিজেই ভাবলাম, বলি। যে মিথ্যেতে কারও ক্ষতি হয় না, সেটা মিথ্যেই নয়, আমার কাছে।"

"আপনি তাজ বেঙ্গলে গেছিলেন?"

"অফ কোর্স গেছি।"

"আমি বিশ্বাস করি না।"

"তাতে আমার কিছু আসে-যায় না। তোমাকে জানিয়ে রাখি, শোভা রাজ বলে

একটা মেয়ে এতক্ষণে বোধহয় মিস বেঙ্গল হয়ে গেছে।"

"নামটা আপনি জানলেন কী করে?"

"কনটেস্ট দেখছিলাম বলে। আমাকে কার্ড দিয়েছিল অমিত।"

"অমিত খৈতান? তাকে আপনি জানেন?"

"অফ কোর্স জানি। জেভিয়ার্সে আমার ক্লাসমেট ছিল। আজই দুপুরে বাড়িতে এসে ও আমাকে কার্ড দিয়ে গেছে। ও তো বলল, তোমাকে ভাল করে চেনে। আজ ও এত চটে গেছে, বলল, হিয়া ঘোষাল যাতে মিস ইন্ডিয়া হয়, তার জন্য যত রকম চেষ্টা করার করব।"

"থাক, দরকার নেই। আমি আর বিউটি কনটেস্টে নামব না। সঞ্চারীদিকে আজ বলে এসেছি। আমার পোর্ট ফোলিও ফেরত দিতে।"

"একবার হেরেই তুমি এই ডিসিশন নিয়ে ফেললে?"

"কী হবে কনটেস্টে নেমে?" বলতে বলতেই হিয়ার গলা বুজে এল। চোখের কোণ ভিজে গেল। "মোস্ট বিউটিফুল হেয়ার রাউন্ডে আমি বাদ? আমার মতো হেয়ার স্টাইল আর কোন মেয়ের ছিল, বলুন তো?"

"জীবনের সব অঙ্ক কি মেলে হিয়া? তাই বলে হেরে সরে আসতে হবে? গত একটা বছর আমার উপর দিয়ে কী ঝড় গেছে, তুমি জানো? যেখানে গেছি, ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। আমি তো পালিয়ে যাইনি।"

"আপনার কথা ছাড়ুন শিবাশিসদা। আপনার ট্যালেন্ট আছে। আপনি এক্সেপশনাল। আমরা তো তা নই। আমাদের পরিশ্রমই সব। কম খেটেছি এ বার কনটেস্টের জন্য? শোভা মিস বেঙ্গল, ভাবতেও আমার কষ্ট হচ্ছে।"

চোখের কোণ গড়িয়ে জলের ধারা নেমে আসছে। হিয়ার ঠোঁটটা কাঁপছে। কয়েক পা এগিয়ে ডান হাত দিয়ে ওর চিবুকটা তুলে ধরলাম। অবিচারে আহত একটা মুখ। ভীষণ মায়া হল ওকে দেখতে দেখতে। ওর শরীর থেকে কস্তুরী মৃগনাভির গন্ধ উঠে আসছে। আমারই তৈরি করা সুগন্ধি। কয়েকদিন আগে ওর জন্মদিনে একগুচ্ছ ফুলের সঙ্গে হিয়া-র একটা শিশি পাঠিয়েছিলাম। আজ বিউটি কনটেস্টে যাওয়ার আগে নিশ্চয়ই আমার দেওয়া সেই উপহার হিয়া মেখে গেছিল? কথাটা ভাবতেই সারা শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। গন্ধটা আমাকে টানছে। প্রবলভাবে টানছে। এই প্রথম।

চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম, " প্লিজ হিয়া, কান্না তোমায় মানায় না। কে বলল তোমার মধ্যে ট্যালেন্ট নেই? জানি, আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না। তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু নিজের উপর প্লিজ, তুমি বিশ্বাস হারিও না। আমি জানি, তুমি পারবে। আমি তোমার পাশে থাকব। দেখি মিস ইন্ডিয়া কনটেস্টে কে তোমাকে হারাতে পারে?"

দু'হাতে মুখ ঢেকে হিয়া কাঁদছে। এতদিন যে হিয়াকে আমি দেখে এসেছি, সে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একটা মেয়ে। আচমকা একটা আঘাতে আজ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ওর আত্মবিশ্বাসটা ফিরিয়ে দেওয়া দরকার। দু'হাতে টেনে ওকে দাঁড়

করালাম। তারপর মুখ থেকে ওর দু'টো হাত সরিয়ে দিয়ে বললাম, " আই লাভ ইউ হিয়া, আই লাভ ইউ।"

কান্না থামিয়ে ও আমার দিকে তাকাল। ওর মুখের রঙ দ্রুত বদলাচ্ছে। আগের দিনের মতো ও নিজেকে ছাড়িয়ে নিল না। ডান হাত দিয়ে ওকে আরও কাছে টেনে আনলাম। হিয়া আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হয়তো আমার সম্পর্কে ওর যাবতীয় দ্বিধা, সন্দেহ, অবিশ্বাস নিরসন করতে চাইছে। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তারপরই লক্ষ করলাম, ওর চোখের ভাষা বদলে যাচ্ছে। ঠোঁট দু'টো তিরতির করে কাঁপতে শুরু করেছে। আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে মুখটা তুলে ধরেছে আমার দিকে। ঠিক তখনই হিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার সেই সব হরিণীর কথা মনে হল, কস্তুরী মৃগের গন্ধ অণুতে আকৃষ্ট হয়ে যারা মিলনের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ঘাসের ফাঁকে, পাতায় পাতায়, ডালে ডালে যারা আমন্ত্রণলিপি খুঁজে বেড়ায়। হিয়ার কপালে ছোট্ট চুমু দিয়ে বললাম," কী আমার কথাটা তুমি বিশ্বাস করলে না?"

চোখ মুছে, আমার বুকে মাথা রেখে হিয়া নরম গলায় শুধু বলল, "জানি না, যাও। মিথ্যুক কোথাকার।"